বাইশ বছরের গোপন জীবন

গল্পের চেয়েও রোমাঞ্চকর

দেবেন সিকদার

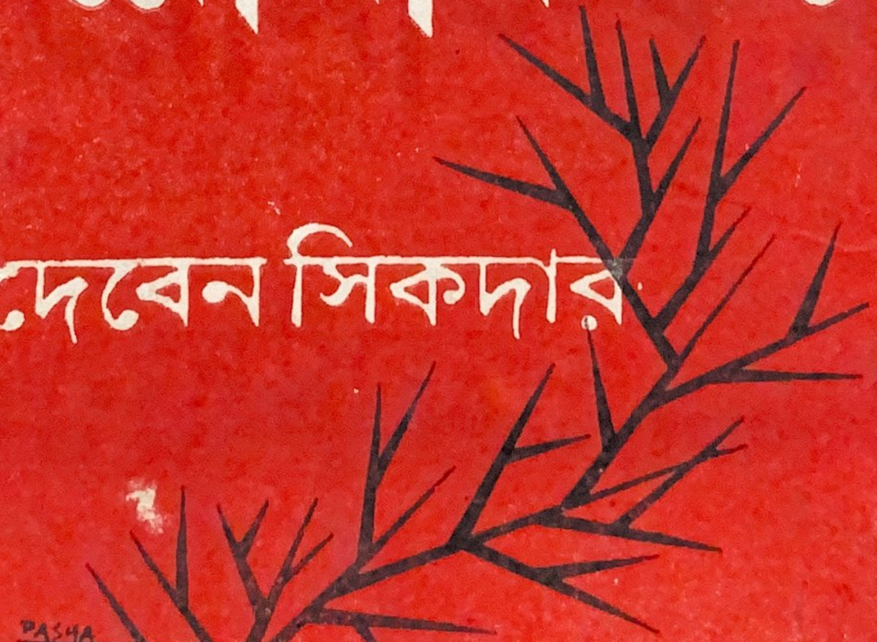

বাইশ বছরের গোপন জীবন

গল্পের চেয়েও রোমাঞ্চকর

দেবেন সিকদার

বুলবুল প্রকাশনী
কুমিরা
চট্টগ্রাম

প্রকাশ কাল :—
বৈশাখ—১৩৯০ বাঙলা
মে—১৯৮৩ ইংরেজী।

প্রকাশক :—
বিপ্লব বিজয় রায়
বুল বুল প্রকাশনী।
কুমিরা,
চট্টগ্রাম।

প্রচ্ছদ :
পাশা ভাই, ঢাকা

মুদ্রণে :—
আইডিয়েল প্রিন্টিং প্রেস
১৯, শেখ সাহেব বাজার,
ঢাকা—৫।

বাঁধাই :
মডার্ণ বুক বাইণ্ডার
উত্তর মুগদা পাড়া
ডাক: বাসাবো
ঢাকা—১৪।

পরিবেশক :
ফজলুর রহমান
গোপালপুর
রাজশাহী।

বিনিময় মূল্য :
নিউজপ্রিন্ট—বিশ টাকা
সাদা " ত্রিশ টাকা

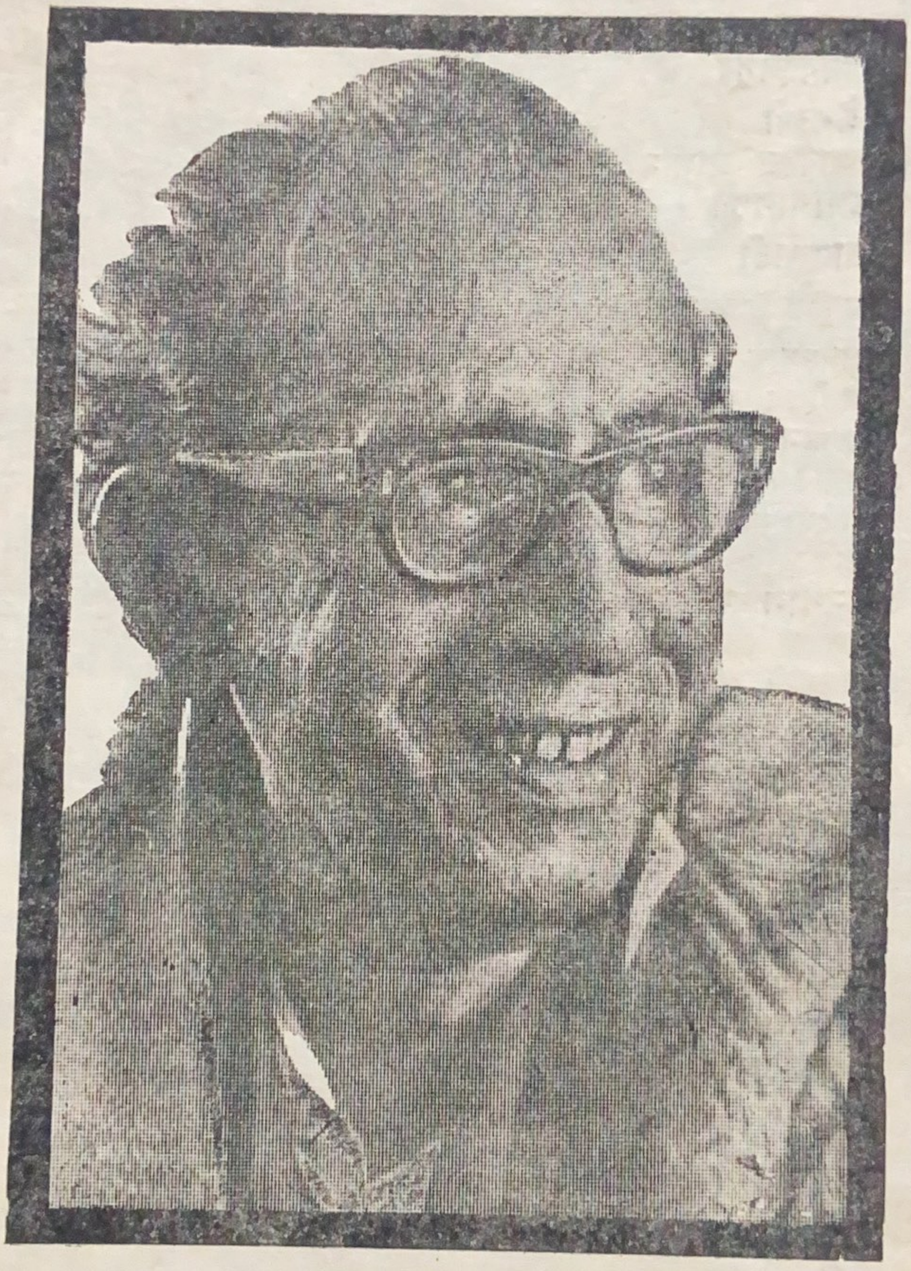

প্রাপ্তিস্থান

রেলওয়ে বুক ষ্টল :
আত্রাই
আনন্দুরা
আবদুলপুর
ঈশরদী

○ আবদুছ ছালাম
গোপালপুর
রাজশাহী

○ নাছির উদ্দিন ভুইয়া
লাকসাম

○ প্রদীপ দেবনাথ
ব্রাহ্মনবাড়িয়া

○ চলন্তিকা বইঘর
বাংলা বাজার
ঢাকা

○ নেপাল কান্তি নাথ
কলেজ রোড
ঈশ্বরদী, পাবনা

○ রকেট মিত্র
১০, রাজা পুকুর লেইন
কৃষি অফিসের পশ্চিম পার্শে।
আন্দর কিল্লা, চট্টগ্রাম।

○ রেলওয়ে বুক ষ্টল
চট্টগ্রাম ষ্টেশন।

○ আবদুল মালেক
পোর্ট কলোনী, চট্টগ্রাম

○ আবদুর রব সরদার
পাহাড়তলী চট্টগ্রাম

○ ডাক্তার কানাই লাল চক্রবর্ত্তী
কুমিরা বাজার, চট্টগ্রাম

○ যতীন আচার্য্য
জেনারেল ফার্ম্মেসী
রহমতগঞ্জ, চট্টগ্রাম।

উৎসর্গ

যাঁর উদার মানসিকতা, অকৃত্রিম, দেশপ্রেম, দৃঢ় মনোবল ও আত্মপ্রত্যয় আমার বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের বিশেষ এক পর্যায়ে সহায়তা জুগিয়েছিল, সেই অকৃত্রিম সুহৃদ অধ্যাপক নূরুল ইসলাম হিলালীকে—

সোমেন-তাজুল পাঠাগার
সৌজন্য : শামসুজ্জামান হীরা

ঃ সূচীপত্র ঃ

পৃষ্ঠা
দু'টি কথা ৩
লেখক পরিচিতি ৫
লাল বাতি ১৭
নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ ২২
বাঘের উপর টাক ২৬
বিরজা দেবী ২৮
সুদ খোর মহাজনের দেশ প্রেম ৩০
পুলিশের চোখের সামনে থেকে চম্পট ৩৩
অভিনয় ৩৬
দুঃসাহসিক পলায়ন ৪০
গুণ্ডার সর্দারের দেশপ্রেম ৪৭
কবিয়াল গানের দোহার ৪৯
খয়ের খা ৫৬
বোকা পুলিশ ৫৯
দুই পথ দুই প্রদর্শক ৬২
মহামুণি ৬৬
পুলিশী ভূত ৬৯
পদ লোভ ৭২
অদম্য ৭৫
বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্বপ্ন দ্রষ্টা ৮৬
কুমারী মন ৯২
বাঘের ঘরে ঘুঘু ৯৯
শাহী ঘেরাও ১০৪
গোদা পায়ের লাথি ১১১
জুয়ার আড্ডা থেকে নেতৃত্বে ১১৮
কল্পিত সতীন ১২১
নজীর বিহীন নেতৃত্বের খায়েশ ১২৫
সুতাকল ধর্মঘট ১৩২
জনশনের কুশপুত্তলিকা দাহ ১৪১
একটি আদর্শ শ্রমিক সংগঠন ১৪৪
টঙ্গীর শফী মজুমদার ১৪৯
গোপন জীবনে প্রকাশ্য কাজ ১৫২
গোপন যুগে কৃষক কর্মী সম্মেলন ১৫৫
ডাক্তার মুর্তজা ১৫৭
গোপন জীবনে সব চেয়ে ঘটনা বহুল জীবন ১৬১
গোপন জীবনে সামাজিকতা ১৬৭
পিতা-কন্যা জামাতা ১৭৩
নোয়াখালী জিলায় সাংগঠানিক তৎপরতা ১৭৫
জোড় মানিক ১৭৭
রণ ক্ষেত্র থেকে পলায়ন ১৮০
মওলানা ভাসানী নিকট গোপন চিঠি ১৮২
চীন পন্থী মার্শাল ল ১৮৩
রাজশাহী জেল বিদ্রোহ ১৯০-২০৮

দু'টি কথা

সুদীর্ঘ ত্রিশ বত্রিশ বছর পূর্ব হইতে বইটির পাণ্ডু লিপি লিখতে শুরু করি, এক একটা চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে, তাকে ভিত্তি করে ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করতে থাকি। তখন ঘটনাগুলি অনেক জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছিল। এভাবে লিখা গুলি জম্‌তে থাকে এবং ১৯৬৭/৬৮ সালের দিকে পাণ্ডু লিপি খানি পুর্নাঙ্গ রূপ ধারণ করে। এই পাণ্ডু লিপি সহ আমার একটা প্রায় পুর্ণাঙ্গ লাইব্রেরী গোপনে জমা রেখেছিলাম চট্টগ্রাম জিলার উত্তর কাট্টলী নামক এক গ্রামে আমার পুত্র বধূর পিশাত ভাই শ্রীমান ননী গোপালদের বাড়ীতে। ১৯৭১ সালে পাক হানাদার বাহিনীর আক্রমণের মুখে তারা বাড়ী ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার সুযোগে আলবদর রাজাকাররা বাড়ীটির অস্থাবর জিনিষপত্র লুট করে নিয়ে যাবার সময় আমার বই এর বিরাটাকৃতির (তিন হাত লম্বা×দেড় হাত প্রস্থ) ষ্টীল-এর ট্রাঙ্কটিও নিয়ে যায় এবং পরবর্ত্তী সময়ে ভয়ে বই সমেত সমস্ত কাগজ পত্র, দলিল ও পাণ্ডু লিপি খানি পানিতে ফেলে নষ্ট করে দেয়। ফলে বইটি সম্পূর্ণ নতুন করে লিখতে হয়। তাতে লিখা গুলি পূর্বের ন্যায় জীবন্ত হয়ে উঠেনি, বিশেষ করে সব কথা ও ঘটনা স্মৃতিতেও ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। ফলে ভুল ভ্রান্তি হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। কোন গুরুতর ভুল ভ্রান্তির বিষয়ে সহৃদয়-পাঠকগণের সহযোগিতা পেলে দ্বিতীয় সংস্করণে তা অবশ্যই সংশোধন করা হবে।

যাদের অক্লান্ত শ্রম ও আন্তরিক সহযোগিতা না পেলে বইটি ছাপার অক্ষের রূপ পেতো না, তারা হলেন-পরম স্নেহাস্পদ অধ্যাপক হিরন্ময় চক্রবর্ত্তী ও শ্রীমান মিন্টু মিত্র। তারা দুইজনে কঠোর পরিশ্রম করে পাণ্ডুলিপিটি আগাগোড়া দেখে দিয়েছেন।

সর্বশেষে যথা সম্ভব রুচিসম্মত ছাপা, প্রুফ দেখা, অঙ্গসজ্জা ইত্যাদি বিষয়ের সামগ্রিক দায়িত্ব নিষ্ঠার সহিত পালনে বন্ধুবর আলমগীর মজুমদার ও ইয়ান এর অবদান কোন অংশে কম নয়। তাদেরে জানাই অশেষ ধন্যবাদ।

শত ইচ্ছা ও আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও বইটি পূর্ণাঙ্গ সুন্দর ও রুচি সম্মত করে ছাপা সম্ভব হল না। মূলতঃ ছাপার খরচ অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য। হাজারো ত্রুটি বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও বইটি পাঠ করে পাঠকবর্গ যদি সামান্যতম উপকৃত ও আনন্দ পান তাহলেই আমার শ্রম সার্থক হবে।

পরিশেষে অত্যধিক কর্মব্যস্ত জীবনে কষ্ট করে লেখক পরিচিতি লিখে দিয়ে বন্ধুবর অমলেন্দু বিশ্বাস (ননী বিশ্বাস)–বিশেষ একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন, কেননা–আমার ব্যক্তিগত পারিবারিক দিক ও রাজনৈতিক জীবন এই উভয় দিক সম্পর্কে ওয়াকীবহাল মহলের দারুন অভাব রয়েছে। যারা বিস্তারিত জানেন তারা শুধু মাত্র একটা দিকের সাথে পরিচিত।

বন্ধুবর অমলেন্দু সম্পর্কে আর বিশেষ কিছু বলার প্রয়োজন নেই, যিনি স্বনামে স্বকর্মে ও স্বকৃতিত্বে বাংলাদেশের সর্বত্র নাট্যামোদীদের নিকট বহুল পরিচিত এবং গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত। তাকে জানাই অশেষ ধন্যবাদ।

এরপর প্রচ্ছদ এঁকে দিয়ে যে শিল্পি উদারতার পরিচয় দিয়েছে, তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে খাটো করতে চাই না।

বাইশ বছরের গোপন জীবনের অনেক ঘটনাই বাদ রয়ে গেল। এই বই এর ক্ষুদ্র পরিসরে স্থান সঙ্কুলান সম্ভব হল না। বইটি যদি সুধি পাঠক-পাঠিকাদের নিকট সমাদৃত হয়, তাহলে অচিরেই এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড প্রকাশ করার ইচ্ছা রইল।

ধন্যবাদান্তে

লেখক

বাইশ বছরের গোপন জীবন
গল্পের চেয়েও
রোমাঞ্চকর

লেখক পরিচিতি

১৯৪৭ সালের ১৪ই, ১৫ই আগষ্ট ভারত উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান ও ভারতীয় প্রজাতন্ত্র নামে দুইটি রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হয়। উভয় রাষ্টের ধনীক শ্রেণীর শ্রেণী স্বার্থে রাজনৈতিক কারণেই সংগঠিত হয় এই বিভক্তি। এই পুস্তকের মূল বিষয় বস্তু সেই সব বিষয় না হলেও একেবারে রাজনীতি বিবর্জিত নয়। কারণ লেখকের বাইশ বছরের আত্ম গোপন কাহিনীর সাথে এই রাজনীতি বাস্তবতার সম্পর্ক রয়েছে, কেননা তিনি একটি বিপ্লবী দলের সার্বক্ষণিক কর্মী ও নেতা ছিলেন।

১৯১৭ সালের ৭ই নবেম্বর, চট্টগ্রাম জিলার, আনোয়ারা থানার শোলকাটা গ্রামে একটি দরিদ্র কৃষক পরিবারে লেখকের জন্ম হয়। পিতা শ্রীহর কুমার সিকদার, মাতা শ্রীমতী মাতঙ্গিনী দেবী, তার পিতা কৃষি কাজের সাথে সাথে নানা ধরণের ক্ষুদ্র ব্যবসাও করতেন। যথা পান, মরিচ, তামাক, দৈ-ঘোল-কাপড় ও মুদি খানা। ছোট- কাল থেকে পিতার সহযোগী হিসাবে এই সব কাজে লেখকের হাতে খড়ি হয়। বাল্য বয়সেই (বার বছর) তার বিয়ে হয়। সাত বছরের এক মেয়ের সাথে। (১৯২৯ সালে) ঐ সালেই তিনি চতুর্থ শ্রেণী হতে লিখাপড়ায় ইস্তফা দিয়ে চট্টগ্রাম শহরের রহমতগঞ্জ-এ এক মধ্যবিত্ত পরিবারে গৃহ ভৃত্যের কাজ গ্রহণ করেন।

স্কুল জীবন তাঁর শেষ হয় চতুর্থ শ্রেণী পাশ না করেই। চাকুরী জীবনের দ্বিতীয় বছরে অর্থাৎ ১৯৩০ সালের ২২ শে এপ্রিল গভীর রাতে ভয়ঙ্কর গোলাগুলি ও বন্দে মাতরমঃ ধ্বনীর শব্দে সমস্ত শহর জেগে উঠল। লোক মুখে কানা-কানি-ফিস্‌ফিস রব থেকে জানা গেল চট্টলার বিপ্লবীরা বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে; দলের নেতা মাষ্টারদা সূর্য্য সেন। অন্যান্য নেতারা হচ্ছে অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ লোকনাথ বল, অম্বিকা চক্রবর্ত্তী, তারেকেশ্বর দস্তিদার।

শহরের অন্যান্য নাগরিকদের সাথে লেখক ও ঘুম থেকে জেগে এই খবর জানলেন। মনের আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে লেখক আপন মনে (স্বগত) সিদ্ধান্ত নিলেন—"আজ থেকে আমিও একজন বিপ্লবী ও ঐ বিপ্লবী দলের সদস্য।" এর পর থেকে তিনি গোপনে ঐ বিপ্লবী দলের সাথে সংযোগ স্থাপনের প্রচেষ্টা চালাতে লাগলেন।

এই সময় হতে তিনি দৈহিক ভাবে গৃহভৃত্য হলেও মানসিক ভাবে একজন দৃঢ়মনা বিপ্লবী।

এরপর বিভিন্ন পেশা বদল করতে করতে তিনি চাকুরী নিলেন চট্টগ্রাম শহরে জেমজ ফিন্‌লে নামক এক বিলাতী জাহাজ কোম্পানীর অফিসে "পাখা টানার বয়" হিসাবে। (তখন চট্টগ্রামে বিজলী বাতি স্থাপিত হয়নি।) ১৯৩৩ সালে ঐ চাকুরী ছেড়ে দিয়ে একদিন তিনি বার্মাগামী এক বড় জাহাজে উঠে বসলেন। অবশ্য এর জন্য বড় রকমের সুযোগও একটি জুটে গিয়েছিল। তখনকার দিনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ধনীদের মধ্যে ছিল তীব্র প্রতিযোগীতার যুগ। (আজকালের ন্যায় দেশীয় ধনীরা ষোল আনা দালাল ছিল না।) "বেঙ্গল সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেষণ নামে এক দেশীয় জাহাজ কোম্পানীর সাথে ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জি নামে আর এক বৃটিশ জাহাজ কোম্পানীর দারুন প্রতিযোগিতা চলছিল। প্রতিযোগিতা এত তীব্র ছিল যে এক পর্য্যায়ে দেখাগেল, উভয় কোম্পানী বিনা ভাড়ায় যাত্রী নিয়ে যাচ্ছে আরাকান-রেঙ্গুণে। লেখক এই সুযোগে আরাকানে গিয়ে পৌছলেন। তখন আরাকানে লেখকের জ্যেষ্ঠ ভগ্নীপতি শ্রী যোগেশ দত্ত ও মাতুল শ্রী বরদা চৌধুরী অবস্থান করতেন। আরাকান গমনের লেখকের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সন্ত্রাসবাদী দলের পলাতক গোপন নেতাদের সাথে সংযোগ প্রতিষ্ঠায়, দলের পত্র বাহক হিসাবে। পরবর্ত্তী জীবনে লেখক যখন এক নাগারে বাইশ বছর আত্ম গোপনে ছিলেন তখন অতীতের এই সব কাজের অভিজ্ঞতা তাঁর জন্য যথেষ্ট সহায়ক হয়।

তৎকালীন সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী দলের নিয়মানুসারে যে সব বই পাঠ্য তালিকায় ছিল সে গুলি হল শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের "পথের দাবী", রবীন্দ্র নাথের "গোরা"। বঙ্কিম চন্দ্রের আনন্দ মঠ, দেবী চৌধুরাণী, আয়ার ল্যাণ্ড বিপ্লবী দলের নেতা– মিঃ ডি ভেলেরা, নেপোলিয়ন বোনাপার্ট এবং রুশ বিপ্লবের নেতা কমঃ লেনিনের জীবনী ইত্যাদি।

এই সমস্ত বই পড়তে পড়তে লেখকের মধ্যে বই পড়ার অভ্যাস দারুণ ভাবে বেড়ে যায়। তিনি দৈনিক ৭/৮ ঘন্টা থেকে ১৬/১৭ ঘন্টা পর্য্যন্ত পড়ায় অভ্যস্থ হয়ে উঠেন। এমন কি হাতের কাছে যা পাওয়া যায় (অবশ্য বাংলা ভাষায়)-তাই গলধঃ করণ করতে থাকেন। এই ভাবে অধ্যায়ন করতে গিয়ে তিনি তার স্কুল জীবনের ঘাটতি পূরণের চেষ্টা করেন এবং বহুলাংশে সফল হন।

বার্মার আরাকানে অবস্থান কালে কিছু দিন ধানের গুদামে ও ইটের ভাটায় কুলির কাজ করেন। কয়েক মাস পরে চট্টগ্রামে ফিরে এসে পূর্বের চাকুরীতে বহাল হন। এখানে দীর্ঘ দশটি বছর চাকুরী করেন (১৯৪০ এর ৭ই আগষ্ট পয্যন্ত।) 'পাঙ্কাবয়' থেকে প্রমোশন পেয়ে ক্রমে সহকারী দপ্তরী দপ্তরী, পিওন এবং জরুরী বার্তাবাহক হিসাবে সাইকেল পিওনের পদে উন্নীত হন। বেতন বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় মাসিক তিন টাকা হতে-বার টাকা বত্রিশ পয়সা। টাকার মূল্যমান হিসাবে ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় মহাসমর শুরু হওয়ার আগের দিন পর্যন্ত চাউলের মন ছিল সোয়া এক টাকা। অর্থাৎ ৬৪ পয়সায় এক টাকা হিসাবে মাত্র দুই পয়সায় এক সের চাউল পাওয়া যেত।

রাজনৈতিক জীবনের অব্যাহত ধারা ঃ—

১৯৩৭ সালে তিনি আরও অনেকের সাথে সন্ত্রাসবাদ বর্জ্জন করে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির চট্টগ্রাম জেলা শাখায় যোগদান করেন। এই পর্য্যায়ে লেখকের সামনের সারিতে ছিলেন কমঃ সারদা দাস, সহকর্মী ছিলেন সর্ব কমঃ মাধব মজুমদার, মনীন্দ্র মজুমদার, ব্রজেন দে চৌধুরী, ডাক্তার লাল মোহন দে, শুধাংশু দে, কিরণ সিকদার, যতীন ও দীনবন্ধু এবং শ্রীমন্ত ও হিমাংশু দত্ত (এরা কাজ করতেন গ্রামে) আর ছিল অনিল ঘোষ ও বিশ্বাস, মলিন ঘোষ, দীনেশ চক্রবর্তী, প্রফুল্ল ঘোষ, মধু কানুন গো, এবং অজিত নাগ (এরা কাজ ও অবস্থান করত শহরের উপকণ্ঠে গোষাই ডাঙ্গা পাড়ায়)

১৯৪০ সালের আগষ্ট মাসে গোয়েন্দা পুলিশের রিপোর্টে লেখকের চাকুরী চলে যায়। যেদিন চাকুরী চলে যায় সেদিন তাঁকে শহর থেকে বহিস্কার করে গ্রামের বাড়ীতে নজর বন্দী করা হয়। লেখক এই অন্যায় আদেশ সাহসের সাথে থানার দারোগার মুখের উপর ছুড়ে মেরে গোয়েন্দা পুলিশের হেড কোয়ের্টারে গিয়ে অনেক যুক্তি তর্ক দিয়ে তাদেরে বুঝিয়ে ঐ হুকুম

নামা পরিবর্তন করতে সরকারকে বাধ্য করেন। অর্থাৎ নজর বন্দী রইলেন, তবে গ্রামের বাড়ীতে নয়, শহরে গোষাই ডাঙ্গা নামক পাড়ায়। পেশা বদল করে হলেন একটি ধোপাখানার শরিকদার। অন্যতম শরিকদার ছিলেন ঐ গ্রামের বাসিন্দা, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের অন্যতম আসামী আন্দামান (দ্বীপান্তর) ফেরত কমঃ মলিন ঘোষ। পুঁজি ও আসবাব পত্র দিয়ে সাহায্য করেছিলেন বন্ধুবর অজিত নাগ। (তিনি ফরোয়ার্ড ব্লক পন্থী রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন।) এ' ছাড়া দুই বেলা খাওয়া-থাকার বিনিময়ে শহীদ পুলিন ঘোষের কাকার গৃহে করতেন গৃহ শিক্ষকতা। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়নরত তিনজন ছাত্র-ছাত্রীকে পড়াতেন।

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্ব মহাসমর শুরু হওয়ার সাথে সাথে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের মূল্য ধাঁ ধাঁ করে বাড়তে থাকে। কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগদান করে লেখক শ্রমিক ফ্রন্টের কাজে হাতে খড়ি নেন (যেহেতু কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রণী অংশের পার্টি এবং লেখক নিজেও একজন সর্বহারা শ্রমিক)। প্রথমে রেল (১৯৩৭) ডক ও বন্দর (১৯৩৮) এবং বার্মা অয়েল (১৯৩৯) শ্রমিক কর্মচারীদের মধ্যে কাজ করতে থাকেন অফিস ছুটির পর। ১৯৪০ সালের শেষ দিকে লেখক—মলিন ও অনিল ঘোষ, প্রফুল্ল ঘোষ, কালি কিঙ্কর দে, মধু কানুনগো, সহ কমঃ দ্বীনেশ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে চট্টগ্রাম ডক শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধির দাবীতে ধর্মঘটের আহবান জানান। তখন মজু মিয়া ওরফে মজু গুণ্ডা ছিল ডক ইউনিয়নের সম্পাদক তথা শ্রমিকদের প্রাণ প্রিয় নেতা। তখনকার দিনে ডক শ্রমিকদের সংগঠন করতে গিয়ে অভিজ্ঞতা হয় যে, প্রয়োজনে দেশপ্রেমিক বা মানব দরদী—অসামাজিক চরিত্রের মানুষেরও সহযোগিতা গ্রহণ করা উচিত।

লেখক যে অফিসে চাকুরী করতেন ঐ কোম্পানীই ছিল তখনকার দিনে সব চাইতে বড় ষ্টিমার এজেন্ট ; যে লবনের জাহাজকে কেন্দ্র করে ধর্মঘট আহ্বান করা হয়, ঐ জাহাজ ছিল সেই জেমজ ফিন্‌লে কোম্পানীর আওতায়। এই কোম্পানীর অফিসে মিঃ কিড্‌স, আবদুল হক দোভাস (ডকের ঠিকাদার) এবং তার বিশ্বস্থ সহচর মখলছ সারাং এই তিন জনে ধর্মঘট ভাঙ্গার-চক্রান্ত করতেন। লেখক ছিল ঐ সময়ে মিঃ কিড্‌স্ সাহেবের খাস পিওন। ফলে সমস্ত ষড়যন্ত্র তিনি আগে ভাগে জানতে পারতেন এবং তার ভিত্তিতে ধর্মঘটের যাবতীয় প্রস্তুতি নেওয়া হত। মূলতঃ এই কারণে ১৩ দিনের ঐ ঐতিহাসিক ডক শ্রমিকদের প্রথম সংগঠিত ধর্মঘট সাফল্য মণ্ডিত

হতে পেরেছিল। দাবী মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল দৈনিক মজুরী চৌদ্দ পয়সার স্থলে বিশ পয়সা, কাজের ঘন্টা—নয় ঘন্টার স্থালে দুই শিফটে আট ঘন্টা এবং রাতের মজুরী এক নাগারে ৭ ঘন্টার বিনিময়ে চার আনার স্থলে ছয় আনা। কাজে হাজির হওয়ার পর কাজ না হলেও বেতন দিতে কর্তৃপক্ষ বাধ্য থাকবে।

শেষ পর্যন্ত গোয়েন্দা পুলিশ এই খবর বের করতে সক্ষম হয় এবং সেই অপরাধে ১৯৪০ সালের ৭ই আগষ্ট লেখকের চাকুরী যায়। সেই যে চাকুরী গেল, বাস্তবে সেই দিন থেকেই লেখক হয়ে যায় সর্বক্ষণের বিপ্লবী কর্মী। তখন ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি ছিল বে-আইনী। পার্টির বেশীর ভাগ কাজ চলত প্রকাশ্যে তবে নানান কৌশলে ও ছদ্মাবরণে। এখান থেকেও পরবর্ত্তী কালের গোপন জীবন অতিবাহিত করার প্রচুর অভিজ্ঞতা লেখক সঞ্চয় করেন।

১৯৪২ সালের মাঝামাঝি সময়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধঃ যখন মোর নেয় "গণ যুদ্ধে"—তখন ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। পার্টি সর্ব্বত্র প্রকাশ্যে অবতীর্ণ হয়ে কাজ করতে থাকে। সারা ভারত ব্যাপী শক্তিশালী শ্রমিক কৃষক, ছাত্র, যুব-মহিলা, কিশোর বাহিনী ও সাংস্কৃতিক সংগঠন-আইন জীবিদের সংগঠন এবং বিভিন্ন সেবামূলক সংস্থা গড়ে উঠে।

১৯৪৩ সালে সারা বাংলায় মহামন্বান্তরে পঞ্চাশ লক্ষ লোক অনাহারে মারা যায়। পার্টি তখন শক্তিশালী ও কার্য্যকরি পিপলস রিলিফ কমিটি গড়ে তোলে, এবং জনগণের সুখে দুঃখে একাত্মতা ঘোষণা করে। এই সময়ে লেখক গ্রামের বাড়ীতে ছিলেন এবং কৃষি কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

১৯৪২ সালে পার্টি আইনী হলেও এই তিন জনের সেলের কাজ ছিল গোপনে। সমগ্র যুদ্ধকালীন সময় গোপনে কাজ করে লেখকের প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়, যা পরবর্তী পাকিস্তান আমলের গোপন যুগে দারুন-ভাবে সহায়ক হয়।

এর পর এল দেশ ভাগ। ১৯৪৭ সালের ১৪/১৫ই আগষ্ট। ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির তৎকালীন কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের দায়িত্বহীনতা, অকমিউনিষ্ট সুলভ সংস্কারবাদী কার্য্যকলাপ প্রধানতঃ দেশ ভাগের জন্য দায়ী। পার্টি যদি কমঃ লেনিনের নির্দেশ "এই যুগে কোন উপনিবেশিক দেশের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে সেই দেশের ধণীক শ্রেণী নেতৃত্ব দিতে পারে না।

জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের ঝাণ্ডা ধনীক শ্রেণী ছুড়ে ফেলে দিয়েছে, সেই ঝাণ্ডা আজ ধুলায় লুন্ঠিত। সর্বহারা শ্রেণীর পার্টিকে সেই ঝাণ্ডা কাঁধে তুলে নিতে হবে" মেনে চলত, কমঃ ষ্টালিনের সাবধান বাণী ("ইতিমধ্যেই চীন, মিশর-ভারত ইত্যাদি দেশের ধনীক শ্রেণীর বড় অংশ সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে গাটছড়া বেঁধেছে"। এবং ভারতের পার্শ্ববর্তী দেশ চীনে শ্রমিক শ্রেণীর পার্টির নেতৃত্বে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম ধাপে ধাপে উন্নীত হয়ে (১৯২৭—১৯৪৯) চরম পর্যায়ে উপ্পণীত হওয়ার ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহন করে ভারতের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে জনগণকে নেতৃত্ব দিত। তাহলে এই উপমহাদেশের স্বাধীনতার চরিত্র ভিন্ন হত ও কমিউনিষ্ট নেতৃত্বে স্বাধীন হয়ে চীনের ন্যায় শোষনহীন জনগণের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কায়েম হত।

যাই হউক "চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে" এই প্রবাদ বাক্যের ন্যায় দেশ ভাগ হয়ে যাওয়ার পর পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সংস্কারবাদী কমঃ পি সি যোসীকে সম্পাদেকের পদ থেকে অপসারণ করে কমঃ রাজেশ্বর রাওকে প্রথমে সম্পাদক করলেন, এবং হঠকারী অবিপ্লবী লাইন গ্রহন করে আওয়াজ তুলেলন—"ইয়ে আজাদী ঝুঠা হ্যায় লাকো ইন্‌সান ভূখা হ্যায়।"

এই হটকারী লাইন অনুসরণ করে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিষ্ট পার্টি ও চট্টগ্রাম জেলার পার্টি কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহন করল : ১৯৪৮ সালের ১৪ই আগষ্ট পাকিস্তানের প্রথম স্বাধীনতা দিবসে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে "ভূখা মিছিল" বের করা হবে। এবং চট্টগ্রাম শহরে করবে এক ভুখা মিছিলের সমাবেশ। লেখক যদিও "ইয়ে আজাদী ঝুঠা হ্যায় লাখো ইনসান ভূখা হ্যায়" এই শ্লোগানের সাথে একমত থেকেও জনগণের মন মেজাজের দিকে লক্ষ্য রেখে ঐ "ভূখা মিছিলের" কর্মসূচীর বিরোধী ছিলেন।

স্বভাবিকভাবে এই হঠকারী কর্মসূচীকে তৎকালীন মুসলীম জনতা মোটেই ভাল চোখে গ্রহন করতে পারল না। এবং পাক সরকার অতি সহজে নির্মম দমন নীতি চালিয়ে ইহাকে বানচাল করে দিতে সক্ষম হল। মিছিলকে তারা শহরে প্রবেশ করার পূর্বে চাক্‌তাই, চকবাজার, ও পাহাড়তলীতে আনছার বাহিনী দিয়ে পিটিয়ে হঠিয়ে দিল। অনেক নেতৃস্থানীয় কর্মী ও নেতা গ্রেপ্তার হয়ে জেলে গেল।

অবশ্য স্মরণ যোগ্য যে এর দুই মাস পূর্বে চট্টগ্রাম জেলার কোয়েপাড়া নামক গ্রামে (১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে) চট্টগ্রাম জেলা কমিটির সম্মেলনে নির্বাচিত হয় ২৫ জনের এক বলিষ্ঠ জেলা কমিটি। যাদেরে নিয়ে ঐ কমিটি তারা হলেন ঃ সর্ব কমরেড অনন্ত সিং, বঙ্কিম সেন, কল্পনা দত্ত, কল্পতরু সেন, জ্যোতি দিদি, প্রিয়দা চক্রবর্তী, রত্নেশ্বর শীল, সুখেন্দু দস্তিদার; (বড়) হরি রাখাল দত্ত, মাধব মজুমদার, বিমল সেন; বেণী মাধব চৌধুরী, অমর সেন' আবদুস ছাত্তার, পূর্ণেন্দু কানুন গো, সুরেন দে, রণধীর দাশগুপ্ত, শুধাংশ, বিমল দত্ত, ব্রজেন দাশ, ধীরেন শীল, নগেন দে, মোক্ষদা চক্রবর্ত্তী, বিনয় হরি দে, দেবেন সিকদার ও অম্বিকা চক্রবর্ত্তী। কমরেড অনন্ত সিংহ সম্পাদক নির্বাচিত হন। সম্পাদক মণ্ডলীতে ছিলেন অনন্ত সিং, রনধীর দাশ গুপ্ত,বঙ্কিম সেন, কল্পতরু সেন, কল্পনা দত্ত; অম্বিকা চক্রবর্তী ও হরি রাখাল দত্ত।

১৯৪৩ সালের আগস্ট মাসে লেখকের স্ত্রী মূলত পারিবারিক কলহের এবং লেখকের বেকারত্ব জনিত কারণে গলায় ফাঁস দিয়ে সেচ্ছা মৃত্যু বরণ করেন মাত্র উনিশ বছর বয়সে। মৃত্যু কালে তিনি মাত্র দেড় বছরের শিশু পুত্র এবং পাঁচ বছরের এক কন্যা সন্তান রেখে যান।

এই সময়ের কিছু পূর্বে লেখকের জীবনে এক বেদনাদায়ক রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটেছিল। স্ত্রী সাবিত্রী রাণী শহরে খবর পাঠালেন তাদের একমাত্র পুত্র সন্তান দেড় বছরের-দুলাল কান্তি বিনাচিকিৎসায় মৃত্যুশর্যায়। লেখক তখন রিক্ত হস্ত উপরন্তু তিনি নজর বন্দী। সূর্য অস্ত হতে সূর্য উদয় পর্য্যন্ত ঘরের বাইরে আসতে পারেন না।

খবর পেয়ে লেখক তাঁর ধোপাখানার দরজা বন্ধ করে, পেছনের দরজা দিয়ে গোপনে বের হয়ে পড়েন। এবং অভয় মিত্র খেয়া ঘাঠ পার হয়ে দীর্ঘ আট মাইল পথপায়ে হেঁটে বাড়ীতে পৌছান রাত এগারটায়। তার পর সন্তান-সন্ততিদের দেখে স্ত্রী কে সান্তনা দিয়ে, শহরে ফেরার পথে পার্শের গ্রামের এক হোমিও ডাক্তার বন্ধুবর অতুল প্রসাদ দাসকে ঘুম থেকে জাগিয়ে ছেলের চিকিৎসার জন্য বিনীত অনুরোধ জানিয়ে পুনঃ আট মাইল পথ পায়ে হেটে ভোর হবার আগে খেয়া ঘাটে এসে হাজির হন। কিন্তু তখনও খেয়া ঘাটের মাঝি ঘাটে এসে পৌছায় নাই। আসবেন ভোরের কিছুক্ষণ

পর। কিন্তু ঐ সময় পর্যন্ত লেখক অপেক্ষা করতে পারলেন না। তাঁকে সূর্য্য উঠার আগেই গোসাই ডেঙ্গার ধোঁপাখানায় পৌছাতে হবে। নিরুপায় হয়ে পড়নের জামা-কাপড় পাগড়ীর মত করে মাথায় বেঁধে কর্ণফুলি নদী সাঁতার দিয়ে পার হলেন। তখন অবশ্য জোয়ার-ভাটার সন্ধিক্ষণে নদীতে স্রোত ছিল খুবই কম। তবু অভয়মিত্র ঘাঠ হয়ে ধোঁপা খানায় পৌছতে বেশ বেলা হয়ে যায়। এদিকে অনেক বেলা পর্যন্ত ধোপা খানার দরজা না খোলাতে গোয়েন্দা পুলিশদের সন্দেহ জাগে। ‘নজর বন্দী বোধ হয় ঘরে নাই।’ তারা বাহির থেকে অনেক ডাকা-ডাকি করে হয়রান। কাকশ্য পরিবেদনা।’ অবশেষে বেলা প্রায় সাড়ে সাতটায় লেখক পেছনের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকে সামনের দরজা খুললেন। গোয়েন্দারা অনেক প্রশ্ন করলেন, কিন্তু তিনি নির্বিঘ্নে উত্তর দিলেন; ঘুম থেকে জাগতে দেরি হয়ে গেছে। গভীর রাত পর্যন্ত লেখা-পড়া করেছিলাম কি না? কেন সকালে উঠি নাই? এসব প্রশ্নের জবাব দিতে রাজী নই। বেশী গোলমাল করলে এখনই দরজা বন্ধ করে পুনঃ ঘুমিয়ে পড়ব, অর্থাৎ পেছন দরজা দিয়ে বের হয়ে যাব।

আসল কথা গোয়েন্দারাও বিলক্ষণ জানতেন যে সিকদার বাবু রাতে ঘরে থাকে না। পার্টির কাজে বের হয়ে যান। কিন্তু যতক্ষণ হাতে-নাতে ধরতে না পারছেন ততক্ষণ কিছু করারও নাই। আবার, “তিনি ঘরে থাকেন না রাতে” এই কথা উপরে রিপোর্ট করাও যায় না। তাহলে রিপোর্টকারীর চাক্‌রী থাকে না। তিনি সব কিছু জেনেও কেন আসামীকে পাকড়াও করেন না?

কমিউনিষ্ট পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের পর ১৯৪২ সালের ডিসেম্বরে চট্টগ্রামের কদুরখিল গ্রামে চট্টগ্রাম জিলা কমিউনিষ্ট পার্টির প্রথম প্রকাশ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কমরেড্ পি, সি, যোশী ও কমরেড ভবানী সেন (যথাক্রমে সারা ভারত ও অবিভক্ত বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক) উপস্থিত ছিলেন। পুনঃ এ্যাডভোকেট কমঃ যশোদা চক্রবর্ত্তী নির্বাচিত হলেন জেলা সম্পাদক পদে। এই সম্মেলনের কিছু দিন পূর্বে লেখক পার্টির সদস্য পদ অর্জন করে প্রতিনিধি হিসাবে সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। কমিউনিষ্ট পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞ প্রত্যাহারের পর লেখকের নজর বন্দী আদেশও প্রত্যাহার হয়ে যায়।

কদুরখিল জেলা সম্মেলনের কয়েক মাস পর ১৯৪৩ সালে লেখকের স্ত্রী মারা যান। এই সময় লেখক গ্রামের বাড়ীতে অবস্থান করছিলেন এবং কৃষিকাজের সাথে কৃষক সমিতির কাজেও আত্মনিয়োগ করেন। দিনের বেলায় কৃষিকাজ, রাতের বেলা কৃষকদের মধ্যে পাড়া বৈঠক করে ঘুরতেন। কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যু জনিত কারণে এই সময় লেখক সাংঘাতিকভাবে শারীরিক ও মানসিক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। অনেকটা উদভ্রান্ত অবস্থা। অতঃপর স্ত্রীর মৃত্যুর সাত দিনের দিন পার্টির জিলা নেতা কমরেড বঙ্কিম সেন, পরেশ দাস নামে আর এক কর্মীকে পাঠিয়ে লেখককে বাড়ী হতে শহরে এনে, ঐ দিনেই নয়াপাড়া নামক গ্রামের পশ্চিম পাড়ায় নিয়ে এলেন। ঐ খানে ছিল কমঃ বঙ্কিম সেনের নিজ বাড়ী।

নয়া পাড়ায় এসে লেখক অনেক খানি সুস্থ হলেন। ঐ গ্রামের পরিবেশ ছিল অত্যন্ত সুন্দর ও সুশৃঙ্খল। এই গ্রামের শতকরা ৯৫% টি, পরিবার ছিল কমিউনিষ্ট পার্টির সাথে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা। ছিল শতাধিক পার্টি সদস্য ও কর্মী এবং নেতা। তার মধ্যে নারী পুরুষ মিলে ১২/১৪ জন পেশাদার বিপ্লবী যথা—সর্ব কমঃ বঙ্কিম সেন, মনোরঞ্জন সেন, প্রভাত সেন শৈলেন সেন, শচীন নন্দী, সুব্রতা নন্দী, বাসন্তী সেন, জ্যোতিদি, অমিয়া সেন, অর্ধেন্দু পালিত, মধুসিংহ, যোগেশ শ্যাম, জ্যোৎস্না শ্যাম ও সুচারু সেন এবং সুবোধ রায়।

এখানে বসেই লেখক পার্টির আহবান গ্রহন করে পেশাদার রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

যদিও এই সিদ্ধান্ত তিনি সেই দিন রাতেই মনে মনে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন যে দিন রাতে তাঁর স্ত্রী মারা যান। ফাঁসীর রশি কেটে মৃত দেহটি মাটিতে নামিয়ে স্ত্রীর মস্তকটি রাখলেন নিজের কোলের উপর, তারপর আপন মনে মন্ত্র উচ্চরণের ন্যায় স্বগত বললেন ''হে মোর প্রিয়তমা! তুমি মরে আমাকে চিরকালের তরে মুক্ত করে দিয়ে গেল, তুমি না মরলে আমার সর্বক্ষণের রাজনৈতিক কর্মী হওয়ার আকাঙ্খা অপরন থেকে যেতো, তাই তোমাকে গভীর উষ্ণ আলিঙ্গন ও স্নেহ চুমু দিয়ে চিরতরে বিদায় দিচ্ছি। সত্যিই তুমি একটি মহৎ কাজ সাধন করে গেলে, তোমাকে পুনঃ আলিঙ্গন করছি।''

এই সময়ে জাপানী সাম্রাজ্যবাদ বার্মা দখল করে নিয়ে চট্টগ্রামের উপর হামলা শুরু করেছে। পার্টির জেলা কমিটি যুদ্ধকালীন সময়ের জন্য

একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। সিদ্ধান্তটি ছিল ঃ
যদি চট্টগ্রাম জাপানীদের দখলে চলে যায়, তাহলে পার্টি সদস্য ও পারিবারের বড় অংশ (যারা ঘোর পরিচিত) অনধিকৃত অঞ্চলে চলে যাবে।

এই সময়ে আরও একটি ঘটনা ঘটেছিল। চট্টগ্রাম শহরে লাল দিঘীর মোড়ে ছিল জেলা পার্টির কেন্দ্রীয় অফিস। (রাস্তার পশ্চিম পার্শে দোতালায়) একদিন মুসলীমলীগের পাণ্ডারা দিনের বেলা সকাল ১০ টায় ঐ অফিস দখলের জন্য দল বল নিয়ে হামলা করে। সকাল ১০টা হতে বেলা দুইটা পর্যন্ত খণ্ড যুদ্ধ হয়। চার ঘণ্টা খণ্ড যুদ্ধে প্রায় শত খানেক লীগ পাণ্ডা আহত হয়। পার্টি কর্মী ও নেতারা কেহই আহত হয়নি। অবশেষে পুলিশের লোক এসে অফিস ছাড়তে পার্টিকে বাধ্য করে। অথচ চার ঘণ্টা ধরে যারা অবৈধ বে-আইনী আক্রমণ চালালো তাদের গায়ে আচড় না দিয়ে তাদেরেই দিয়ে দিল অফিসের দখল।

এই দুই ঘটনার প্রেক্ষিতে জেলা কমিটি সিদ্ধান্ত করল এর পর থেকে জেলার মূল নেতারা গোপনে গিয়ে কাজ করবেন। অন্যেরা প্রকাশ্যে থাকবে। কাজ চলবে গোপন ও প্রকাশ্যে। যেখানে যে ভাবে সম্ভব সেইভাবে।

এই সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে লেখককেও গোপনে যেতে হয়। শুরু হল গোপন জীবনের মহড়া। সন ১৯৪৮ সালের আগষ্ট মাসের শেষের দিক থেকে। তামাম পূর্ব বাংলায় তখন শক্তিশালী কমিউনিষ্ট পার্টি। পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাড়া সব গুলি জিলাতে জেলা কমিটি রয়েছে। কাজেই কম করে হিসাব করলেও হাজার খানেক কর্মী ও নেতা গোপনে যায়। তবে লেখকের ন্যায় আর কেহই এক নাগাড়ে বাইশ বছর ধরা না পড়ে আত্ম গোপনে থাকতে পারেনি। এর মূল ছিল গোপনে থাকার বিষয়ে লেখকের নিজস্ব সৃজন শীল দৃষ্টি ভঙ্গি ও বৈশিষ্ঠ্য। সে বৈশিষ্ট্যগুলি অন্য কোন নেতার মধ্যে তেমন সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ ও বিকাশ ঘটেনি। সেই বৈশিষ্টগুলির একটা অংশ পাঠকদের দরবারে পরিবেশন করার জন্যই লেখক নিজের অতীত স্মৃতি চর্বন করে এই রচনা লিপিবদ্ধ করেছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই বই পড়ে পাঠকগণ একদিকে যেমন রস উপভোগ করবেন, অন্যদিকে আগামী দিনে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এই বইতে বনিত লেখকের অভিজ্ঞতা গুলি ক্ষেত্রবিশেষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক হবে। এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে লেখকের বাইশ বছরের আত্মগোপন জীবনের কম করে হলেও

হাজার খানেক রোমাঞ্চকর কাহিনী থেকে বাছাই করে মাত্র ত্রিশ–চল্লিশটি কাহিনী এই বইতে প্রকাশ করা হল।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, এই সময় থেকে লেখক পার্টির জেলা নেতৃত্ব থেকে ক্রমে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের দায়িত্ব পালনে বিবর্তিত হন এবং চট্টগ্রামের প্রতিটি শ্রমিক সংগঠনের গোড়া পত্তনের মধ্যে দিয়ে ক্রমে শক্তিশালী শ্রমিক আন্দোলন বিস্তার করতে মুল ভূমিকা পালন করেন। গোপনে থেকেই তিনি রেল, ডক, বন্দর. বিদ্যুৎ, জুট, কটন, ওয়াপদা, ওয়াসা, ব্যাঙ্ক সওদাগরী ফারম ইত্যাদি শ্রমিক সংগঠন ও আন্দোলন গড়ে তোলেন। এই সমস্ত কাজে তিনি পার্টিকে প্রধান ভূমিকায় রাখেন। পার্টির ও পার্টি কর্মীর দ্বারা শ্রমিক আন্দোলন সংগঠন পরিচালনা করেন। অপর দিকে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক সুখ-সুবিধার সাথে রাজনৈতিক আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে সমন্বয় করেন। কোন অবস্থাতেই শ্রমিক আন্দোলনকে অর্থনীতিবাদ, সংস্কারবাদ, এবং সংকীর্ণতাবাদের গলিতে ঘুর পাক খেতে দেন নাই। মাঝে মধ্যে ভুল-ত্রুটি যে হয় নাই, তা নয়, তবে যথা সম্ভব অতি দ্রুত সেই সব ভুল শোধরাবার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। সাথে সাথে ইহাও স্বীকার করতে হয় যে বাংলাদেশ আমলের তুলনায় পাক আমলের কর্মীদের মধ্যে সততা, সংগ্রাম প্রিয়তা ত্যাগ ও নিবেদিত প্রাণ মানষিকতা অনেক অনেক উন্নত মানের ছিল। এক কথায় কর্মীদের ঐ উন্নত মানসিকতাই লেখকের সকল প্রচেষ্টাগুলোর সহায়ক ছিল। পাক আমলের ঐ একই কর্মী গোষ্টী বাংলাদেশ আমলে অনেক পর্য্যায়ে অধঃপতিত হয়েছে। এমন কি নেতৃত্বের এক অংশ ঐ অধঃপতনের পথ প্রদর্শক হয়েছে। এই "অধঃপতন" কার্য্যের পেছনেও বৈজ্ঞানিক কারণ রয়েছে। সে সব বিষয়ে জানতে হলে লেখকের উপমহাদেশের ও বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট বিভ্রান্তি বই দুটি পাঠ করা প্রয়োজন। সেখানে লেখক এসব অধঃপতনের কারণ অনুসন্ধান করেছে মার্ক্সীয় দর্শনের আলোকে। প্রসঙ্গত ইহাও স্মরনীয় যে অবৈজ্ঞানিক পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন দ্রষ্টাদের মধ্যে লেখকই ছিলেন প্রধান ভুমিকায়। "পিণ্ডি ও ওয়াশিংটনের" আওতামুক্ত স্বাধীন সার্বভৌম পুর্ব-বাংলা রাষ্ট্র কায়েম করাই "পূর্ব ব্যংলার কমিউনিষ্ট পার্টির আশু লক্ষ্য" এই দলিলের ভিত্তিতে সর্ব প্রথম লেখকের দুই বছর সাজা হয়। সাজা প্রাপ্ত

দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন ছাত্রনেতা কমঃ মাহাবুবউল্লাহ। পাকিস্তান ভাঙ্গার অপরাধে রাজবন্দী ছিলেন জনাব শেখ মুজিবর রহমান। রেল শ্রমিক নেতা কমঃ মকবুল আহমদ সহ আরো অনেকে। হুলিয়াগ্রস্থ ছিলেন কমঃ আবুল বাশার, আবদুল মালেক সহ পূর্ব বাংলা কমিউনিষ্ট পার্টির সকল জেলা ও কেন্দ্রীয় নেতারা। যারা স্বাধীন সার্বভৌম পূর্ব বাংলা রাষ্ট্র গঠনের লাইনকে দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরেছিলেন।

কাজেই লেখকের বাইশ বছরের গোপন জীবনের সমস্ত প্রচেষ্টাই ছিল অবৈজ্ঞানিক পাকিস্তান ভেঙ্গে স্বাধীন শোষণহীন স্বার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। এই সংগ্রামের স্তরে স্তরে তীব্র বিরোধিতা করেছেন প্রথমে মনি সিংহ এণ্ড কোম্পানী। হক-তোয়াহা-বশীর এবং সর্বশেষে মতীন আলাউদ্দীন চক্র। বাইর থেকে উস্‌কানি দিয়েছিল ভারতের চারু মজুমদার এবং উৎসাহ যুগিয়েছিল মহান চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি ও সরকার।

এই ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ ও শেখ মুজিবরের আবির্ভাবের মূলে ছিল কমিউনিষ্টদের ব্যর্থতা। কমিউনিষ্টরাই ঐ নেতা ও দলের জন্ম দাতা-লালন পালন কারী—ধাত্রী। ঐ নেতা ও দল যা করেছে তা তাদের শ্রেণী স্বার্থে করেছে। কমিউনিষ্টরা যা করেছে তা শ্রমিক ও জনগণের বিপক্ষে-গিয়েছে। এসব বিষয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও তত্ত্ব তথ্য এবং ঘটনা এই বইতে সন্নিবেশিত হয়েছে। জানতে পারবেন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রথম স্বপ্ন দ্রষ্টা কমরেড অনন্ত সিংহের রাজনৈতিক ও তাত্ত্বিক প্রজ্ঞার পরিচয়।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস পুস্তকটি এদেশের রাজনীতিতে অংশরত সর্ব মহলে নানা ভাবে উৎসাহ ও প্রেরণা যোগাবে, এবং অনেক অজানা বিষয়ে জ্ঞান অর্জনে সহায়ক হবে।

আশা করি একটি বর্ণবহুল রাজনৈতিক নেতার অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে এই বইতে বৈরী পরিবেশে কমিউনিষ্ট আন্দোলন এর চিত্র খুজে পাওয়া যাবে।

অমলেন্দু বিশ্বাস।

(১৯৭৯/৮০ সালে শ্রেষ্ট নাট্য অভিনেতা হিসেবে বাংলা একাডেমি কর্তৃক জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত)

লালবাতি

চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া থানার অন্তর্গত খিলমোগল গ্রামের দুই প্রসিদ্ধ জোতদার, শ্রী রাই মোহন সাহা ও মোঃ গুরা মিঞা চৌধুরী। (কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতা)। ১৯৩৯ সালে এই মর্মে থানায় এজেহার দিলেন যে সব কমরেড দেবেন সিকদার, যোগেন সাহা, (ক্ষুদে ব্যবসায়ী) জ্যোতিস্মর্ময় বিশ্বাস, (প্রফেসার) আবদুস ছোবান, রসিদ আহমদ, দিল্লী মিঞা ও লাল মিঞা (বর্গা চাষী) আরও ১৫/২০ জন কুখ্যাত চোর, ডাকাত, বদমায়েস লোক ও চোরের সর্দারগণ সমগ্র থানার কৃষকদের উত্তেজিত করে বহু ভদ্র, শান্ত ও অবস্থাসম্পন্ন পরিবারের জীবন ও জানমাল দুবিসহ করে তুল্‌ছে।

তারা জোর-জবরদস্তি করে জোতদারদের জমি দখলে নেওয়ার প্ররোচনা দিচ্ছে। ইতিমধ্যে বহু জমি বর্গাদার কর্তৃক জবরদখল করে চাষাবাদ শুরু করেছে। অনেক বড় কৃষকের হালের গরু রাতের অন্ধকারে হরণ করে নিয়ে জবাই করে খেয়ে ফেলেছে এবং অত্র আবেদনকারী দুই জনের তিন/চার হাজার টাকা মূল্যের দুইটি চাষের বলদ এর (যা সদ্য ক্রয় করা) পেছনের পায়ের শিরা রাতের অন্ধকারে কেটে দিয়ে চাষের অনুপযুক্ত করে ফেলে গিয়েছে।

অতএব, এর যথা বিহিত ব্যবস্থা করে অত্র থানার ভদ্র গৃহস্থগণের জীবন ও জীবিকা রক্ষা করতঃ সদ্য স্বাধীন পাকিস্তানের সুখ-শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা সরকার বাহাদুরের নিকট সবিনয়ে আবেদন করছি।

প্রকৃত ঘটনা হল অত্র থানার গরীব কৃষক ও বর্গা চাষীরা সংঘবদ্ধ হয়ে কৃষক সমিতি গঠন করেছে এবং প্রত্যেক ইউনিয়নে প্রকাশ্যে সম্মেলন করে দাবী করেছে "বর্গা জমি হতে কৃষকদের উৎখাত করা চলবেনা। দখলে রেখে চাষ কর, ফসল কেটে (নিজ) গোলায় তোল।"

এরই বিপরীতে জোতদারগণ সংঘবদ্ধ হয়ে জমি থেকে বর্গা চাষীদিগকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্র করেছে এবং নিজেরা চাষাবাদ করার জন্য গরু

পর্যন্ত ক্রয় করে নিজেরা চাষ করার প্রস্তুতি নিয়েছে। এই বদ কাজের পালের গোদা হল অত্র দুই অত্যাচারী জোতদার। এরা আবার অত্র থানার কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতা। দিনের বেলায় এরা একে অন্যের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচার করে বেড়ায়, জনসভায় জিগীর ছাড়ে, আর প্রতি দিন সন্ধ্যা বেলায় রাইমোহন সাহার বাড়ীতে বসে চাষীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জালবুনে। কৃষক সমিতি ও তার নেতাদের মুণ্ডচ্ছেদ করে।

এই অবস্থায় দেবেন সিকদার সহ অত্র এজেহারে বর্ণিত কৃষক নেতারা থানা কৃষক সম্মেলন ডেকে এই সিদ্ধান্তে এলেন যে "জান দিয়ে হলেও ধান আর জমি দখলে রাখতে হবে, জমি হতে উৎখাত করার সমস্ত ষড়যন্ত্র বানচাল করে দিতে হবে।"

কিন্তু দেশ ভাগ, হিন্দুস্থান-পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা এবং বিহার ও নোয়াখালীতে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ইত্যাদি কারণে অত্র থানার শক্তিশালী কৃষক সংগঠন সাময়িকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে সর্বত্র জমি হতে কৃষক উচ্ছেদ বন্ধ বা রোধ করা সম্ভব হচ্ছে না। এরই প্রেক্ষিতে আন্দোলনের রণ কৌশল পরিবর্ত্তন করতে হয়। অর্থাৎ রাম সুন্দর বসাকের বাল্য শিক্ষার শিক্ষানুসারে (যা বলে করা যায়না তা কৌশলে করতে হয়) কৃষক সমিতিকে কৌশল পরিবর্ত্তন করে পরিক্ষামূলক ভাবে অত্র দুই জোতদারের সদ্য খরিদ করা দুই বলদ এর পেছনের পায়ের গোড়ালীর উপরের রগ রাতের অন্ধকারে কেটে দেওয়া হয়। এতে করে ঐ বলদ দুটি লাঙ্গল বহন করার অযোগ্য হয়ে পড়ে।

এর পরও যদি জোতদারগণ জমি হতে চাষী উচ্ছেদ কর্মে বিরত না হয়, তা হলে পরবর্তীকালে আরও ব্যাপক ও উন্নতমানের রণ কৌশল প্রয়োগ করা হবে।

স্থানীয় জোতদার গণ কর্তৃক লিখিত এজেহার পেয়ে রাঙ্গুনিয়া থানার দারোগা সাহেব নতুন উদ্যমে কাজে নামেন, তবে একটু বেকায়দায় পড়তে হয়—এজেহারে বর্ণিত প্রথম তিনজন আসামীর জন্যে। বিশেষ করে তাদের দলপতি দেবেন সিকদার রাতের অন্ধকারে গরু চুরি করে নিয়ে গিয়ে জবাই করে খেয়ে ফেলেছে। এই কথাগুলি কাহাকেও বিশ্বাস করানো যাবে না। তাতে কি আসে যায়? জোতদারদের নীতি কথা হলঃ কুখ্যাত হিট্‌লারের দোসর গোয়েবেল্‌শের শিক্ষানুসারে প্রতি দিন, প্রতি মুহূর্তে

হাজার হাজার মিথ্যা প্রচার করে যাওয়া, যার থেকে জনগণ যদি একটাও বিশ্বাস করে তাহাই তাদের লাভ। এই নীতিতে অটল থাকা। জনগণ বিশ্বাস করুক আর না করুক, আদালতে প্রমান করতে পারি আর না পারি—অন্ততঃ হয়রানীত করা যাবে। হাজত বাসতঃ হবে।

সদ্য এজেহার, তার সাথে নগদ নজরানা পেয়ে থানার দারোগা সাহেবরা বেশ উৎসাহিত হয়ে কর্তব্য পালনে এগিয়ে এসেছে। বেশ কয়জন নেতার বাড়ীতে ও ডেরায় হামলা করেছেন। প্রথমে জিজ্ঞাসাবাদ, ঈশারায় নগদ নারায়ণ মুদ্রার দাবী, কিন্তু কোনদিকে সুবিধা হলনা। অগত্যা তারা কয়েক জনকে গ্রেপ্তার করার সিদ্ধান্ত নিলেন। এই খবর আগে ভাগে দিয়ে গেলেন একজন সিপাহী ও বড় দারোগার বাসার চাক্‌রানী। যারা কৃষক সমিতির বিশ্বস্ত সদস্য ও দরদী।

এহেন অবস্থায় কৃষক সমিতির প্রধান সংগঠক একদিন গভীর ভাবে চিন্তা ভাবনা করে কয়েকজন কৃষক নেতাদের ডেকে পাঠালেন এবং যথা সময়ে তারা এলেন। (আবদুস ছোবান, রসিদ আহমদ, লালমিঞা) এরা কৃষক সমিতিতে যোগদানের পূর্বে মাঝে মধ্যে চুরি-ডাকাতি করতো। সেই সুবাদে কয়েকবার "শ্রীঘর" দর্শন হয়েছে। সমিতিতে আসার পর এরা সত্যিকারের "নিজামুদ্দীন আউলিয়া" হয়ে গেছেন।

দল নেতা হিসেবে সিকদার এসব জানতেন। কারণ কৃষক সমিতির কর্মীরা নেতার নিকট কিছুই গোপন রাখেনা। তিনি তিন জনকেই লক্ষ্য করে বললেন তোমাদের পুরাতন বন্ধুদের (অন্যান্য চোর ডাকাতদের) একবার খবর দাও, আমি তাদের সাথে একবার কথা বলতে চাই। প্রথমে তারা নেতার কথায় বিশ্বাস করতে পারেনি। পরে যখন স্থান, তারিখ, বার ও সময় দেওয়া হল—অর্থাৎ অমুক তারিখে পারুয়ার জঙ্গলে, দিনের দুটার সময় অত্র থানার সমস্ত চোর-ডাকাতদের এক সমাবেশ আহবান করা হল।

যেমন নেতা, তেমন কর্মী, হুকুমের সাথে সাথে আটচল্লিশ ঘন্টার নোটিশে প্রায় ৫০/৬০ জন বাছাই করা চোর-ডাকাত পারুয়া ইউনিয়নের এক পাহাড়ে জড়ো হল। প্রথমে তাদের সামনে একটি ছোট সংক্ষিপ্ত বক্তব্য হাজীর করা হল ঃ বন্ধুগণ! আপনাদের এখানে ডাকা হয়েছে একটি বিশেষ কারণে, একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের নিমিত্তে ; তারও আগে আমাদের

দুই চারটি কথা রয়েছে আপনাদের নিকট! কথাটি হল মানুষ জন্ম লগ্নথেকে চোর-ডাকাত, সাধু-দরবেশ হয়ে জন্মায়না। জন্মের পর নানা পরিবেশের সংঘাতে, সামাজিক ও পরিবারিক কারণে, জীবন ও জীবিকার তাগিদে ভিন্ন ভিন্ন পেশা অবলম্বন করতে বাধ্য হয়। আপনারা চোর-ডাকাত হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন, এজন্য আপনারা দায়ী নন্ সমাজই দায়ী। এই শোষণ লুন্ঠন মূলক সমাজে শত ইচ্ছা থাকা সত্বেও আপনারা সৎভাবে জীবন যাপন করতে পারছেন না। ধনী বড়লোক ও জোতদার-মহাজনেরা নানান বদ উপায়ে আপনাদের উপর শোষণ ও জুলুম চালিয়ে, মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে আপনাদের দারিদ্রের শেষ সীমায় পৌঁছিয়ে দিয়েছে; যার ফলে আজ আপনারা রিক্ত, ভূমিহীন, বর্গাচাষী, ক্ষেত মজুর, ক্ষেত্র বিশেষে সন্তান সন্ততির দায়-দায়িত্ব পালনের জন্য হয়েছেন চোর-ডাকাত। জমি নেই যে চাষাবাদ করে খাবেন, পুঁজি নেই যে ব্যবসা করবেন, চাকুরী নেই যে গতর বিকাবেন। এমনি যাতাকলে পিষ্ট হতে বাধ্য হচ্ছেন।

অতএব, এই সমস্ত কারণে, আমাদের পার্টি (মজুরদের পার্টি কমিউনিষ্ট পার্টি) চোর-ডাকাত, তস্করদের ধিক্কার দেয় না, ধিক্কার দেয় সেই সমাজকে, যে সমাজে মানুষ নিরুপায় হয়ে পেটের দায়ে চোর-ডাকাত হতে বাধ্য হয়। এই সমাজই সমস্ত অসামাজিক মানুষের জন্ম দাতা। আমরা এমন একটি সমাজ গড়ে তুলতে চাই—যে সমাজে থাকবে না চোর-ডাকাত, বেশ্যা, ছেলেধরা, লম্পট, পকেটমার, হাইজ্যাকার। সব মানুষ যার যার যোগ্যতানুসারে কাজ পাবে, পাবে প্রয়োজনানুসারে খাদ্য, বাসস্থান, পোষাক, চিকিৎসা আর বৃদ্ধবয়সে আমৃত্যু পেন্‌শান্।

দ্বিতীয়তঃ আপনাদের স্মরণ করা হয়েছে অত্র থানার সমস্ত জোতদার মহাজনগণ একজোট হয়ে—আজ সমস্ত বর্গা চাষী দিগকে জমি হতে উচ্ছেদ করার ষড়যন্ত্রে নেমেছে। নানা মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে তাদের হয়রানী করছে এবং তারা নিজেরাই চাষাবাদের যোগাড় যন্ত্রের প্রস্তুতি নিচ্ছে। হাজার হাজার টাকা খরচ করে হালের বলদ ও তাদের খাদ্য শুকনা ঘাস (চিনের গাদা) ক্রয় করছে, স্থানীয় মজুরের পরিবর্তে উচ্চ মূল্যে ভিন্ন থানার মজুর আমদানীর ষড়যন্ত্রে মেতেছে। এই অবস্থায়

অত্র থানার বর্গা চাষীরা শুধুমাত্র জমি থেকে উচ্ছেদ হচ্ছে না, সাথে সাথে কর্মহীন বেকার হয়ে পড়ছে।

অতএব, বন্ধুরা ঐ বর্গাচাষীদের সাথে আপনাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে পরস্পরের স্বার্থে-সাহায্যে হামদরদী মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে, এই কারণে আমরা আপনাদের সামনে প্রস্তাব রাখছি—আজকের এই মহতী তথাকথিত অসামাজিক মানুষের সভা—এই মর্মে সিদ্ধান্ত করছে যে, অত্র থানার অত্যাচারী জোতদার-মহাজনদের শায়েস্তা করার জন্য ও তাদের কৃষক উচ্ছেদের নামে ঘৃণ্য কাজকে প্রতিরোধ করার প্রয়োজনে একটি প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হউক।

অতপর, এই কমিটির প্রথম কাজ হবে, একটি সুনির্দিষ্ট দিনে, রাতের বেলায়, সুনির্দিষ্ট সময়ে একযোগে অত্র থানার সমস্ত অত্যাচারী জোত-দারের খড়ের গাদায় (স্তুপে) আগুন লাগাতে হবে। যাতে করে সমস্ত শুক্‌নো ঘাস পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ঘাসের অভাবে যেন তারা গরু পুষতে না পারে, নিজেরা চাষ করার কাজ হতে যেন বিরত হতে বাধ্য হয়। এর পরবর্তী করণীয় হবে জোতদারদের সামাজিক ভাবে বয়কট করা, তাদের বাড়ীতে কেহ মজুরী না করা।

আমার প্রস্তাব শুনে এদের মধ্যে কেহ কেহ মন্তব্য করলেন এমন একটি ক্ষুদ্র কাজের জন্য আপনি কষ্ট করে এসে সভা করলেন? যার কোন প্রয়োজন ছিলনা। সামান্য একটি খবর দিলেই সেরে যেত। আমরা ভাবতে ছিলাম না জানি সিকদার বাবু কতবড় গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব অর্পন করবে। সকলে আনন্দ-উৎফুল্ল মনে প্রস্তাবটি গ্রহণ করল এবং এই ধরনের সভা মাঝে মধ্যে আহবানের জন্য অনেকে অনুরোধ জানাল।

এরই ৫/৬ দিন পর রাত দুই কি আড়াইটায় দেখা গেল তামাম থানা ব্যাপী কেবল আগুন আর আগুন। এযেন দাবানল। সমস্ত অত্যাচারী জোতদার, মহাজন, জমিদারের খড়ের গাদা দাউ দাউ করে জ্বলছে আর পুড়ছে। সে এক রোমহর্ষক দৃশ্য। কোন কোন স্থানে চিঠি লিখে জোতদারদের ধমক দেওয়া হয়েছে "এর নাম 'এক নম্বর লালবাতি' তারপর আসবে ২ নম্বর"। যার আগুনে গরু ও গোয়াল ঘর পুড়বে। অতঃপর ৩ নম্বর লাল বাতি জ্বলবে। যার আগুনে—থাকার ঘরের

দরজা বন্ধ করে—আণ্ডা বাচ্চা সহ জোতদারের বংশ পুড়ে নিধন করা হবে।' কৃষক সমিতির নীতি হল জোতদার খতম করা নয়, জোতদারী উচ্ছেদ করা।

পরের দিন সারা থানাময় জনগণের মধ্যে দারুণ উত্তেজনা পূর্ণ আলোচনা। বর্গা চাষী গরীব কৃষকেরা মহা আনন্দিত। জোতদার মহাজনদের মুখ শুক্না মলিন। দেখলে মনে হয় তারা সকলেই একযোগে কুইনাইন গলাধকরণ করে ঘর থেকে বের হয়েছে।

অতঃপর দিন তিন চার পর—সকল জোতদারগণ স্ব স্ব বর্গাচাষীকে ডেকে একটা চুক্তি নামায় স্বাক্ষর করে নিলেন—যাতে লিখা ছিল "বর্গা জমিতে চাষাবাদ সাবেক নিয়মনীতিতেই বহাল থাকবে এবং সমস্ত মামলা প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে। "এরই নাম লাল বাতির খেইল।"

নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ

পর পর অনেক গুলো ঘটনায় শাসক গোষ্ঠি ও তাদের দোসররা ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠলো; বিশেষকরে হিন্দুস্থান-পাকিস্তানে যারা ক্ষমতার বসেছে (কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ) তাদের ঘোরতর বিরোধী কমিউনিস্ট পার্টি এবং তৎকালীন পাকিস্তানের সংখ্যালঘিষ্ট সম্প্রদায়ের একজন কমিউনিস্ট নেতার কার্য্যকলাপ তাদের আত্মমর্য্যাদায় দারুণ ভাবে আঘাত হেনেছে। উপরন্তু তখন উভয় রাষ্ট্র সম্পর্কে সাধারণের ধারণা ছিল—দেশ সত্যিকারভাবে স্বাধীন হয়েছে; বিশেষ করে মুসলীম জনগণের মধ্যে এ বিশ্বাস আনা হয়েছে যে, সুদীর্ঘ দুইশত বছর পর মুসলমানগণ পুনরায় স্বাধীন হল এবং ভারত উপমহাদেশে তারা যে একটি পৃথক জাতি এই স্বীকৃতি অর্জন করল।

পুলিশের বড় সাহেবের উপস্থিতিতে রাঙ্গুনিয়া থানায় যে গোপন সভা বসেছিল, সেই সভাতেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, যে ভাবেই হউক (ছলে বলে কৌশলে) দেবেন সিকদার ও তদীয় সাঙ্গপাঙ্গদের সায়েস্তা করতে হবে।

অতি উৎসাহী থানা আনসার কমাণ্ডার কাজী নূরুল ইসলাম সাহেব নিজ থেকেই ঘোষণা করেছিল সাত দিনের মধ্যে তিনি এই দায়িত্ব সম্পন্ন করতে সক্ষম হবেন।

এক দিন দুই দিন করে ছয় দিন অতিবাহিত হয়ে গেল, কিন্তু দেবেন সিকদারকে বাগে পাওয়া গেল না।

সাত দিনের দিন ভোর বেলা উত্তর রাজা নগরের ধামাইর হাটের একই চায়ের দোকানে দুই জনের সাক্ষাৎ হয়ে গেল। এর আগের দিন রাতে আমি ছিলেম উত্তর রাজানগর গ্রামের প্রাইমারী শিক্ষক ও প্রসিদ্ধ সমাজ সেবক কমরেড ব্রজেন পালের বাড়িতে। তিনি ছিলেন অনেক গুলি জন-কল্যাণ মূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত।

চা-নাস্তা খেতে খেতে একথা সে কথার পর, আনছার কমাণ্ডার নূরুল ইসলাম পরিকল্পিত ভাবে ঝগড়া সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আবোল-তাবোল বক্‌তে শুরু করল। কিন্তু উপস্থিত চা পানরত জনতার বেশীর ভাগের সমর্থন না পেয়ে আরও বেশী উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। নানা কারণে তার পক্ষে উত্তেজিত হওয়া ছিল স্বাভাবিক ঘটনা। প্রথমতঃ বয়স তার লাগামহীন, ২৫/২৬ এর মধ্যে, ২য়তঃ বাড়ী তার দুইশতগজের মধ্যে, (সাধারণতঃ বাড়ী নিকটে হলে দুর্বল কুকুর সাহসী হয়।) উপরন্ত তিনি প্রসিদ্ধ কাজী পরিবারের সন্তান। তদুপরি তিনি থানার আনছার কমাণ্ডার। এবং পুলিশের বড় কর্তার আশির্বাদ পুষ্ট। সর্বোপরি তিনি ছিলেন সদ্য ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শাসক গোষ্ঠির একান্ত সেবাদাস। যদিও শ্রেণী হিসেবে তিনি সাধারণ বিত্তহীন মধ্যবিত্ত। শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী ম্যাট্রিকুলেট, যার জন্য সে ছিল অত্যন্ত দাম্ভিক।

শেষ পর্যন্ত যুক্তি তর্কে না পেরে তিনি এমন এক নাটকীয় ঘটনার অবতারণা করলেন যে, যা শুনে উপস্থিত সকলে জিভে কামড় ও কানে আঙ্গুল দিতে বাধ্য হলেন।

নাটকটি তিনি এই ভাবে বর্ণনা করলেন "গত বছর আপনার পার্টির প্রসিদ্ধ কৃষক নেতা কমরেড আবদুস সত্তার যখন স্থানীয় লালানগর হাই স্কুলে শিক্ষকতা করতেন এবং আমাদের বাড়ীতে জাইগীর হিসাবে থাকতেন ও আমার ছোট ভাই বোনদের পড়াতেন, তিনি তখন আমার এক ছোট বোনের

নিকট এক প্রেম পত্র দিয়েছিলেন। যে কারণে আমার ছোট বোনটি মনঃস্থির করে বসেন তাকে বিয়ে করার জন্য। কিন্তু কাহাকেও কিছু না জানিয়ে তিনি এ অঞ্চল ছেড়ে চলে যান। আপনাকেই ইহার জবাব দিতে হবে, জবাব না দিয়ে এই স্থান ত্যাগ করতে পারবেন না।"

ইচঁড়ে পাঁকা যুবকের আনাড়ী অভিযোগটি শুনে আমার এক দিকে হাসি পেল, অপর দিকে বেচারার যুব সুলভ চঞ্চলতার জন্য করুণা জাগল।

অভিযোগের উত্তরে আমি যা বলেছিলেম তাহল "আপনার অভিযোগটি আপনাদের পারিবারিক মান মর্যাদার সাথে জড়িত, ইহা এইভাবে প্রকাশ্য দরবারে আসা উচিত নয়। তাছাড়া যার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তিনি আমাদের দলের অন্যতম নেতা হলেও এ মুহূর্তে এখানে অনুপস্থিত। উপরন্তু এটা তার ব্যক্তিগত বিষয়, যেহেতু একজন যেকোন যুবকের সামাজিক ও মানবিক অধিকার রয়েছে আর একজন যুবতীর কাছে প্রেম নিবেদন করে পত্র লেখার, আপনার বোনের পবিত্র অধিকার রয়েছে সেই প্রেম পত্র গ্রহণ বা বর্জন করার।

অতএব, এর জন্য আমি কি করতে পারি? বড় জোর আপনার বোনের মর্মবেদনার জন্য দুঃখিত ও অনুতপ্ত হতে পারি, পারি হামদরদী হতে। কিন্তু এইজন্য কিছুতেই আমি দায়ী হতে পারিনা।"

পাঠক-পাঠিকা গণ ইতিমধ্যেই বুঝতে পারছেন দীর্ঘ দু তিন ঘন্টা ধরে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তর্ক–বিতর্কের ঝড় সৃষ্টি হওয়ায় চারিদিক হতে খবর পেয়ে প্রায় পাঁচ ছয় শত কৃষক ও পার্টি কর্মী-দরদী ঘটনা স্থলে জড়ো হয়, ফলে আনছার কমাণ্ডার সাহেব আরও বেকায়দায় পড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত উপস্থিত জনতার সামনে সিদ্ধান্ত হয়, দুদিন পর এই বিষয়ে বিচার হবে। বিচার করবেন স্থানীয় জমিদার জনাব আহমদ কবীর চৌধুরী সাহেব[১]। যিনি ব্যক্তিগত ভাবে সৎ, বুদ্ধিমান এবং উদার ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত এবং কৃষক সমিতির সমর্থক।

দুদিন পর সকাল আটটার দিকে ধামাইর হাটে লোকে লোকারণ্য। ২/৩ হাজার লোকের সমাবেশ। এলেন আনছার কমাণ্ডারের পিতা। উপস্থিত হলেন না বাদী স্বয়ং। আনছার কমাণ্ডারের পিতা কাজী সাহেব

(নাম মনে নেই) প্রথমে অর্ব্বাচীন পুত্রের কার্যকলাপের জন্য বিচারক ও বিবাদীর কাছে, সর্বশেষ উপস্থিত জনতার কাছে করজোরে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। এবং এভাবে রাগের মাথায় "নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গের" ন্যায় শিশু সুলভ কার্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন।

উপস্থিত জনতার বেশীর ভাগ ছিল বর্গা চাষী, গরীব কৃষক, ক্ষুদে ব্যবসায়ী, এবং কুটির শিল্পী, (তাতী, তেলী, কামার, কুমার ও পান চাষী।) তারা সবাই এসেছিল সচেতন ও সংগঠিত ভাবে। প্রয়োজনে পুলিশের সাথে মোকাবেলা করার জন্যও তারা প্রস্তুত ছিল। এরা সবাই আনছার কমাণ্ডার ও জোতদার মহাজনের অত্যাচারে অতিষ্ঠ ছিল।

ঘটনার শেষ পরিণতিতে প্রত্যক্ষভাবে বিচার না হলেও পরোক্ষভাবে বিচারের রায় ঘোষিত হয়েছে। বিচারের রায় কৃষক সমিতি ও পার্টির স্বপক্ষে প্রকাশ পেয়েছে। তাই কৃষক জনতা সেদিন বিজয় উল্লাস ধ্বনি সহকারে যার যার ঘরে ফিরে যেতে সক্ষম হয়েছিল। এ ধরনের খণ্ড বিজয় এ অঞ্চলে অতীতে অনেক হয়েছে। ঘটনার পরিণতি যেভাবে ঘটেছে তার জন্য সচেতন কর্মীগণ ও জনতা মানসিক ভাবে প্রস্তুত ছিলনা। তারা প্রস্তুত হয়ে এসেছিল শক্তি প্রয়োগে জয়ী হওয়ার জন্য।

০[১]—ইনি ছিলেন চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ জনপ্রিয় ডাক্তার হাশেম সাহেবের ভাগ্নে।

বাঘের উপর টাক

বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলে বিশেষতঃ চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী জেলায় বাবু বলতে হিন্দু-ভদ্রলোক, মিঞা বলতে বুঝায় মুসলিম শিক্ষিত সমাজকে। কিন্তু বাংলাদেশের জেলখানা ও থানা গুলিতে এই রীতি অচল। এখানে বরঞ্চ উল্টা রীতি অঘোষিতভাবে চালু রয়েছে। এখনও বাংলাদেশের সব থানার বড় দারোগা (ও, সি,) কে বলা হয় "বড় বাবু", সহকারী দারোগাকে বলা হয় "মেজো" ও ছোট বাবু। অনুরূপ ঢাকা জেলের সব সিপাহীর পদবী হল "মিঞা সাহেব" এবং রাজশাহী জেলের সিপাহীদের বলা হয় "বাবু" বলে। সিপাহীর ধর্ম যাই হউক না কেন?

একদিন রাঙ্গুনিয়া থানার বড় বাবুর বাসার চাকরানী (মতির মা) এসে খবর দিয়ে গেলো আজকে রাতে থানাতে বড় রকমের এক মিটিং হবে। শহর থেকে বড় বড় সাহেব সুবরা আসবে (পুলিশের এস পি, বা ডি, এস, পি)। বড় বাবুর স্ত্রী বললেন দেবেন সিকদারকে ধরার জন্য মিটিং--এ সলাপরামর্শ হবে। দেবেন সিকদার নাকি বর্ত্তমানে এই থানার মধ্যে সবচেয়ে বিপদজনক ব্যক্তি।

খবরটি আমার নিকট পৌঁছাল রাত আটটার দিকে। এতক্ষণে মিটিং শুরু হয়ে গেছে। থানার পার্শ্বেই কমরেড নরেশ চৌধুরীর বাড়ী মাত্র ১৫০/২০০ গজের মধ্যে। তিন চার মাইল দূরের খিল মোগল গ্রাম থেকে আমি আর কমরেড যোগেন সাহা সন্ধ্যার পর বের হয়ে থানার পেছন দিক দিয়ে এই বাড়ীতে এসেছি। আমার গন্তব্য স্থল পার্শ্ববর্ত্তী থানার পাহাড়তলী নামক গ্রাম। তার দূরত্ব ৫/৬ মাইলের কম নয়। যেতে হবে পায়ে হেঁটে। যান বাহনের মধ্যে আছে একমাত্র নৌযান। যে নৌযানে অনেক আরোহী থাকে, যারা আমাকে চিনে ফেলতে পারে। তাই যেতে হবে পদব্রজে। তিনজনে মিলে পরামর্শ করে যোগেন সাহাকে নরেশ চৌধুরীর বিছানায় রেখে আমরা দুজনে যাত্রা করলাম। সোজা রাস্তায় না গিয়ে মাঠের উপর দিয়ে কোনা-কুনি ইছামতি নদীর উপর যে সেতু রয়েছে সে দিকে রওনা হলাম। সেতুর উপর উঠতেই হাঁক পড়ল আনছার বাহিনীর

পাহারাদারদের। তাদের বসানো হয়েছে দেবেন সিকদারকে দেখলে থানায় খবর দেওয়ার জন্য। তারা নিজেরাই আমাদের সাবধান করে দিল তাড়াতাড়ি সরে পড়ার জন্য। যেহেতু তারা পরিচিত ও দরদী। তাদের নিকট থেকে আরও বিস্তারিত খবর পাওয়া গেল।

তবু তাদের মিথ্যা বলে দ্রুত চলে এলাম। "নৌকা যোগে শহরে যাব" দ্রুত পায়ে পথ অতিক্রম করছি। মাইল খানেক দূরে এসে (যেখানে নৌকায় যাওয়ার পথ মোড় নিয়েছে) পথ চলা বন্ধ করে এক জঙ্গলে প্রবেশ করে ঘাপ্‌টি মেরে দুইজনে চুপ করে বসে রইলাম। কারণ ধারণা করে নিয়েছিলাম, আনছার গণ যখন থানায় গিয়ে খবর পৌঁছাবে, তখন তারা তড়িঘড়ি করে দৌড় দেবে। দেবেন সিকদারকে হাতের কাছে পেয়ে ধরার জন্য। ১০/১৫ মিনিটের মধ্যে দেখা গেল একদল পুলিশ ও আনছারকে। তারা দ্রুতগতিতে দৌঁড়াচ্ছে। তারপর তারা একবার দৌঁড়ে যায় নৌকার ঘাটের দিকে, আর একবার দৌঁড়ায় পায়ে চলা পাহাড়ী পথ ধরে। এইভাবে তারা দুই তিনবার ঘুরাঘুরি করে বিফল মনোরথ হয়ে থানায় ফিরে যায়। আমরা নিজেদের গন্তব্য স্থলের দিকে রওনা হই।

ঘটনার এখানেই শেষ নয়, যেহেতু আমার সাথে নরেশ চৌধুরী ছিল, তাই তারা সদলবলে নরেশ চৌধুরীর বাড়ীতে হামলা চালায়। সেখানে পায় কমরেড যোগেন সাহাকে। তাকে গ্রেপ্তার করে তারা দৈ-এর স্বাদ ঘোলে মিটায়। পরের দিন যখন নরেশ চৌধুরী বাড়ী ফিরে আসে তখনই তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। এবং এই কারণে তাদের দুইজনকে ভোগ করতে হয় দৈহিক নির্যাতন ও হাজত বাস। দৈহিক নির্যাতনে কমরেড যোগেন সাহার বাম হাতের কব্জি ভেঙ্গে যায়। আনছার দুই জনকে হারাতে হয় আনছারিত্ব।

এই ঘটনা থেকে সবচেয়ে বড় শিক্ষণীয় বিষয় এই যে "শত্রুর গতিবিধি সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখার জন্য মতির মাকে থানার বড় বাবুর বাসায় নিয়োগ করা এবং তার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা। নতুবা আমরা তড়িৎ সাবধানতা অবলম্বন করতে পারতাম না। দ্বিতীয় শিক্ষণীয় বিষয় হল শত্রুকে কোন অবস্থাতেই দুর্বল ও বোকা না ভেবে নিজেদের বিচক্ষণতায় পথ খুঁজে নেওয়া। তৃতীয় করণীয় হচ্ছে শত্রু শিবিরে নিজেদের অনুচর রাখা। একেই বলে "বাঘের উপর টাক্।"

বিরজা (সুন্দরী) দেবী

কমরেড বিরজা সুন্দরী সাহা আমাদের সকলের বারোয়ারী মাসিমা। কমরেড যোগেন সাহার মাতা। খিল মোগল গ্রাম। থানা রাঙ্গুনিয়া, জিলা চট্টগ্রাম।

তিনি প্রৌঢ়ত্বে বিধবা হয়েছিলেন। দুই পুত্র দুই কন্যার জননী। আমার জানা মতে তিনি ১৯৪০ থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত ভাত না খেয়ে কেবল মাত্র এক মুষ্টি করে চিড়া বা মুড়ি চা এর সাথে খেয়ে জীবন ধারণ করেছিলেন সম্ভবতঃ তারও পরে ঐভাবে অনেক দিন বেঁচে ছিলেন।

ঐ মহিয়ষী মহিলার ত্যাগ ও গুণের কথা খুব সামান্যই ভাষায় প্রকাশ করা যায়। স্বল্প ভাষী, ক্ষীণকায় দেহ,ভ্রমর কুচ কুচে দেহের রং এবং চুল। বয়স ১৯৪০ সালে চল্লিশ উর্দ্ধ। ঐ দুর্বল দেহ নিয়ে তিনি সারা দিন এটা ওটা, ব্যবসার প্রয়োজনে চিড়া-মুড়ি কুটার কাজ করতেন।

ধামাইর হাটের ঘটনার পর অর্বাচীন আনছার কমাণ্ডার আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। দল বল জুটিয়ে একদিন সংগোপনে খোঁজ খবর নিয়ে তিনি লাঠি সোটায় সশস্ত্র হয়ে মাসীমা বিরজা সুন্দরীর বাড়ীতে হামলা করলেন। কমরেড যোগেন সাহা তখন জেলে। বাড়ীতে আমি আর মাসিমা এবং তার ছোট মেয়ে বিশাখা দেবী। যিনি স্বামীর নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে স্বামীগৃহ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। সারা অঙ্গে (মাথা থেকে পা পর্যন্ত) তার অসংখ্য দাগ, যা ঢেকির মুগুড়, দা খুন্তি, কাঁচি কুড়ালের আঘাতের নিদর্শন।

৫০/৬০ জন জোয়ান তাগ্ড়া আনছার নিয়ে প্রথমে বাড়ীটি ঘেরাও করে ফেলা হল। বেলা তখন দেড় কি দুইটা। সূর্য্য সাধারণ পশ্চিমে হেলে পড়েছে। আমি তখন দুপুরের খাওয়ার খেয়ে একটু গড়াগড়ি দিচ্ছি। চোখে একটু তন্দ্রার মত এসেছে। এমন সময় বাহিরে হৈ হল্লার শব্দের সাথে সাথে ঘরের মধ্যে দৌড়া দৌড়ি করে দরজা জানালা বন্ধ করার শব্দ শুনতে পেয়ে তন্দ্রা ছুটে গেল। জেগে দেখি বারান্দার দুই

দরজার সামনে মাতা কন্যা দুইজন, একজনের হাতে ধারালো দা, অপর জনের হাতে বটি-দা নিয়ে রণরঙ্গিনী মূর্তিতে মহাআক্রোশে রাঙ্গুনিয়ার সাহা সম্প্রদায়ের আঞ্চলিক ভাষায় ৫০/৬০ জন (আনছারকে) শত্রুপক্ষকে নিজেদের নিকটে আসার আহ্বান জানাচ্ছে—"আয় বলছি...কেটে দুই টুকরা করে ফেলব।"

মা ও মেয়ের মূর্তি দেখে ৫০/৬০ জন জোয়ান আনছার কেহই এগিয়ে আসতে সাহস পেল না। আবার এই অবস্থায় ১৫/২০ মিনিটের বেশী দেরী করাও যায় না। তাহলে নিকটবর্ত্তী কৃষক পাড়া হতে লোকজন এসে পাল্টা তাদের ঘেরাও করে আক্রমন করার সম্ভাবনাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায়না। বাস্তবে সেই ঘটনাই ঘটতে যাচ্ছিল। যোগেন সাহার বাড়ী হতে পাঁচশত গজের মধ্যে ছিল কমরেড আবদুস ছোবান, দিল্লি মিঞা, লাল মিঞা ও রসিদ আহমদের বাড়ী।

আমি ঘটনাটি পরিপূর্ণভাবে বুঝে উঠার পূর্বেই আনছার দল ভয়ে পালিয়ে গেল এবং দুই তিনশত নারী-পুরুষ, যুবা-কিশোরে বাড়ীটি ভর্ত্তি হয়ে গেল। সকলের হাতে লাঠি, খন্তা, দা, কুড়াল, ঝাটা। অতপর শত্রুদের পৃষ্ঠ-প্রদর্শন দেখে সকলে বিজয় উল্লাস করতে লাগল।

এখন মাসিমাকে দেখাচ্ছে শান্তশিষ্ট বাৎসল্য বৎ বঙ্গ জননী। নিজ আঙ্গিনায় আগন্তুক সকলকে বসিয়ে চিড়া-মুড়ি দিয়ে আপ্যায়ন করে ঘটনাটির ধারা বর্ণনা দিচ্ছিলেন।

এই হচ্ছে শাশ্বত বাংলার কৃষক রমনীর সত্যিকার রূপ। বাইরে সে দেখতে যতই অবলা-সরলা কোমলমতি হউক না কেন, প্রয়োজনে জমি. ফসল ও সন্তানের জীবন রক্ষার জন্য তারা হাতের নিকটে যা পায় তা দিয়ে সজ্জিত হয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে দেরী করে না। উপস্থিত বুদ্ধির ও তাদের মধ্যে ঘাটতি দেখা যায় না।

সেদিন থেকে মাসীমা বিরজা সুন্দরী (সাহা) দেবীর ব্যক্তিগত মান-মর্যাদা আরও বেড়ে গেল। তামাম থানার লোক মুখে মাসীমার জয়গাথা প্রচারিত হল। জয় মাসীমার জয়। কমরেড যোগেন সাহা জিন্দাবাদ।

সুদখোর মহাজনের দেশপ্রেম

কমরেড রাধা রমন সাহা একজন সুদখোর মহাজন। মহাজনী হল তাহার ব্যবসা। রাঙ্গুনিয়া থানার খিল মোগল গ্রামের বাসিন্দা। ব্যবসা করেন পার্বত্য চট্টগ্রামের মহালছড়ি এলাকায়।

বড় স্পষ্টবাদী, রগ চটা, বদ মেজাজী লোক। বেঁটে-খাটো লিলিপুট জাতীয় গা-গতর। বা স্কন্ধে একটি ঝুলন্ত থলে নিয়ে তিনি সব সময় ঘুরা ফিরা করেন। সময় নষ্ট বলে কোন জিনিষ তার কুষ্ঠিতে লেখা নেই। তাকে কেউ কর্মহীন অবস্থায় দেখেছে বলে প্রমাণ দিতে পারবে না। পথ চলতে চলতে হঠাৎ দেখা হলে দাঁড়িয়ে তিনি কুশলাদি জিজ্ঞেস না করে দশ কদম আগে থাকতেই বাক্যালাপ শুরু করবেন এবং চলতে চলতেই বাক্যের শেষ অংশের সমাপ্তি ঘটাবেন।

তিনি কৃপনের মহারাজ। মাথা গুণতি একটি করে "লটিয়া বা ফাত্‌রা" শুটকি সহযোগে তরকারী (ব্যঞ্জন) দিয়ে ভাত খেতে পরিবারের সকলকে বাধ্য করেন। ঠিক অনুরূপ চরিত্রের লোক ছিলেন লালা নগরের ক্ষীরোধ বসাক দম্পতি।

হাঁস, গরু, ছাগল. কবুতর তিনি পালন করেন বাড়ীতে, তবে তাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গিন্নী সহ সকল ছেলে মেয়েদের উপর দায়িত্ব ভাগ করে দিয়েছেন। ঐ গুলির আয় রোজগার থেকে নিজেদের কাপড় জামা, লেখাপড়া, ঔষধ পথ্যের খরচ সংগ্রহ করতে হবে। স্কুলে যাবার সময় থলেতে করে খাতা, কাগজ, সিলেট পেনসিল বিক্রির জন্য নিয়ে যেতে হবে। এই নিয়ম-রীতিতে কমরেড রাধা রমণের পরিবারের সকলেই অভ্যস্ত। এই ব্যবস্থাকে কেহই শৃঙ্খল মনে করেনা। সকলেই খুশী মনে কাজকর্ম করে চলেছে। সন্তান সন্ততির স্বাস্থ্য দশ ছেলেদের তুলনায় ভাল।

এহেন রাধা রমণ সাহা একদিন দুপুরে আমার ডেরায় এসে আলাপ জুড়ে দিল। প্রায় ঘন্টা দুই তিন আলাপের পর আসল ঘটনা বুঝা গেল।

সম্প্রতি (পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরের বছর ১৯৪৮) চকিদারী খাজনা বৃদ্ধি করেছে। তার বেড়েছে এক টাকার স্থলে তিন টাকা। তাও বাড়ানো হয়েছে নীচের দিকে।

২৫ টাকার উপরের দিকে বাড়েনি। যখন এমন ধরনের জুলুম শুরু হয়েছে, এমন অবস্থা দেখে আমি কি করে চুপ করে আছি ?

আমি বললাম প্রতিকারতো করতে চাই, কিন্তু যাদের পেটে ব্যথা তারা যদি না এগোয় তা হলে কি করতে পারি বলুন ?

এর উত্তরে তিনি নিজেই আজকে রাতে নিজ গ্রামে গ্রামবাসীদের সভা আহবানের দায়িত্ব নিয়ে গাত্র উত্তোলন করলেন। সত্যিই তিনি একটি অঘটন ঘটালেন। প্রতিটি পরিবারের একজন করে প্রতিনিধি সেই দিনের সভায় হাজির করেছিলেন।

সভায় সিদ্ধান্ত হল এইভাবে প্রতিটি ওয়ার্ডে বৈঠক করে, সর্বশেষে ইউনিয়ন ওয়ারী একটা জনসভা আহবান করতে হবে ; এবং সেই সভা করতে হবে ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও মেম্বার সাহেবদের উপস্থিতিতে। রাধা রমন বাবুই মূল দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।

নির্দিষ্ট দিনে যথারীতি খবরা খবর দিয়ে সভা আহুত হল। হাজার ৫/৬ লোক জড়ো হয়েছে চেয়ারম্যান সাহেবের বাড়ীর দরজায়। সব সদস্যরাও উপস্থিত। দুই একজন আসতে না চাইলেও তাদের ধরে আনা হল।

প্রাইমারী স্কুলে বসলো সভা। ভিতরে তিল ধরবার স্থান নেই। পুরাতন অভ্যাস বশতঃ ২/১ জন মেম্বার চেয়ারম্যান একটু মেজাজ দেখিয়ে কথা বলতে চাইলে জনতা উত্তেজিত হয়ে উঠলো। এক পর্যায়ে বচসা এমন এক স্তরে গিয়ে হাজীর হল যে একটা লম্বা টুল নিয়ে জনতা মেম্বার চেয়ারম্যানদেরে দেয়ালের সাথে ঠেসে ধরল। টুল দ্বারা পিষ্ট অবস্থায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরার আগে চেয়ারম্যান সাহেব টেক্স উলটিয়ে ধরতে রাজী হয়ে গেলেন। অর্থাৎ ২৫·০০ টাকা পর্যন্ত টেক্স যথাযথ রেখে, বাড়তি টেক্স ২৫·০০ টাকার উপরের দিকে হারা হারি ভাবে ধার্য্য করা হবে। এরই নাম "সোজা আঙ্গুলে ঘি উঠেনা," "ঠেলার নাম বাবাজী।"

এরপর থেকে শ্রীযুক্ত রাধা রমন সাহার উৎসাহ উদ্দীপনা বহুলাংশে বেড়ে যায়। এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের মহাজনী ব্যবসা গুটিয়ে দেশে কৃষি

কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এখন থেকে তিনি কৃষক সমিতির একজন উৎসাহী কর্মী। কৃষি কাজের ফাঁকে ফাঁকে সময় করে কৃষক সমিতির কাজ করে যাচ্ছেন।

আর একদিনের ঘটনা। একটি পাড়া বৈঠকে (ঘরোয়া) কৃষক সমিতির জেলা সম্মেলনের এককালীন অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করা হল। উপস্থিত কয়েকজন সদস্য নানা অজুহাতে চাঁদা দানের প্রতিশ্রুতি দিতে অক্ষমতা প্রকাশ করল। এমতাবস্থায় রাধা রমন সাহা নিজের জীবনের ক্ষুদ্র একটি অভিজ্ঞতার বর্ণনা করে সকলকে তাক লাগিয়ে দিলেন।

তিনি ইনিয়ে বিনিয়ে জনতার ভাষায় রসিয়ে রসিয়ে বলতে শুরু করলেন।

শোষণ দুই ধরনের। সরকার কর্তৃক শোষণ আর ধর্মের নামে শোষণ। আবার সরকারী শোষণের দুই রূপ। প্রত্যক্ষ শোষণ ও পরোক্ষ শোষণ। তার মধ্যে প্রত্যক্ষ শোষণের বেদনা হয় তীব্র। ধর্মের নামে যে শোষণ চলে তা (মোল্লা মৌলভী পীর দরবেশ ও সাধু সন্যাসীরা যে শোষণ চালায়) শোষিত হতে না পারলে ভক্তরা ব্যথিত হয়। আরও বেশী করে দেবার মন চায়।

“একদিন আমি নিজে বার্ষিক দুই টাকা বর্ধিত চৌকিদারী টেক্স কিভাবে কমানো যায় তার উপায় বের করার জন্য কমরেড দেবেন সিকদারের সংস্পর্শে আসি। তারপর ক্রমে কৃষক সমিতির কাজে জড়িয়ে পড়ি। চৌকিদারী টেক্স আমার ও সমস্ত ইউনিয়ন বাসীর (গরীবদের) ঠিকই কমেছে, কিন্তু তার পরিবর্তে মাসিক ৫·০০ টাকা করে বার্ষিক ৫ × ১২ = ৬০·০০ টাকা কৃষক সমিতিকে চাঁদা দিয়ে আসছি। এতেও আমার মন সান্তনা পাচ্ছে না। ইচ্ছে হয় আরও বেশী করে দেই।

অতএব, এই কাজে আপনারা যারা গড়িমসি করছেন, তারা এখনও এর স্বাদ বুঝতে পারছেন না। যখন স্বাদ পাবেন তখন আমার ন্যায় আরও বেশী বেশী চাঁদা দিতে এগিয়ে আসবেন, প্রতিযোগিতায় নামবেন। তফাৎ, কারও বুঝ আসে দ্রুত, কারও একটু দেরীতে।”

এই গল্পের পর একজন লোকও বাদ রইলনা যিনি চাঁদা দিতে দ্বিমত পোষণ করেন।

পুলিশের চোখের সামনে থেকে-চম্পট

পূর্ব পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতায় তখন অস্থিরতা চলছে। প্রথমে জনাব, ফজলুল হক এর নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা, তারপর জনাব আতাউর রহমানের (ওজারতির চৌদ্দ মাস) নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের দলীয় সরকার, কয়েক মাস পর জনাব অবু হোসেন এর মন্ত্রী সভা, এরপর ৯২ (ক) ধারা জারি ও গভর্নার আজম খানের আগমণ, তার গলায় মাল্য দানের জন্য উক্ত তিন মুখ্য মন্ত্রীর ঘৃণিত প্রতিযোগিতা, এমন এক সময়ে কমঃ আবদুস ছাত্তার ও অমর সেন এক জনসভার আয়োজন করেন রাউজান থানার ডাবুয়া ইউনিয়নে।

আমি তখন পার্টির জেলা সম্পাদক। চট্টগ্রাম শহরের বুকে পার্টির গোপন হেড কোয়ার্টার। শ্রমিক, ছাত্র, যুব, মহিলা ও সংস্কৃতি এবং অর্থ ইত্যাদি বিভাগের দায়িত্ব আমার উপর। তদুপরি রয়েছে নোয়াখালী জেলা পার্টি ও সারা দেশের রেল সংগঠনের সংগঠক হিসেবে দায়িত্ব। দিনেরাতে এক মুহুর্ত বিশ্রাম নেবার অবসর নেই, নজর রাখতে হচ্ছে চতুর্দিকে। সমন্বয় করতে হচ্ছে গোপন ও প্রকাশ্য কাজের।

এমন এক দিনে আমাদের গোয়েন্দা বিভাগ সূত্রে জরুরী খবর এল আইয়ুবী সামরিক শাসন আসছে। অর্থাৎ সাবধান আজকে দিবাগত রাতেই বামপন্থীদের উপর (বিশেষ করে কমিউনিস্ট পার্টির উপর) হামলা শুরু হবে। সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশ্য কর্মী-নেতাদের গ্রেপ্তার করা হবে।

খবরটা পেলাম রাত নয়টার দিকে। তখনই লোক পাঠিয়ে চারিদিকে খবর পৌছে দেওয়া হল, পার্টির সমস্ত প্রধান নেতা ও কর্মীদের হেড কোয়ার্টারে ডেকে এনে গোপন স্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হল। এঁদের মধ্যে ছিলেন আজকের হারুন-ন্যাপের সভাপতি চৌধুরী হারুনর রসিদ, মৌলানা আহমদুর রহমান আজমী, জনাব সামসুদ্দীন আহমদ, শুধাংশু দত্ত, অধ্যাপক আছাব উদ্দীন, আরতী দত্ত প্রমুখ। কিন্তু দুরবর্তী গ্রামে রাতের মধ্যে খবর দেওয়া সম্ভব হল না। ভোর রাতের দিকে জেলা কেন্দ্রের জরুরী বার্তা বাহক কমঃ মন মোহন নাথকে দিয়ে কমঃ আবদুস ছত্তার ও অমর সেনকে চিঠি লিখে জানিয়ে দেওয়া হল, তারা যেন পত্র পাঠ আত্ম গোপনে চলে যায়।

বার্তাবাহক প্রথমে কোয়ে পাড়া গ্রামে গিয়ে খবর নিয়ে জানতে পারলেন কমঃ সেন ও ছাত্তার গিয়েছেন উত্তর রাউজানের ডাবুয়া গ্রামে। যার দূরত্ব কোয়ে পাড়া থেকে প্রায় নয় দশ মাইল। অপর দিকে কমঃ সেন ও ছাত্তারকে ধরার জন্য ঐ একই সময়ে দশ মাইল দূর থানা থেকে পুলিশের দল এসে কোয়ে পাড়ায় খানাতল্লাশী চালায়।

দীর্ঘ নয়/দশ মাইল রাস্তা পায়ে হেটে আমাদের জরুরী পত্র বাহক বেলা চার ঘটিকায় উক্ত জনসভায় গিয়ে পৌছলেন। তখন সভার কাজ শুরু হয়ে গেছে। কমঃ অমর সেন সভাপতিত্ব করছিলেন, কমঃ আবদুস ছাত্তার শেষ বক্তা হিসেবে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। সভাপতি আমার চিঠি পড়ে বক্তৃতা সংক্ষেপে করার জন্য বক্তাকে কাগজে টোকা লিখে দিলেন। কমঃ ছাত্তার এসবের তোয়াক্কা না করে অনর্গল বক্তৃতা দিয়ে চলেছেন। ইহা ছিল তার চিরাচরিত অভ্যাস। একবার মাইকের সামনে দাঁড়াতে পারলে ২/৩ ঘন্টার কমে নামতে চাইতেন না। এই কারণে সাধারণতঃ আমরা জনসভার শুরুতে কমঃ ছত্তারকে বক্তৃতা করতে দিতেম। তাতে করে লোক সমাবেশ এবং তার খায়েশ দুইই পূরণ হত। অবশেষে সভাপতি বক্তার জামার নিচের দিকে ধরে টান মেরে চোখ রাঙ্গিয়ে থামতে বললেন। এই জায়গায় কমঃ ছাত্তার ছিলেন খুবই দুর্বল। কমঃ অমর সেনের ধমককে তিনি অবহেলা করতে পারেন না। তিনি এখন বুঝে নিলেন ঘটনা কোথাও গড়বর হয়েছে। কোন অশুভ ইঙ্গিত রয়েছে কমঃ অমরের ঐ ধমকের মাঝে।

বক্তব্য সংক্ষেপ করে বক্তা যখন মঞ্চ থেকে নামলেন তখন পুলিশের লোক সদল বলে এসে সভায় হাজির। নামার সাথে সাথে সভাপতি তাকে কানে কানে বলে দিলেন দ্রুত সরে পড়ার জন্য।

কমঃ ছাত্তার এদিক ওদিক একবার তাকিয়ে যে মূহুর্তে সরে পড়তে যাচ্ছেন এমন সময় থানার ও, সি সাহেব দূর থেকে সালাম জানিয়ে বলল "কমরেড ছাত্তার সাহেব! একটা কথা শুনে যান"? কমরেড ছাত্তার তার উত্তরে বললেন বসুন। বক্তৃতা দিতে দিতে গলা শুকিয়ে গেছে, একটু জল খেয়ে আসি। এই বলে তিনি আরও দ্রুত চলতে লাগলেন। দারোগা সাহেব তখন ও পেছন থেকে বলছেন, "আরে কথাটা শুনেই যান। জল না

হয় আমি আনিয়ে দিচ্ছি!' কমঃ ছাত্তার আরও দ্রুত বলা চলে তীব্র বেগে ছুটতে ছুটতে বলে যাচ্ছেন, আরে বসুন বসুন এত তাড়া কিসের? সভা শেষ হউক তারপর নিরিবিলিতে কথা হবে।

এই ভাবে কমঃ ছাত্তার গ্রামের দিকে বেশ কিছু দূর দূরত্বে গিয়ে মাঠের উপর দিয়ে জোরে দৌড় দিলেন। অগত্যা আসামী পালাচ্ছে দেখে পুলিশও পেছন পেছন দৌড়াচ্ছে। এই দিকে পুলিশ দল ছাত্তারের পেছনে পেছনে দৌড়াচ্ছে দেখে কমঃ অমর সেন সভাপতির ভাষণে জনতাকে পুলিশী আক্রমণের কথা বুঝিয়ে দিয়ে সভা সমাপ্তি ঘোষণা করে নিজেও জনতার মধ্যে গা ঢাকা দিলেন।

পুলিশ যখন কমঃ ছাত্তারের পেছনে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দৌঁড়ে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে দ্বিতীয় আসামীকে গ্রেপ্তার করার জন্য ফিরে এলেন, তখন দেখে ময়দান একেবারে ফাকা জনমানব শূন্য।

এই ভাবে সেদিন পুলিশের দল আসামীকে হাতের মুঠায় পেয়েও গ্রেপ্তার করতে পারলো না, পার্টি নেতৃত্বের তীক্ষ্ণ সজাগ দৃষ্টি ও তৎপরতা বার্তা বাহকের কঠোর দায়িত্ব বোধ ও কষ্ট সহিষ্ণুতা, আসামীদ্বয়ের উপস্থিত বুদ্ধি এবং বাঙ্গালী পুলিশের তেমন গরজের অভাব এই পলায়নে সহায়তা করেছিল।

এ ভাবে যতই দিন গড়াচ্ছে গোপন জীবনের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার স্ফীত হচ্ছে। তার থেকে শিক্ষা নিয়ে বিপ্লবী পার্টি ও নেতৃত্ব আরও কৌশলী হয়ে গড়ে উঠেছে। যাকে বলা যায় হাতুড়ে ডাক্তারের চিকিৎসা, হাজার রোগী মেরে সিভিল সার্জেন্ট হওয়া।

কেন না গোপন জীবন যাপনের উপর (কমিউনিস্টদের) তেমন কোন শিক্ষামূলক বই পুস্তক নেই, যাও বা আছে তা যার যার দেশের স্থানীয় ভিত্তিক, স্থান কাল পাত্র ভিন্নতায় তা অন্যত্র অনুসরণ করা যায় না।

তবে এই কথা সর্ব্বদাই সঠিক যে সব তত্ত্ব সৃষ্টির মূলে রয়েছে বাস্তব ঘটনা, কর্মকাণ্ড ও সংঘাত। সেই সংঘাতের সাথে সম্পর্কীত জনতাই বড় শিক্ষক। এখানে ব্যক্তির ভূমিকা হচ্ছে উদ্যোগ, উদ্দাম গতি ও ত্বরিৎ বুদ্ধি এবং আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা।

অভিনয়

গোপন জীবনে বিভিন্ন সময়ে নানান ধরণের সমস্যায় পড়তে হয়, তার মধ্যে শহরে বাসস্থান সমস্যা অন্যতম প্রধান সমস্যা। কারণ বিন্দু মাত্র সন্দেহের (পাড়া প্রতিবেশী, বাইরের কোন অপরিচিত লোক সম্পর্কে) উদ্রেক হলে তখন তখনই ঐ বাসা ত্যাগ করতে হয়। এই ক্ষেত্রে ঝুঁকি নেওয়া মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। বরঞ্চ "নো রিক্স, নো গেইন" এর স্থলে "সাবধানের মার নেই" এই নীতি বাক্য অনুসরণ করাই শ্রেয়। অতীতে কয়েকবার এই নীতি অনুসরণ করে বেশ কয়বার বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া গেছে।

অপর দিকে নেসেসিটি ইজ দি মাদার অব ইনভেনশন (Necessity is the mother of invention) এই ইংরেজী প্রবাদ বাক্যের ন্যায় অনেক সময় গরজ বড় বালাই হয়ে দাঁড়ায়, প্রয়োজনের তাগিদে অনেক কিছু করতে হয়।

এক সময় অনুরূপ এক অবস্থায় পড়ে—বাসস্থানের কিছুটা নিশ্চয়তার জন্য আমাকে অন্য এক বিবাহিতা মহিলা কমরেডের সাথে স্বামী-স্ত্রী অভিনয় করতে হয়। ঘটনাটি ঘটে ছিল ১৯৫৪/৫৫ সালের দিকে।

মহিলা কমরেডটি ছিলেন সদ্য জেল ফেরত। সম্প্রতি এক গোপন কমরেডের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। গোপন কমরেডটি ছিলেন চট্টগ্রাম কোর্ট হাজত থেকে পার্টির প্রচেষ্টায় পলাতক জাদরেল আসামী নাম কমঃ সুখেন্দু দস্তিদার ওরফে কমঃ বশীর। এই অবস্থায় মহিলা কমরেডটি প্রকাশ্যে থাকলে, তাঁহার সাথে কমরেড বশীরের দেখা সাক্ষাৎ হয়ে দাঁড়ায় বিপদজনক। ফলে মহিলা কমরেডটি স্বেচ্ছায় আত্মগোপনে আসতে হয়। উপরন্তু কমঃ বশীরের কর্ম্মক্ষেত্র চট্টগ্রামে নয়, ঢাকায়। ঢাকাতে স্ত্রী সহ গোপনে থাকার তখন কোন ব্যবস্থা ছিল না তদুপরি ঐ মহিলা কমরেডের সাথে আমার পরিচয় দীর্ঘ দিনের। ছাত্রী অবস্থায় তিনি পার্টির শরীর চচ্চা প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে ভাল খেলোয়াড় হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

সে যাই হউক। কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিনিধি কমরেড নেপাল নাগ এবং স্বয়ং কমরেড বশীরের উপস্থিতিতে জেলা কমিটির সর্ব সম্মত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে চট্টগ্রাম শহরের মধ্যে পাঠান টুলি এলাকায় বৌদ্ধ

পাড়ায় একটি বাসা নেওয়া হল। পৌনে দুই কামড়া বিশিষ্ট বাসা। অর্থাৎ ১০×৭ হাত একটি মূল ঘর + সামনে ১০×৪ হাত বারিন্দা + পেছনে ৭×৩½ হাত রান্না ঘর। বাসাটি মূলি বাশের ঘেরা, উপরে টিনের ছাউনি অনুরূপ দুই পরিবার মিলে একটি মাত্র পায়খানা ও গোছল খানা। পাশের বাসাটির ভাড়াটিয়া পার্টির একজন বিশিষ্ট কর্মী। নাম কমঃ সুখেন্দু বড়ুয়া। তিনি তখন বার্মা অয়েল কোং এর মহেশখালি ডিপোতে নক্সাবিদ হিসেবে চাকুরী করতেন। বর্তমানে চাকুরী খুইয়ে জেল খেটে দীর্ঘদিন বেকার থেকে-বহু কষ্ট ভোগ করে শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিগত ভাবে নক্সাবিদ এর ব্যবসায় লিপ্ত হয়েছিলেন। কমরেড সুখেন্দু বড়ুয়া সল্লভাষি নিরব কর্মী। মুখে সব সময় স্মীত হাসি। সহৃদয় অন্তর ও বন্ধু বৎসল লোক। তিনি থাকতেন সপরিবারে। তাঁহার স্ত্রী ছিল তাঁহার বিপরীত চরিত্রের। এমন কি দেহের রং পর্যন্ত। কমঃ সুখেন্দু ফর্সা গৌর বর্ণ। স্ত্রীটি হিন্দু সম্প্রদায়ের দেবী জগদেশ্বরীর ন্যায়। এই সমস্ত কারণে (বিপরীত স্বভাব চরিত্রের জন্য) স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যথেষ্ট মিল মহব্বত ছিল। পরস্পরকে দারুনভাবে ভালবাসত।

আমাদের বাসায় আমরা তিন জন। আমি, মহিলা কমরেড এবং আমার ছোট ভাই এই পরিচয়ে কমঃ যোগেশ শ্যাম। কমঃ যোগেশ শ্যাম হচ্ছে আমাদের সেই নয়াপাড়া গ্রামে "পুলিশ ভূত" আখ্যানের জ্যোতি দিদির ছোট বোন কমঃ জ্যোৎস্নার স্বামী। উভয়ে প্রেম করে বিয়ে করেছেন। জ্যোৎস্না তখন ঢাকা ম্যাডিক্যাল কলেজের সিনিয়ার নার্স হিসেবে চাকুরী করতেন। বর্তমানে তারা পশ্চিম বাংলার অধিবাসী এবং সি পি এম এর সাথে যুক্ত।

প্রতিবেশীদের নিকট পরিচয় দেওয়া হল আমি সুবোধ শ্যাম চট্টগ্রাম বন্দরে টালী ক্লার্ক হিসেবে চাকুরী করি। দীর্ঘদিন ব্রহ্মচর্য্য পালন করে প্রৌঢ় বয়সে বিয়ে করে সংসারী হয়েছি। ছোট ভাই যোগেশ শ্যাম স্বনামে স্থানীয় প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক। আর মহিলা কমঃ গরীব ঘরের মেয়ে। পণ বা যৌতুকের দাবী পুরণ করতে না পেরে দীর্ঘদিন বিয়ে হয়নি।

বিছানার চকি (খাট) পাতা হল বড় ঘরে দুইটি, বারান্দায় একটি। আমরা দুই ভাই শুই বড় ঘরে, মহিলা কমঃ ঘুমায় বারান্দায়। কিন্তু বাহিরের

লোককে বলা হয় আমরা স্বামী-স্ত্রী থাকি বড় ঘরে, ছোট ভাই থাকে বারান্দায় তাতে করেও রেহাই নেই, কোন কোন মহিলা, মহিলা কমরেডকে প্রশ্ন করে দুইজনে পৃথক বিছানায় কেন ঘুমাই ? এখন ও কোন সন্তান হয়নি তার আগেই বৈরাগ্য ?

পাড়াতে আমাদের বিষয়ে কোন প্রকার সন্দেহের সৃষ্টি হচ্ছে কিনা ঐ বিষয়ে খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য পাশের ঘরের কমঃ সুখেন্দু ও তার স্ত্রী, এবং সুখেন্দু বাবুর ছোট ভাইরা সব সময় সতর্ক থাকতেন। বিশেষ করে এই বড়ুয়া পাড়াতে তারা নিজেরাই বড়ুয়া। এ কারণে তাদের পক্ষে খবর রাখা সুবিধাজনক।

এখানে প্রায় দেড় বছর পর্যন্ত থাকতে পেরেছিলাম। পাড়াটি ছিল বেশ বড়। ৬০/৭০ পরিবারের বাস। শত করা ৮০ জন নিজ বাড়ীতে বাস করে, বাকী ২০ জন ভাড়াটিয়া।

বড় রাস্তার ধারে ছিলেন আর একজন হোমিও ডাক্তার। তাহার বাড়ীও এই পাড়ায়। তিনি ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বি। তিনি আমাদের ঘনিষ্ঠ দরদী ও চাঁদা দাতা। যতদূর মনে পড়ে নাম ডাঃ নিকুঞ্জ বড়ুয়া। তিনিও আমাদের পাহাড়াদার ও গোয়েন্দার কাজ করতেন। পাড়ার শেষ প্রান্তে সপরিবারে থাকতেন আর এক কমরেড প্রীতি প্রসুন বড়ুয়া। বাড়ী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন জোয়ারা গ্রামে। তিনি কাজ করতেন চট্টগ্রাম বন্দরে। আমি চট্টগ্রাম বন্দরে কাজ করি-তার এক নম্বর সাক্ষী কমঃ প্রীতি প্রসুন বড়ুয়া। তাঁর একবার স্বীকৃতিই যথেষ্ট। এই কমঃ অত্যন্ত দায়িত্বশীল নিষ্টাবান কর্মী। ব্যবহার ভদ্র মার্জিত। শ্রমজীবি মানুষ হিসেবে উন্নত মানের জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।

অতএব, এখানে থাকার পরিবেশ বেশ সুষ্ট ও অনুকূলে। কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই। যদি কিছু ঘটে বা প্রশ্নের সৃষ্টি হয়-তার উত্তর দিয়ে নিরসন করার দায়িত্ব ঐ সব কমরেড্‌দের।

নিরাপদ বাসস্থান পেয়ে চারিদিকের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে সংগঠন পাকা পোক্ত করে নেওয়া হয়। দৈনিক দুইবার আসা যাওয়া করে পার্টির সর্বক্ষণের বার্তাবাহক কমঃ মন মোহন নাথ। তাঁহার পরিচয় আমাদের অফিসের পিওন ও আমারই অধীনে কাজ করে।

জোরে সোরে কাজ চলছে। বিশেষ করে শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক ফ্রন্টে। ঐ সময়ে চট্টগ্রাম শহর ও শিল্প এলাকায় যতগুলি অফিস, কলকারখানা ছিল তার শতকরা ৯৮ ভাগে আমাদের দ্বারা পরিচালিত ট্রেড ইউনিয়ন তথা শ্রমিক সংস্থা।

যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে জয়লাভের পরে পরিবেশ আরও স্বপক্ষে। দ্রুত আন্দোলন-সংগঠন বাড়ছে।

এখানে সমস্যা সৃষ্টি হয় সামাজিকতা নিয়ে। পাড়াতে প্রায়ই বিয়ে সাদি, ক্রিয়া কর্ম, অন্ন প্রাসন, জন্ম দিবস ইত্যাদি লেগে আছে। ঐ সব অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ আসে সপরিবারে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আমি যাইনা। মহিলা কমরেডকে পাঠিয়ে দেই। কিন্তু এক অঙ্গিনায় যে সব অনুষ্ঠান হয় তাতে না গিয়ে থাকা যায় না। এতে করে ভয় ও বিপদ দুইটির সম্ভাবনা রয়েছে। যদি কোন কারণে নিমন্ত্রিত অতিথিদের কেহ চিনে ফেলে বা অন্য ভাবে আমাকে জানে?

পাড়ার প্রায় সমবয়সী থেকে ছোটরা আমাকে দাদা ও মহিলা কমরেডকে বৌদিদি ডাকতেন। মাঝে মধ্যে রঙিন ঠাট্টা তামাসা ও তারা করতেন এবং তার উত্তরে ঐ ধরণের হাল্কা রশিকতা আমাদেরও করতে হত। না করলে তো অস্বাভাবিক ঠেকত।

পাঠক-পাঠিকারা অনেকেই জানেন না যে আমি চব্বিশ বছর বয়স কাল থেকে বিপত্নীক। তদুপরি ছোট বেলা থেকেই পরিশ্রমী হৃষ্ট পুষ্ট দেহ। কালো হলেও চেহারাটা ছিল আকর্ষণীয়। মানুষ যে বয়সে সংসার পাততে যাত্রা করে আমি সেই বয়সে সমাপ্তি ঘোষণা করেছি।

এই বয়সে অনেক অনেক লোভনীয় প্রস্তাব, আকর্ষণীয় উদ্যোগ ও প্রলোভন এবং বাস্তব আয়োজনকে উপেক্ষা করতে হয়েছে। সেই সব প্রস্তাবের উদ্যোক্তারা প্রধানতঃ ছিলেন-মহিলা।

আমাদের মহিলা কমরেড্‌টি বিয়ের আগে আর এক জনের সাথে প্রেম ডোরে আবদ্ধ ছিলেন। সেই প্রেম ডোরের পুরুষটি ছিল বিবাহিত। আমারই মধ্যস্ততায় সেই সম্পর্কটি ছিন্ন করে কমরেড্‌ বশীরের সাথে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া হয়। এ বিষয়ে চট্টগ্রাম জেলখানাতে বসে কমরেড্‌ আরতি দত্ত ও প্রণতি দস্তিদার চুড়ান্ত রূপদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন।

এই সমস্ত বাস্তব ও অনিবার্য্য পারিপার্শ্বিক কারণে একদিন খালি বাসায় আমাদের দুইজনের মধ্যে সাময়িক দুর্বলতার লক্ষণ প্রকাশ পায়। পার্টির আদর্শ ও মর্য্যাদা, এবং ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব ও বিশ্বাস সবচেয়ে বড় জিনিষ। এইসব কথা স্মরণে এবং আমার অতীত অভিজ্ঞতা ও তার থেকে শিক্ষার আলোকে সেইদিন রাতেই আমরা দুইজনে এক মত হয়ে এই অস্বাভাবিক (স্বামী-স্ত্রী) অভিনেয়র ইতি টানলাম। পার্টির নিকট প্রস্তাব পাঠালাম আগামী কাল থেকেই এই অস্তানা ভেঙ্গে দেওয়া হবে। অর্থাৎ মহিলা কমরেড্‌টিকে বাপের বাড়ীতে সাময়িকভাবে সত্যিকার নাইয়র পাঠানো হবে। কারণ এই ধরণের অস্বাভাবিক অভিনয় দীর্ঘ দিন করা যায় না। তাই দীর্ঘ দেড়টি বছরের বৈচিত্রময় অথচ কষ্ট দায়ক-নাটকের পর্দা টেনে সমাপ্তি ঘোষণা করা হল।

দুঃসাহসিক পলায়ন

সম্ভবত ঘটনাটা ঘটেছিল ১৯৫৩ সালের শেষ ভাগে। দীর্ঘ কয়েক বছর বাড়ী যাইনি। বাড়ীতে রয়েছে আমার পিতা-মাতা, ছোট দুই ভাই যতীন্দ্র ও ফণীন্দ্র (সিকদার) এবং তাদের তত্ত্বাবধানে আমার দুই মাতৃহারা শিশু সন্তান। বর্তমানে যাদের নাম মন্‌জু রাণী মিত্র ও দুলাল কান্তি রায়। প্রধানতঃ তাদের দেখাও দুই চার দিন সংঘদানের জন্য নিজের ছুটি নিজেই মঞ্জুর করে সাত দিনের মেয়াদে বাড়ীর দিকে রওনা হলেম। আশ্বিন মাসের শেষ দিকে সেবার দুর্গাপূজা। ষষ্ঠির দিন সন্ধ্যায় বাড়ী পৌছলাম। সাথে ছিল আমাদের আনোয়ারা থানার বন্দর গ্রামের সাঁরদা গুপ্তের ছেলে প্রকৃতি গুপ্ত। বয়স ২৫/২৬, এবং তার কনিষ্ঠা ভগ্নি কল্যাণী বুলু রাণী বয়স ১২/১৩। বছর খানেক পূর্বে কমঃ প্রকৃতি গুপ্ত, ঐ গ্রামের কমঃ অনিল চক্রবর্তী ও কমঃ বীরেন দাস পার্টির সাথে যুক্ত হয়েছে।

বয়স কম হলেও প্রকৃতি গুপ্ত বাড়ীর কর্তা। যেহেতু সে তখন পিতৃহীন। বাড়ীতে পুষ্য মাত্র দুই জন। বিধবা মা ও ছোট ঐ ভগ্নি। ছোট্ট টিনের দুই কামরা ঘর। বাড়ীতে ছোট্ট একটি চৌবাচ্চা ও সুপারী বাগান।

চৌবাচ্চায় প্রচুর মাছ ও বাগানে প্রচুর সুপারী। ১০/১২ বিঘা ধানী জমি। প্রকৃতি এক বাপের এক আদুরে ছেলে। লিখা পড়া ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত পড়েছে। গায়ের রং গৌর বর্ণ। লম্বা ছিপ ছিপে দেহ। মাথায় কোঁকড়ানো বাবরী ঘন কৃষ্ণ চুল।

অত্যন্ত প্রাণ খোলা দিল দরিয়া কমঃ প্রকৃতি। নাম যেমন প্রকৃতি—চরিত্রও ছিল প্রকৃতির ন্যায়। আর ছিল রোমান্টিক চলন বলন অত্যধিক সাদা সিদে, সুখের মধ্যে ছিল রোজই সন্ধ্যায় সমুদ্রের তীরে বা পাহাড়ের চূড়ায় বসে নিরিবিলিতে মুরালী বাঁশী বাজানো। সমুদ্র তীর আর পাহাড় দুইটাই তার বাড়ী হতে পাঁচ-সাত মিনিটের রাস্তা। পূবে দেয়াং এর পাহাড়, পশ্চিমে সমুদ্র তীর। কর্ণফুলী নদীর মোহনা বঙ্গোপসাগরের সঙ্গম স্থল। সাগর মোহনার তাণ্ডব নৃত্য আর পাহাড়ের নিরবতা দুইটারই প্রভাব তার মধ্যে প্রবল ছিল। যখন হাঁসতো বা কথা বলত তখন সাগরের জোয়ারের ঢেউ এর ন্যায় ছল ছলিয়ে উঠতো। আবার যখন ধ্যানে মগ্ন থাকতো তখন ঘন্টার পর ঘন্টা নিরবে কাটিয়ে দিত।

তার তুলনায় তার বোনটি ছিল বিপরীত। অনেকটা অকাল পক্ক। মেয়েরা সাধারণতঃ তাই হয়ে থাকে। পুরুষদের তুলনায় অন্ততঃ আট দশ বছর আগে যৌবনের উন্মেষ ঘটে, সাথে সাথে বৈষয়িক চেতনাও বৃদ্ধি পায়। আশ্বিনের ষষ্ঠি তিথিতে সন্ধ্যাকাশে ঘন্টা দুই আড়াই জ্যোৎস্না তথা ছোট্ট চাঁদ থেকে থাকে। কিন্তু আলো হয় আবছা। সেই আবছা আলোর আলোকে আমরা জেলা বোর্ডের বড় রাস্তা ধরে বাড়ী যাচ্ছি। বাড়ী থেকে সিকি মাইলেরও কম দূরত্বে রাস্তার ধারে এক গ্রাম্য-সরাই খানা। দোকানের সামনে সুপারী গাছের পাইট দিয়ে তৈরী এক টুলের উপর বসে ২।৩ জন লোক কথা বলছে। আমরা তাদেরে পাশ কাটিয়ে দ্রুত পায়ে এগিয়ে এলাম, লোক দুইটির এক জন ছিল আমার মেয়ের শ্বশুড় বাড়ীর নিকট আত্মীয়—পেশায় কৃষক হলেও পোষাকে দফাদার। যতদূর মনে হয় ঐ আবছা আলোতে সে আমায় চিনতে পেরে ছিল (নাম মনোরঞ্জন মিত্র)।

সে যাই হউক আমার একটা বদ্ধমূল ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে আমার আশে পাশের চৌদ্দ গ্রামের লোক আমায় কোন দিন ধরিয়ে দেবে না।

সাধারণতঃ আমি বাড়ীতে আসলেই আধা ঘন্টার মধ্যেই এ বাড়ী থেকে ও বাড়ী খবর ছড়িয়ে পরতো এবং নারী-পুরুষ শিশু নির্বিশেষে শতাধিক লোক আমাদের আঙ্গিনায় জড়ো হত। সে দিনও তাই হল।

সে দিন আমাদের মাটির দালানের দোতলা ঘরের উপর তলায় ঢালাও বিছানা করে দুই পাশে দুই মেয়েদের নিয়ে অনেক বছর পর ঘুমালাম।

বেলা আটটার দিকে ঘুম থেকে উঠলাম। উঠে দেখি দুই তিন মাইল দুরের গ্রাম থেকে বোন ভাগিনা ভাগিনী ভগ্নিপতি ও নিকট আত্মীয়েরা বাড়ীতে ভরপুর। দীর্ঘ বছর পর তারা আমাকে একবার চোখের দেখা দেখার জন্য আকুল হয়ে ছুটে এসেছে। সবাইর সাথে দেখা সাক্ষাৎ করে বেলা দশটার দিকে কমঃ প্রকৃতিকে নিয়ে গ্রামের প্রায় প্রতিটি বাড়ীতে গেলাম। আমাদের ছোট গ্রামে ৫০/৬০ ঘর লোকের বাস। শতকরা ৯০ জন নিকট আত্মীয় ও গোষ্টির লোক। সকলের সাথে দুঃখ সুখের কথা বলে দুপুরে প্রকৃতিসহ মামার বাড়ীতে খাওয়ার খেলাম। গ্রাম্য প্রবাদ —মামীদের হাতে ভাত খেলে নাকি আয়ু বৃদ্ধি পায়। তাই ছোট বেলা থেকেই এই নিয়ম—মামা মামী দাদীরা চালু করেছে। আগেত এক বেলা খেয়ে চলে আসতে পারতাম। তখন তিন মামা একত্রে ছিল। এখন তাদের তিন হাঁড়ি তিন চুলা। এক মামীর হাতে খাওয়ার খেলে বাকী দুই জন রুষ্ঠ হয়, অভিমান করে। হাতে যদি তিন বেলা খাওয়ার সময় না থাকে তাহলে উঠানের মাঝখানে খেতে বসে হাঁক পাড়তাম। বড় মামী, মেজো মামী ও ছোট মামীরা—যার যার হাঁড়িতে-যা যা আছে— অল্প সল্প নিয়ে আস। তোমাদের ভাগনে ঠাকুর খেতে বসেছে। একবারে খেয়ে আয়ুটা বাড়িয়ে যাই। তিন বেলা খাওয়ার এবার সময় নেই। অগত্যা তারা সেই ভাবেই আমাকে খাওয়াইয়ে খুশি করে বিদায় দিল।

পরের দিন সন্ধ্যায় বাড়ীর উঠানে বসলো ছোট খাট এক জনসভা। পার্শ্ববর্তী ১০/১২টি গ্রাম থেকে এসেছে নিকট আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবরা। দুই চার জন ছাত্র শিক্ষক ডাক্তার তারা জানতে চায় আমাদের পার্টির নীতি আদর্শ আর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি।

রাতের খাওয়ার খেলাম রাত বারটার দিকে। তারপর কমঃ প্রকৃতি ও তার বোনকে আমাদের বাড়ীতে ঘুমাবার ব্যবস্থা করে আমি ঘুমাতে

গেলাম আমার বাল্য বন্ধু ও রাজনৈতিক স্বতীর্থ কম: কিরণ সিকদারের বাড়ীতে এখানে স্মরণ যোগ্য যে বাড়ীতে সেবারই আমি প্রথম রাত ঘুমালাম নিজ বাড়িতে। কেননা প্রথম রাতে শত্রুরা খবর পেতে পারেনা। দ্বিতীয় রাত থেকে আর রাতের বেলায় নিজ বাড়িতে ঘুমাতাম না। সাবধানের মার নেই এই কারণে।

কমঃ কিরনের বাড়ী আমাদের পাড়ার সর্ব উত্তরের বাড়ী। আমাদের পাড়াতে সর্বমোট সাতটি বাড়ী উত্তর দক্ষিনে লম্বা। মাটির দালান। ১৯/২০টি কামড়া, ভিতরে বাইরে দীর্ঘ লম্বা দুটি উঠান। অনেকটা বিমান বন্দরের রানওয়ের মত দেখায়।

কিরনের ঘরে গিয়ে দেখি তারা স্বামী স্ত্রী খাটের উপরে শুয়ে আছে। গভীর রাতে আমি আসাতে তারা বুঝে নিল আমি এখানে রাত যাপন করব, তাই তার স্ত্রী নীচে মাদুর পেতে ঘুমাল। আমরা দুইজন ঘুমালাম খাটের উপর।

কিরনের পিতা শ্রীযুত অনর্দা সিকদার আমাদের চৌদ্দ গ্রামের শিরমনি যেমন সাহস, তেমন শক্তি; দীর্ঘ গৌরবর্ণের সুপুরুষ। বহু সুনামের পরেও তাঁহার চরিত্রের কালিমা ছিল যৌন প্রবৃত্তি তিনি ছিলেন বহু নারীর প্রিয় নাগর।

রাত তখন প্রায় দুই/আড়াইটা। এমন সময় আমাদের কামড়ার দরজায় বাইর থেকে মৃদু টোকার শব্দ পাওয়া গেল। শব্দ পেয়ে বিছানা থেকে উঠে দরজায় কান পেতে জিজ্ঞাস করলাম "কে?" উত্তরে কিরনের বাবা বললেন "দেবেন কি এখানে আছে? আমি বললাম আমিই দেবেন কথা বলছি। তখন তিনি বললেন দরজা খোল। খুললাম সাথে সাথে তিনি অন্ধকারে আমার মাথাটি তাঁহার মুখের কাছে টেনে নিয়ে কানে কানে চুপিসারে বললেন বাইরে পুলিশের দল বাড়ী ঘেরাও করেছে উপরে আস এই বলে তিনি আমায় টেনে উপরতলায় নিয়ে গেলেন।

ইতিমধ্যে পুলিশের বাহিনী বাড়ীর দুই আঙ্গিনায় সাংঘাতিক হৈ চৈ শুরু করে দিয়েছে এবং দরজা খোলার জন্য তাগিদ দিচ্ছে। আমার কাকা অন্নদা সিকদার ছিলেন বহু দূরদর্শী দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির লোক। চেহারা ছুরতে ও মেজাজে কাবুলীর ন্যায়। তিনি গম্ভীর স্বরে পুলিশকে ধমক দিয়ে বললেন এতরাতে পুলিশ হলেও ঘরের দরজা খোলা হবে না। তোমরা যে

ডাকাত নও তার প্রমাণ কি? পুলিশ দলের কর্তা উত্তরে নিজের পোষাকের উপর নিজেই টর্চ লাইট এর আলো ছড়িয়ে বললো এই দেখুন আমাদের পোষাক। তার উত্তরে কাকা বললেন আজকাল ডাকাতরা পুলিশের পোষাক পরে ডাকাতি করতে আসে।

আসলে কাকা বাবু এত সব যুক্তি তর্ক করছেন কেবল মাত্র আমাকে সময় দানের জন্য, যাতে আমি পালাবার সুযোগ সন্ধান করার সময় পাই. এর পর তিনি নিচের তলায় নেমে গেলেন। গিয়ে দুইপুত্র ও পুত্র বধুকে ঘুম থেকে তুলে নিয়োগ করলেন বারিন্দার দুই কাঠের কপাট ঠেলে ধরার জন্য। যাতে পুলিশেরা সহজে ঘরে ঢুকতে না পারে বা দেরী হয়। ইতিমধ্যে কাকী মাও এসে ছেলে ও বৌদের সাহায্য করতে একই কাজে আত্মনিয়োগ করলেন।

দরজা খুলছেনা দেখে পুলিশের ধারণা হল যে নির্ঘাত আসামী এই ঘরে রয়েছে। তাই তারা বন্দুকের বাট দিয়ে ঘন ঘন দরজায় আঘাত করতে লাগলেন।

একেত নতুন কপাট, মাঝখানে পাতবারি উপরে নিচে লোহার সিটকানি, তার উপর এক এক দরজায় তিন তিন জন মানুষের প্রতিরোধ। বন্দুকের বাট দিয়ে ও দরজা ভাঙ্গা সহজ নয়। প্রায় পনর-বিশ মিনিট পর্য্যন্ত তারা পুলিশকে ঠেকিয়ে রাখলো।

ইতি মধ্যে আমি দোতালার চারিদিক ঘুরে দেখলাম পুলিশের অবস্থান। চতুদিকে দুইজন করে আট জন নিয়োজিত। তারা উঠানের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে পদচারণা করছে। দৃষ্টি সকলের ঘরের দিকে। ঘরটি দুই কামরা বিশিষ্ট একটি মাটির দালান। দালানের তিন দিকে উঠান। (পুর্ব-পশ্চিম ও দক্ষিণে) কেবল মাত্র উত্তর দিকে রয়েছে চাল কুমরার একটি মাচাং বা জাঙ্গলা। সেই দিকে একজন মাত্র সেপাহী একটু দুর থেকে পুকুরে যাওয়া-আসার পথ ধরে পদ চারণা করছে। এই পাশ দিয়ে বের হওয়ার প্রচেষ্টা নেওয়ার মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম। প্রথমে ঠিক করলাম সিপাহীটি যখন পুকুরের দিকে মোড় নেবে, তখন উপর থেকে লাফ দিয়ে মাটিতে পড়ে সিপাহীকে পেছন থেকে আক্রমন করবো। অর্থাৎ জুজুৎসু প্রয়োগে কাবু করে বের হয়ে যাব।

পরনে ছিল লুঙ্গি, কোমরে গামছা বেঁধে যে মুহূর্তে লাফ দেব এমন সময় একটা কড়া হুইসেল বেজে উঠ্লো। হুইসেলের সাথে সাথে যে যেখানে ছিল সবাই এসে পশ্চিমের উঠানে লাইন দিয়ে দাড়িয়ে গেল। ইহাই সামরিক শৃঙ্খলা। ফলে আমার বের হয়ে যাওয়ার পথ উন্মুক্ত হয়ে গেল। পুলিশ দলের নেতা কর্কশ ভাষায় নির্দেশ দিচ্ছে শুনতে পেলাম “এ বাড়ীতেই আসামী আছে জোর করে দরজা খুলতে হবে, সাথে ৫/৭ জন এক সাথে গিয়ে দরজায় বন্দুকের বাট দিয়ে আঘাত করতে লাগলো।

এই অবসরে আমি মাটির দেওয়াল ঘেষে দোতালা থেকে ঝুলে পড়লাম মৃদু শব্দ হল বটে, কিন্তু সেই শব্দ বন্দুকের আঘাতের শব্দের আড়ালে তলিয়ে গেল। আমি ক্রলিং করে (বুকে হেটে) কুমরার মাচাং এর তল দিয়ে, আনারস গাছের ফাঁকে ফাঁকে উত্তর দিকে পুকুরের গিয়ে পৌছিলাম। শরৎ কালে পুকুর ভতি পানি। পুকুরে নেমে ডুব সাতার দিয়ে উত্তর পাড়ে এক কোমর পানিতে দাঁড়িয়ে অবস্থা কিছুক্ষণ পর্য্যবেক্ষণ করলাম। বাড়ীতে তখন তুমুল বচসা চলছে। কিছুই বুঝা যাচ্ছেনা, আমি তখন কাল বিলম্ব না করে পুকুরের পাড়ে উঠে; লুঙ্গি গামছা ও গেঞ্জির পানি নিঙ্গড়িয়ে পশ্চিম পাড়ার দিকে রওনা হলাম। রাত তখন অনুমানিক সাড়ে তিনটে।

পশ্চিম দিকে দুইশত গজ দুরে ছিল পশ্চিম পাড়ার শ্বশান। অন্ধকার শ্বশানে পৌঁছে প্রথমে শরীরের সমস্ত লোমগুলি খাড়া হয়ে যায়, রক্ত শির শির করে দ্রুত বেগে মাথায় উঠে পুরাতন সংস্কার জনিত কারণে। কিছুক্ষন নিরবে দাঁড়িয়ে নিজ দেহ-মনকে সংযত অবস্থায় এনে গাছে উঠলাম। উঠে একটি ডালের সংযোগ স্থলে বসে গামছা দিয়ে নিজ দেহকে গাছের ডালের সাথে বেঁধে নিলাম। তারপর নিশ্চিত মনে দিলাম ঘুম। এক ঘুমে রাত ভোর হল। পাখীর কিচির-মিচির শব্দে জেগে উঠে গামছার বাধন খুলে নিকটে পশ্চিম পাড়ার ধনঞ্জয় বাবুর বাড়ীতে গেলাম। ধনঞ্জয় বাবুর ছোট দুই ভাই আমাদের পার্টির কর্মী। কমঃ শ্রীমন্ত ও সুমন্ত। শ্রীমন্তের ঘরে গিয়ে তাকে শোয়া অবস্থায় বিছানায় পেলাম। আমাকে দেখে সে প্রথমে আশ্চর্যান্বিত হল। তাকে বললাম আগে এক চিলিম তামাক দাও। তারপর অন্য

কথা। তামাক টেনে মন-মেজাজকে একটু সতেজ করে খোজ খবর নেওয়ার জন্য বাড়ীতে তাকে পাঠালাম। অল্পক্ষণ পর খরর নিয়ে সে ফিরে এল। খবর হল নিম্ন রূপ ঃ

এই অভিযানে ৭০/৮০ জন পুলিশ, আনসার ও চকিদার দফাদার অংশ গ্রহণ করে। প্রথমে তারা আমাদের পাড়ার সমস্ত বাড়ীগুলি ঘেরাও করে। পরে সিকদার বাড়ী হতে জরুরী আহবান পেয়ে সকলেই সেই বাড়ীতে গিয়ে হাজির হয়। সেই বাড়ীতে আসামীকে না পেয়ে তারা বাড়ীর মালিক অন্নদা সিকদারকে ভৎর্সনা করে। এই বলে সে ঘরের দরজা খুলে দিতে দেরী করল কেন? বাড়ীর মালিকের জবাবটা ছিল, রাতের বেলা ঘরের দরজা খুলতে আমি বাধ্য নই। আজ কাল পুলিশের পোষাক পড়ে অনেক বাড়ীতে ডাকাতি হয়ে থাকে। তাছাড়া রাতের অন্ধকারে বাড়ী খানা তল্লাশী করার কোন আইন নেই। অগত্যা অভিযানের সর্দ্দার খবরদাতাকে ভৎর্সনা করল। কারণ এই অভিযানে সরকারের যথেষ্ঠ টাকা খরচ করতে হয়েছে।

খবরদাতা সরাসরি শহরে গিয়ে আইবি'র বড় কর্তার সাহায্যে এই অভিযানের আয়োজন করে। তার অভিলাশ ছিল দেবেন সিকদারকে ধরে দিয়ে দশ হাজার টাকার পুরস্কারটি লাভ করা। শেষ পর্যন্ত তারা মূল ব্যক্তিকে ধরতে না পেরে দৈ এর স্বাদ ঘোলে মিটালো। কমঃ প্রকৃতি গুপ্তকে ধরে নিয়ে যায় তারা। তাদের আশা এর মাধ্যমে কিছু খবরা খবর পাওয়া যাবে। প্রায় মাস দুই পরে প্রকৃতি গুপ্ত তিন লক্ষ টাকার জামিনে মুক্তি লাভ করেন। ইহা এই ধারার মামলার জন্য অত্যধিক। নিছক আক্রোশ বশতঃ পুলিশের লোক এই ব্যবস্থা অবলম্বন করে। এই মামলাতে জড়িয়ে প্রকৃতি গুপ্তের ৮/১০ টাকা ক্ষতি হয়। এই ঘটনার পর থেকে আরও কঠোর সাবধানতা অবলম্বন করে চলার (গোপনে থাকার) প্রয়োজন হয়ে পরে। তাতে ভাল ফল পাওয়া যায়।

সুদীর্ঘ বাইশ বছর ধরা না পরে থাকা সম্ভবপর হয়।

গুণ্ডার সর্দ্দারের দেশ প্রেম।

চট্টগ্রাম শহরের উপকন্ঠে আন্দরকিল্লা-ঘাটফারহাদ বেগ নামক স্থানে আজকের দিনে যিনি হাজী শফি বা বাবুল থিয়েটারের প্রপ্রাইটার নামে সুপরিচিত- তিনি ১৯৫০ এর দশকে ছিলেন দুর্দ্দর্শ গুণ্ডার সর্দ্দার। মোঃ শফি নামে সেই কালে দুই জন গুণ্ডার সর্দ্দার ছিল। দুই জনই উঠতি বয়সের যুবক। এক জনের বাড়ী দেওয়ান বাজার অপর জনের বাড়ী ঘাট ফারহাদ বেগ।

দেওয়ান বাজারের শফির বোনকে বিয়ে করেছে—ঘাট ফারহাদ বেগের শফি। সেই বিয়ে যেমন তেমন বিয়ে নয়। দেওয়ান বাজারের শফি দাবী করেছিল— "পাতি গুণ্ডার কাম নয় আমার বোনকে বিয়ে করা।" যদি এক হাজার তলোয়ার নিয়ে আসতে পারে তবে তার সাথে বোনের বিয়ে হতে পারে।

ঘাট ফারহাদ বেগের শফি এক দিন তাই করেছিলেন। এক হাজার এক জনের হাতে নতুন খোলা তলোয়ার তুলে দিয়ে নিজে সাহী তলোয়ার হাতে নিয়ে দুলা সেজে গিয়েছিলেন বিয়ে করতে। ঘাট ফারহাদ বেগের শফি গুণ্ডা সম্পর্কে এ ধরনের অনেক কিংবদন্তি রয়েছে লোকের মুখে মুখে।

আমার সাথে তাঁর প্রথম পরিচয় ঘটে ১৯৫২ সালের জানুয়ারী মাসে রহমতগঞ্জ তালকার এক বাড়ীতে। সেই বাড়ীতে ছিল শফি সাহেবের যাতায়াত। শফি সাহেবের দুই স্ত্রী। তলোয়ার দেখিয়ে যাকে ঘরে এনেছেন তিনি দ্বিতীয় স্ত্রী। দুই স্ত্রীই সুন্দরী।

প্রথম পরিচয়ের দিনেই তিনি তার বাড়ীতে যাওয়ার এবং প্রয়োজনে থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন।

এই সাক্ষাৎ এর পর থেকে আমি মাঝে মধ্যে শফি সাহেবের বাড়ীতে আশ্রয় নিতাম। থাকতাম দুই এক দিন। তার ছোট কাছারী ঘরে মাঝে মধ্যে বৈঠকও করতাম। তার বাড়ীটি ছিল শহরের পূর্ব প্রান্তে গ্রামের মধ্যে। বেশ নিরিবিলি স্থান। একক বাড়ী। কেন জানিনা দুই বেগমই আমাকে সমীহ ও শ্রদ্ধা করত। আমি গেলেই খাওয়ার আয়োজনটা একটু উন্নত হত।

১৯৫২ সালে যখন ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, তখন আমাদের সংগঠন তেমন জোড়ালো ছিলনা। ১৯৪৮ সালের বাম হঠকারী রাজনীতিতে শহরের পার্টি ও শ্রমিক সংগঠন সাংঘাতিক ভাবে ঘায়েল হয়েছিল।

সেই ভাষা আন্দোলনের সময় একদিন ভীষণ অসুবিধায় পড়ে গেলাম। গোপন প্রচার পত্র বিতণের ব্যাপারে। তখন কর্মী সংখ্যা খুবই কম। কর্মী যা ছিল তার এক অংশ রয়েছে জেলে, এক অংশ গিয়েছে ভারতে. এক অংশ গিয়েছে নিস্ক্রিয় হয়ে। বিশেষ করে মুসলিম কর্মী অত্যন্ত নগণ্য।

নিরুপায় হয়ে শফী ভাই এর শরনাপন্ন হলাম। তিনি কাজটি সম্পর্কে জানার পর অতীব সহজে দায়িত্বটি গ্রহণ করলেন এবং কোন কোন রাস্তায় বিলি বন্টন করতে হবে তা জেনে নিলেন। অতপর নিজেই প্রচারপত্র বিলি বন্টনের কলাকৌশল ঠিক করে নিলেন।

তখন দেশে বেবী টেক্সি চালু হয়নি। রিকসা দুই চারটা চালু হলেও রিক্সাতে বিতরণে বিপদ রয়েছে। যেহেতু চট্টগ্রাম পাহাড়িয়া এলাকা। তিনি ঘোড়ার গাড়ীতে চড়ে বিতরনের প্রস্তাব দিলেন। চট্টগ্রামে ঘোড়ার গাড়ী হল দ্রুতগামী। দুই ঘোড়ার চার চাকার পঙ্কিরাজ দ্রুতযান।

রাত সাড়ে আটটার দিকে তিনি দুইটি গাড়ী করে আর তিনজন সাথীকে সাথে করে ইস্তাহার বিতরণে বের হলেন।

প্রথমে দুইটি গাড়ী দুইটি প্রধান সিনেমা হলের সামনে গিয়ে ছবি ভাঙ্গার জন্য অপেক্ষা করে রইলেন। ছবি ভাঙ্গার সাথে সাথে কাজ শুরু হয়ে গেল। মাত্র এক ঘন্টা সোয়া ঘন্টার মধ্যে তারা সারা শহরে প্রচার পত্র বিলি শেষ করে ফিরে এলেন। এই ঘটনা থেকে আমার শিক্ষা হল যে ঠিকমত ব্যবহার করতে পারলে দেশের বহু অসামাজিক মানুষকেও বিপ্লবী কাজে লাগান যায়। কারণ কোন অসামাজিক মানুষই মায়ের গর্ভ থেকে অসামাজিক হয়ে জন্মায় না। জন্মের পরই সামাজিক পরিবেশে পরে মানুষ অসামাজিক হতে বাধ্য হয়।

দ্বিতীয়তঃ প্রতিটি মানুষের মধ্যে সৎ ও বদ গুন দুইটাই বিরাজমান। অসামাজিক মানুষগুলি আরও বেশী করে আগ্রহী থাকে সৎ কাজের সুযোগ পেলে তাতে অংশগ্রহণ করার জন্য।

এই বাহিনীর নায়ক জনাব হাজী শফী ওরফে শফী গুণ্ডা পরবর্তীকালে হয়েছেন বাবুল থিয়েটার কোম্পানীর মালিক। কন্ট্রাক্টর এবং হজ্ব করে হয়েছেন হাজী। এখন তিনি একজন সত্যিকার নিজামুদ্দীন আউলিয়া।

কবিয়াল গানের দোহার

স্থান ঃ শান্তি নিকেতন
থানা ঃ রাঙ্গুনিয়া, জিলা ঃ চট্টগ্রাম
কাল ঃ ১৯৪৯ সাল।

কবিয়াল গানের দোহার কমরেড নীলকমল দে এর সাথে প্রথম পরিচয় ১৯৪৪ সালে, কবিয়াল সমিতির এক সভায়। (প্রসিদ্ধ পল্লী কবি কমরেড রমেশ শীল সভাপতি, কমঃ ফনীন্দ্র বড়ুয়া সম্পাদক।) দীর্ঘ বলিষ্ঠ লম্বা চওড়া গৌরবর্ণ এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক, সুললিত কন্ঠস্বর। পেশায় পান কৃষক। অল্প স্বল্প পান চাষের জমির মালিক। ঐ জমিতে গতরে খেটে (পিতা-পুত্রে) পান উৎপাদন করে, তা হাটে বাজারে বিক্রি করে, ঐ অর্থ দিয়ে কৃষির খরচ ও পরিবার পরিজনের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ হয়।

গানের আসরে কবির দোহারগিরি তাঁর জীবন ও জীবিকার পেশা নয়, সৌখিন নেশা বলা চলে। তাতে করে যা আয় হয়, তা যাতায়াত খরচেই ব্যয় হয়ে যায়।

শান্তি নিকেতনের সমস্ত অধিবাসীই পান কৃষক বা ঐ কাজে ক্ষেত-মজুর। তবে সকলের আর্থিক অবস্থা সমান নয়। ২/১ জন মাত্র ধনী কৃষক, (মহেন্দ্র মহাজন ও রাধা কৃষ্ণ মহাজন) ৮/১০ জন মাঝারী কৃষক। বাদ বাকী ৮০/৯০ গৃহস্থের অর্ধেকের মত ক্ষেত মজুর, অর্ধেক গরীব কৃষক।

সমগ্র গ্রামের মধ্যে একমাত্র শোষক হল মহেন্দ্র মহাজন। তিনি লগ্নি পুঁজির ব্যবসা করেন, করেন সার, খৈল ইত্যাদির ডিলারী। তাঁর রয়েছে পানের আরতদারী। গ্রামের বেশীর ভাগ গরীব কৃষকের পান সে সস্তায় কিনে নেয় অগ্রিম টাকা দাদন দানের বিনিময়ে।

সমগ্র গ্রামটাই কৃষক সমিতির স্বপক্ষে। বাহ্যিক ভাবে মহেন্দ্র মহাজনও কৃষক সমিতির সদস্য। প্রকাশ্যে বিরোধীতা কখনও করেন না। উল্টা সুযোগ পেলেই আমাকে দুই এক বেলা নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতেন। যদিও ভদ্রলোক নিজকে চিকন বুদ্ধির লোক বলে মনে করতেন, বাস্তবে সে ছিল স্থূল বুদ্ধির লোক। আসলে গতরে অধিক মোটা-সোটা লোকগুলি স্থূল বুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে থাকে। কাজেই তিনি যে কৃষক সমিতি ও পার্টির ক্ষতি করতে পারে এ বিষয়ে আমরা সজাগ ছিলাম।

শ্রী যুত মহেন্দ্র মহাজনের ছিল এক বালবিধবা বোন। মুখে বসন্তের দাগ ভরতি, বেটে কালো মোটা সোটা কুলার ন্যায় গতর। নিঃসন্তান অবস্থায় সে বিধবা হওয়ার পর থেকে পিতৃ গৃহে ভাই এর সংসারে অবস্থান করছে। ভদ্র মহিলা নারী প্রকৃতির মধ্যে ছিল হস্তিনী পর্যায়ের। প্রাচীন মুনি ঋষিরা নারীদের মোটামুটিভাবে তিন ভাগে ভাগ করেছেন, হস্তিনী. শঙ্খিণী ও পদ্মিনী, হস্তিনীরা অতিমাত্রায় কামুক হয়ে থাকে। অতৃপ্ত যৌন কামনা নিয়ে তিনি যখন তখন তামাম গ্রামময় ঘুরে বেড়াতেন। আর হাসি ঠাট্টা, ইয়ার্কি ইত্যাদির মাধ্যমে দৈ এর স্বাদ ঘোলে মিটানোর ন্যায় যৌন তৃপ্তির স্বাদ মিটাতেন।

বোনের এসব কাণ্ড কীর্তন মহেন্দ্র মহাজনের যে সামাজিক দুর্ণাম তথা মান মর্যাদার হানি হয়, সেই ক্ষতিপূরণ হয়ে যায় বোনটি যে সারাদিন এ বাড়ী ও বাড়ী ঘুরে পাড়ার যাবতীয় খোঁজ খবর সংগ্রহ করে নিয়ে আসে তা দিয়ে। অপর দিকে কাউকে বুঝিয়ে পক্ষে আনা, কাউকে সামলাতে হবে সেই কর্মটিও বোনকে দিয়ে সম্পন্ন করা হয়।

একবার শীত মৌসুমে আমার সারা দেহে খোস পাঁচরা ভরে যায়। গোপন জীবনে সব বাড়ীতে স্নান করার সুযোগ পাওয়া যায়না।

যেদিন শান্তি নিকেতনে নীল কমল দার বাড়ীতে এলাম, সেদিন নিমপাতা সিদ্ধ করে গরম পানি দিয়ে গোছল করার সুযোগ হল। উপরন্তু সেদিন নীল কমল দা খাসীর মাংস কিনে নিয়ে এসেছেন। উদ্দেশ্য আমার

হাতের রান্না করা মাংস খাওয়ার আবদার করেছেন বাড়ীর সকলে। আমি আবার মাংস রান্নার বিশারদ বলে সর্বত্র পরিচিত ও প্রচারিত। তাই মাঝে মধ্যে কোন কোন আশ্রয় স্থলে এই অতিরিক্ত কাজটুকুর ঝামেলা পোহাতে হ'ত।

বেলা ১২টার দিকে মাংস রান্না শেষ করে ঘেরা দেওয়া আঙ্গিনায় (শীত কালীন রান্নার জায়গায়) পিঁড়িতে বসে গরম পানি দিয়ে ভাল করে স্নান করে নিলাম। মাখলাম কারবোলিক এসিড সাবান। স্নান করে লুঙ্গিখানা শুকাতে দিলেম ঐ স্থানের খেজুর পাতা দিয়ে ঘেরা বেড়ায়। এর পর সকলে স্নান করে আসলে এক সাথে খেতে বসব-তারই আয়োজন ও প্রতীক্ষা। এমন সময় এলেন মহেন্দ্র মহাজনের সেই পাড়া বেড়ানী বোন। এসেই তিনি একটি ব্যতিক্রম রকমের বার্মিজ লুঙ্গি শুকাতে দেখে ও নতুন সাবানের সুগন্ধ পেয়ে আঁচ করতে পারলেন এই বাড়ীতে আজ দেবেন সিকদারের আগমণ হয়েছে। এসেই তিনি চলে গেলেন অনেকটা নির্বিকার ভাবে। তেমন কোন কথা বা প্রশ্ন করলেন না।

মহাজন বাড়ী নীল কমলদার বাড়ী হতে সামান্য দূরে। একটি মাঝারী ধরনের পুকুরের দক্ষিন পাড়ে মহাজন বাড়ী আর ঐ পুকুরের পশ্চিম পাড়ের মাঝ খানে নীল কমলদার বাড়ী। মাটির কোটা ঘর। পশ্চিম মুখি ঘরের মুখ। দূরত্ব ৫০ গজও হবে না।

সেদিন মহাজন বাড়ীতে বসে ছিল একটি বড় রকমের দরবার। পাঁচটি ইউনিয়নের চেয়ারম্যারসহ থানার নাম করা দালাল জনাব আবদুল ওহাব সিকদার। এবং বহু ভাড়াটে দরবারী সালিশকার উপস্থিত।

মহাজনের পাড়া বেড়ানী বোনটি সরাসরি দরবারে গিয়ে দেবেন সিকদারের উপস্থিতি খবরটি প্রকাশ না করে গোপনে ভাইকে বাড়ীর ভিতর ডেকে এনে বললেন। মহাজন ওহাব সিকদারকে ঘরে ডেকে এনে সেই খবর দিলেন ও পরামর্শ নিলেন। আর ওহাব সিকদার কাল-

বিলম্ব না করে চকিদার ডেকে থানায় এক চিঠি লিখে পাঠালেন। চকিদারটি ছিল আমাদের দরদী। কিন্তু নিজে নীল কমলদার বাড়ী এসে খবরটা দিতে পারছেন না বলে চকিদারী পাগড়ী আনার নাম করে নিজ বাড়ীতে গিয়ে নিজের দশ/এগার বছরের ছেলেকে দিয়ে খবরটি আমাদের নিকট পৌঁছাতে পাঠালেন। নিজে গেলেন চিঠি নিয়ে থানায়। থানার ছোট বাবু চিঠি পেয়ে বড় বাবুর সাথে পরামর্শ করে উপস্থিত সর্বশক্তি নিয়ে দৌড় মারলেন। এমন কি বড় দারোগার হুকুমে দাঁড়িয়ে পেন্টের বোতাম লাগাবারও সময় ছিল না।

ঐ দিকে চকিদার নন্দনটি আমাদেরে খবর পৌঁছাতে যথা সময়েই রওনা দিয়েছিলেন। আসার পথে মাঠে অন্যান্য শিশুদের ডাংগুলি খেলতে দেখে নিজেও খেলাতে জড়িত হয়ে পড়ে, ফলে খবরটি পৌঁছানোর দায়িত্বের কথা বেমালুম ভুলে যায়। পুনঃ সেই কথা তার স্মরণে জাগে যখন অন্যান্য খেলার সাথীরা পুলিশের দলকে দৌড়াতে দেখে "পুলিশ পুলিশ" শব্দকরে পালাতে থাকে। এরপর ছেলেটি দৌড় মেরে খবরটি আমার নিকট যখন পৌঁছায় তখন কিন্তু পুলিশের দল মহেন্দ্র মহাজনের বাড়ীতে এসে পৌঁছে গেছে।

খবরটি এমন সময় পাওয়া গেল হাতে দুই তিন মিনিটের বেশী সময় নেই। নেই গভীর ভাবে ভাববার অবকাশ। উপস্থিত বুদ্ধিতে যা কুলায় তাই করলাম। বাইরে পাতলা পাতলা বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে। তারাহুরা করে নিজের কাপড়-চোপড় বই-পত্র একটা ঝুড়িতে ভরে ঘরের পিছনে একটা কচুর জঙ্গলে ফেলে আসতে নির্দেশ দিয়ে নিজের লুঙ্গির উপরে নীল কমলদার ভাই এর স্ত্রীর একটি সবুজ পাড়ের সাদা শাড়ী পড়ে মাথায় ঘোমটা দিয়ে, হাতে একটা ঘাস কাটার টুক্‌রী ও কাস্তে, মাথায় জুমরা দিয়ে ঘর থেকে দ্রুত বের হয়ে পড়লাম। বের হলাম বাড়ীর পেছনের পুকুরের উত্তর পাশ দিয়ে পশ্চিমের পান ক্ষেতের দিকে। উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, আমি যখন বাড়ী থেকে বের হই ঠিক ঐ সময়ে নীল কমলদার বাড়ীতে পূর্ব দিকের ঘাঁটা দিয়ে পুলিশের দল প্রবেশ করছিল। আমার থেকে তাদের দূরত্ব

ছিল মাত্র ৭/৮ গজ। তারা পরিষ্কার দেখতে পেয়েছিল একটি মেয়ে লোক জুমরা মাথায় ঘাস কাটতে যাচ্ছে। এতে তাদের দৃষ্টিতে কোন প্রকার অস্বাভাবিকতা না ঠেকায় বিন্দুমাত্র সন্দেহের সৃষ্টি করেনি। এমনই সহজ সরল ও স্বাভাবিক ছিল আমার ছদ্মবেশ, চলার গতি ও ভঙ্গি।

প্রায় ঘন্টা খানেক ধরে পুলিশের দল তন্ন তন্ন করে খানা তল্লাশী চালালেন। কিন্তু “চিড়ুয়ার” কোন চিহ্ন খুঁজে পেলনা, অতএব সমস্ত শ্রম ব্যর্থ যায়। ওহাব মিয়া সিকদার ও মহেন্দ্র মহাজনের কথার কোন দাম রইল না, তারা মিথ্যাবাদী প্রমানিত হয়, ইত্যাদি কারণে সমস্ত মাতব্বরগণ পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত দিলেন—নীল কমল ও তার বড় ছেলে সুনীলকে (যার বয়স ১৬/১৭) থানায় নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য।

পুলিশের লোকেরা ভেবে দেখল প্রস্তাবটি মন্দ নয়, এতে করে তাদের পকেটে কিছু আসার সম্ভাবনা রয়েছে। শেষ পর্যন্ত তাই করা হল। পাঠক মহলের জানা থাকার কথা—বাংলাদেশের পান ক্ষেত হল বিরাটাকারের একটি সাহী হল ঘরের ন্যায়। চতুর্দিকে শন দিয়ে ঘেরা দেওয়া। উপরের দিকটাও পাতলা শন দিয়ে ঢাকা থাকে, যেন রৌদ্রের তেজ প্রত্যক্ষভাবে পান এর গায়ে না লাগে। প্রায় দশ একর জমির সমান এমন এক পান ক্ষেতে প্রবেশ করে আমি প্রায় অর্ধ মাইল দূরে গিয়ে অপেক্ষা করছি। এক এক করে প্রায় ৩/4 ঘন্টা অতিবাহিত হয়ে গেল। বাইর থেকে কোন প্রকার সংকেত পাচ্ছি না। (আমার প্রতিটি আশ্রয় স্থলে ভিন্ন ভিন্ন সংকেত দানের পূর্ব হতেই ব্যবস্থা করা ছিল।) এখানে সংকেত ছিল নীল কমলদার ৭ বছরের মেয়ে কোকিলার কুহ কুহ ধ্বনীর গান। শেষ পর্যন্ত বেলা ডুবে গেল, তবু কোন সারা শব্দ নেই। নানান ধরণের দুশ্চিন্তা মাথায় এসে ভীড় করছে, তবে ধারণা করতে পারলাম বড় ধরণের কিছু দুর্ঘটনা ঘটেছে। নতুবা বিপদের মেঘ কেটে যেতে এত সময়ের প্রয়োজন হত না। অবশেষে প্রতিক্ষার অবসান হল। নীল কমলদার কনিষ্ঠা কন্যা “কুকিল কন্ঠি” কুহ কুহ ধ্বনি করতে করতে হারিক্যান হাতে পান ক্ষেতের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। অর্ধ মাইল দূর থেকে আমার

আসতে বেশ সময় নিচ্ছে। কয়েক মিনিটের মধ্যে তার কাছে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে কোলে তুলে নিলাম। মুখে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে শুধালাম কি খবর মা কোকিলা? উত্তরে সে শুধু মাথা নেড়ে ইঙ্গিতে জানাল আগে বাড়ী চল, পরে সব জানতে পারবে।

বাড়ীতে আসার পর দেখা গেল বাড়ী ভরতি মানুষ। গ্রামের সব দরদীরা এসে আঙ্গিনায় ভীড় করেছে। তাদের চোখ মুখের ভাব ভঙ্গি দেখে বুঝা গেল এখন আর তেমন কোন বিপদ নেই। দুর্যোগের কাল মেঘ কেটে গেছে।

নীল কমলদার নিকট থেকে জানা গেল পুলিশ এসে প্রথমে সব কয়টা ঘর তল্লাসী করে দেখল। তারা শুধু সিকদারকেই খুঁজতে ছিল। যেহেতু তারা সুনিদিষ্ট ভাবে ঐ খবর পেয়েই থানা থেকে দৌড়তে দৌড়তে এসেছিল। সিকদারকে না পেয়ে ওহাব সিকদারের উপর নাখোস হয়ে শেষ পর্যন্ত নীল কমলদা ও তার ছেলে সুনীলকে থানায় নিয়ে যায়। এবং বেশ কিছুক্ষণ শারীরিক নির্যাতন করে ছেড়ে দেয়। থানায় নিয়ে যাবার সময় পুলিশের একজন তাদেরে কানে কানে শিখিয়ে দেয় যে তারা যেন কিছুতেই কোন কথার স্বীকার উক্তি না দেয়।

উত্তরে নীল কমলদা শুধু বলেছিল তা কি কখনও হয়। যা জানিনা তা কি করে বানিয়ে বল্‌ব।

পাঠক মহলকে বল্‌ছি! কৃষক বিশেষ করে গরীব কৃষক চরিত্র সম্পর্কে যারা জ্ঞাত আছেন, তারা জানেন যে গরীব কৃষকেরা সহজে কোন জিনিসকে গ্রহণ বা বিশ্বাস করে না। আর যদি কিছু শেষ পর্যন্ত গ্রহণ বা বিশ্বাস করে তবে, জীবনের বিনিময়ে হলেও তা তারা রক্ষা করে চলে। আমার গোপন জীবনের বাইশ বছরের অভিজ্ঞতায় এ বিষয়ে বহু প্রমাণ পেয়েছি। এ শুধু পুরুষ চরিত্রের নয়, নারী পুরুষ, আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলের ক্ষেত্রে এ কথা প্রযোজ্য।

থানায় জিজ্ঞাসাবাদ করেছে দেবেন সিকদারের সাথে আনা গোনা আছে কিনা? উত্তরে বলা হয়, অবশ্যই আছে এবং তিনি প্রায়ই আমার বাড়ীতে আসেন। অন্ততঃ মাসে এক বারত আসেই, তবে আজকে আসেনি। আপনারা ভুল ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত খবর পেয়েছেন।

কি করে কোথায় তাঁর সাথে প্রথম পরিচয়? এর উত্তরে বলেছে— দশ বছর পূর্বে কবিয়াল সমিতির এক সভায়।

একজনে পিটায় অপর একজনে কিছু টাকা পয়সা দানের প্রতিশ্রুতির কথা শিখিয়ে দেয়।

নীল কমল এ বিষয়ে হুঁশিয়ার। থানায় যাবার সময় একটি ফুটো পয়সাও সাথে করে নিয়ে যায় নি।

পরিশেষে ধীরে ধীরে জনতার ভীড় কমে এল। একমাত্র যারা ঘনিষ্ঠ কর্মী তারাই কেবল ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত জানার জন্য রয়ে গেল।

সর্বশেষে সকলে একত্রে বসে দুপুরের খাসীর মাংস দিয়ে খানা খেতে খেতে আলাপ হল, শীঘ্রই সমিতির—জরুরী সভা ডাকা হবে এবং শ্রীমান মহেন্দ্র মহাজনকে সামাজিকভাবে বয়কট করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। বন্ধ করা হবে এক দিকে তার নাপিত ধোপা, পুরুহিত, অপর দিকে তার বাড়ীতে কেহ যাবেনা, মৃতদেহ পোড়াবে না, এমনকি তার থেকে কেহ ধার কর্জ্জ গ্রহণ করবে না। পান বিক্রি; সার ও ঔষধ ক্রয় কিছুই করা হবে না। তার জমিতে কেহ হাল চালাবে না, বর্গা নেবে না, ও তার বাড়ীতে মজুরী খাটবে না। প্রত্যেকে বিপদে আপদে পরস্পরের সাহায্যে এগিয়ে আসবে।

তাদের ভাষায়—এই ভাবেই শালাকে জব্দ করতে হবে। এবং রাধা কৃষ্ণ মহাজনকে দিতে হবে ওয়ারনিং, আর ঐ শালী কুত্তিকে পাড়ার কোন ঘরে বৈঠক দেওয়া হবে না। দেখলেই "কুত্তি এসেছে কুত্তি এসেছে" বলে চিৎকার দিয়ে জানান দিতে হবে।"

খয়ের খাঁ

চট্টগ্রাম জিলার রাঙ্গুনিয়া থানার শান্তি নিকেতন গ্রামের পশ্চিম পাড়ায় ইছামতি নদীর ধারে একজন পান কৃষকের বাড়ীতে আমাদের গোপন আস্তানা ছিল। গোপনে থাকা ও লেখাপড়া করে দিন কাটাবার জন্য সর্ব দিক থেকে বাড়ীটি ছিল খুবই উপযোগী। একটি মাত্র প্রতিবন্ধকতা ছিল ঐ বাড়ীর পারিপার্শ্বিকতা। তাহল ঐ বাড়ীতে যাওয়া আসার পথে এমন একজন লোকের বাড়ী ছিল, যিনি ছিলেন স্থানীয় ধনী কৃষক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র মহাজনের খয়ের খাঁ। লোকটি ছিল ক্ষেত মজুর—গরীব। ঐ মহাজনের বাড়ীতে দিন মজুরী করতো। তারই ফাই ফরমাস পালন করতো। এবং প্রয়োজনে তার গোয়েন্দা গিরি করতেও কসুর করত না। নামটি তার কি ছিল এখন ঠিক মনে করতে পারছিনা, আমরা তাকে খয়ের খাঁ নামেই চিহ্নিত করেছিলাম।

এক দিন ভোর রাতে পার্শ্ববর্তী গ্রাম খিল মোগল থেকে রওনা দিয়ে ঐ আস্তানায় প্রবেশ কালে ঐ খয়ের খাঁর সাথে দেখা হয়ে যায়। এ অবস্থায় ঐ আস্তানায় প্রবেশ করে অবস্থান করা মোটেই নিরাপদ নয়। অথচ তখন হাতে এমন কোন সময় নেই যে অন্য গ্রামে গিয়ে অন্য আস্তানায় আশ্রয় নেওয়ার। অগত্যা নিরুপায় হয়ে সাথী কমঃ পুলিন মহাজনের সাথে পরামর্শ করে এক ফন্দি ঠিক করলাম। এ সব কাজে পুলিন ছিল আমার ওস্তাদ।

বুদ্ধি অাঁটবার সময়ও পাওয়া গেল যথেষ্ট। কারণ এত ভোরে ঐ খয়ের খাঁ ঘুম থেকে উঠেছেন প্রকৃতির আহবানে। আমাদেরে দেখে অতি ভক্তি চোরের লক্ষণের ন্যায়-নমস্কার জানিয়ে তিনি গেলেন নদীর ধারে নিত্যকর্ম সারতে। ইত্যবসরে আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফন্দিটি বের করে নিলাম। ফন্দিটি হল : আজকে ঐ খয়ের খাঁকে জোর করে ধরে নিয়ে যাব আমাদের সেল্টারে। এবং সারা দিন তাকে আটক করে রাখব। তারপর সন্ধ্যায় আমরা যখন বের হয়ে যাব,

তখন তাকে ছেড়ে দেব। খয়ের খাঁ কয়েক মিনিট পর নিত্যকর্ম সেরে যখন ফিরলেন, তখন তাকে বিনয় সহকারেই বললাম "আপনার সাথে কিছু কথা আছে। চলুন ঐ বাড়ীতে গিয়ে বসে আলাপ করি। তিনি আমাদের উদ্দেশ্য (তার জন্য মতলব) বুঝতে না পেরে তার নিজের বাড়ীতে বসে আলাপ করার আহবান জানাল। আমরা তার কথা শুনেও না শুনার ভান করে তার হাত ধরে অনেকটা জোর করে টেনে নিয়ে চলে এলাম আমাদের আস্তানায়।

আস্তানার মালিকেরা খয়ের খাঁকে সাথে করে তাদের বাড়ীতে প্রবেশ করাতে আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলেন। কিন্তু মুখে কিছু বললেন না। অতঃপর আমরা তিন জন আমাদের সেই নির্দিষ্ট কামরায় প্রবেশ করলাম। ঘরে ঢুকে প্রথমে ভিতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে তারপর তার সাথে আলাপে বসলাম। বললাম দেখুন আজকে আমরা এই বাড়ীতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত থাকছি। আমাদের সাথে আপনাকে সারা দিন এখানে থাকতে হবে। কারণ আপনাকে ছেড়ে দিলে আপনি খবরটি তখন তখন গিয়ে মহেন্দ্র মহাজনকে দেবেন, আর মহেন্দ্র মহাজন তখন এই শুভ খবরটি থানায় পৌঁছাবেন। অতঃপর থানা ওয়ালারা কি করবেন তা আপনি বিলক্ষণ জানেন। কাজে কাজেই আপনাকে ছেড়ে দেওয়া মোটেই নিরাপদ নয়, নয় বুদ্ধিমানের কাজ। আর এই কাজ টুকু আপনি ও আমরা করছি দেশের-দশের স্বার্থে। দয়া করে আপনি আর দ্বিমত করবেন না, দুপুরের খাবার আমাদের সাথে এখানেই সারবেন। আপনার আজকের দিনের মজুরী আমরাই দেব, রোজ যে ভাবে দিনের শেষে মহেন্দ্র বাবু থেকে মজুরী নিয়ে বাজার করে বাড়ী ফিরেন আজকেও—তাই করবেন। তফাৎ কেবল মহেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে গাধার ন্যায় খাটতে হত, এখানে তা করতে হবে না, খেতে হবে না গালি গালাজ। আজকে আপনার সবেতন ছুটি। যেমন ছুটি ভোগ করে মহাজনের হালের বলদগুলি। যেদিন হাল বাওয়া না হয় সেদিনও তাদের রোজকার মজুরী নিয়মিত খানা তারা পায়। আপনার তো—যে দিন কাজ নাই সেদিন পয়সাও নেই। এই অবস্থা।

খয়ের খাঁ গভীর মনোযোগ দিয়ে কথাগুলি শুনলেন, তারপর বুদ্ধি করে বললেন, আমার পরিবারের লোকেরা যে ভয়ানক চিন্তায় পড়বে, কারণ সেই প্রায় সকালেই ঘরের বের হয়ে—আর যে ঘরে ফিরি নাই। উত্তরে বললাম তার জন্যে আপনাকে চিন্তা করতে হবে না। এই বাড়ীর ছেলেকে দিয়ে আপনার লোটা আপনার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়ে ইতি মধ্যেই খবর দেওয়া হয়েছে, "আপনাকে মহেন্দ্র মহাজন জরুরী ভাবে খবর দিয়ে ডেকেছে। আপনি সেখানে চলে যাচ্ছেন, অতএব, বাড়ীর জন্য কোন চিন্তা করতে হবে না। আর যদি হাড়িতে চাল বাড়ন্ত থাকে বলুন, কিছু চাল না হয় পাঠিয়ে দিব ? এই পরিবেশে পরে সে "লাজবাব" হয়ে গেল। বুঝতে পারছিল আজকে সে দুরন্ত শয়তানের পাল্লায় পড়েছে। যেখান থেকে সন্ধ্যার পূর্বে ছাড়া পাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

অতপর, পাশের চকিতে তাকে শোয়া, বসা, বিশ্রামের জন্য নির্দ্দেশ করে আমরা আমাদের লিখা পড়ায় মনোনিবেশ করলাম, তাই, বলে ফাঁকে ফাঁকে তার সাথে দুই—চারটা যে কথাও হচ্ছে না তা নয়।

এভাবে সারা দিন শত্রুর অনুচরকে সাথে করে কাটিয়ে সন্ধ্যার দিকে বের হওয়ার উদ্যোগ নেওয়ার সময় লোকটিকে বললাম "দেখুন আজকের ঘটনাটি কোথাও প্রকাশ করবেন না। আর যদি ভুল ক্রমেও করে বসেন তবে তার ফল পাবেন চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে। অর্থাৎ আপনাকে পরিবার, পরিজন ও দুনিয়ার মায়া ছেড়ে বিদায় নিতে হবে। অতএব, সব কিছু বুঝে শুনে কাজ করবেন। আচ্ছা! আজকের মত বিদায়। আপনাকে কষ্ট দিলাম বলে আমরা সত্যিই দুঃখিত। আশা করি অপরাধ নেবেন না। এই বলে তার হাতে সেই দিনের মজুরী বাবদ পাঁচটি টাকা দিলাম। কিন্তু শত হলেও সর্বহারা শ্রেণীর মানুষ তিনি। কোন প্রকার শ্রম না করে শ্রমের দাম নিতে তার শ্রেণী মর্যাদায় আঘাত পেল। কিছুতেই তিনি টাকা গ্রহণ করতে রাজী হলেন না।

আমি তখন তাকে বললাম, দেখুন টাকা যদি না নেন, তাহলে বুঝব আপনি আমাদের উপর রাগ করে আছেন, এবং রাগের বশবর্ত্তী হয়ে গোপন কথাটা ফাঁস করে দেবেন।

এর উত্তরে তিনি জানালেন "তার পরিণতিতে আমাকে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হবে।"

অতএব, একবার বিশ্বাস করে দেখুন না, লোকটি মূলতঃ সৎ না অসৎ ?

এই উত্তরের পর আর কোন বিতর্ক চলে না। পরবর্তী কালে প্রমাণিত হয়েছে খয়ের খাঁ সে দিনের ঘটনা থেকে সম্পূর্ণ বদলে গেছে। এখন আর সে খয়ের খাঁ গিরি করে না। করে না সমিতির বিরোধীতা।

বোকা পুলিশ

যতই দিন গড়াচ্ছে কিংবদন্তির নায়ক হিসেবে দেবেন সিকদারের ব্যাপক পরিচিতি ঘটছে। থানার দারোগা-পুলিশ, জোতদার-মহাজন, আনছার ক্যাপ্টেন সকলে ভয়ে সন্ত্রস্ত। কারণ তারা সকলেই কোন না কোন ক্ষেত্রে অপরাধী ; এ কথা অন্যে জানুক আর না জানুক তারা নিজেরা ভাল করেই জানে।

রাঙ্গুনিয়া থানার উত্তরাঞ্চলে এখন আমি চলা ফিরা করি গোপনে ও রাতে। আর ঐ থানার কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণাঞ্চলে এবং পোমরা ইউনিয়নে চলাফিরা করি দিনের আলোতে-প্রকাশ্যে।

একদিন দুপুর বেলা নির্জন পাহাড়ী রাস্তা ধরে একাকী চলেছি শিলক গ্রাম হতে দক্ষিণে পদুয়া গ্রামে। বাম স্কন্ধে ঝুলন্ত একটি কাপড়ের থলে। থলের মধ্যে নিজের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস লুঙ্গি গামছা, দাঁড়ি কাটার যন্ত্রপাতি, প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম, সামান্য ঔষধ, আইওডিন, সিরিঞ্জ ইত্যাদি।

সামনে একটি বড় রকমের প্রশস্ত পাহাড়। পাহাড়ের গা ঘেঁষে পায়ে চলা রাস্তা, উত্তর দিক হতে পাহাড়ের মাঝামাঝি জায়গা থেকে পূর্ব

দিকে অনেক দুর গিয়ে তারপর দক্ষিণে মোড় নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ হাটার পর পুনঃ পশ্চিমে পাহাড়ের অর্দ্ধেক অতিক্রম করে তবে আর এক পাহাড়ের কোল ঘেঁষে দক্ষিণ মুখি যেতে হয়।

আমি যখন পাহাড়ের উত্তরদিক হতে ঘুরে পূর্ব দিকে এসে দক্ষিণে মুখ করে এক কদম এগিয়েছি—ঠিক আমার সামনে প্রায় ২৫/২৬ গজ দূরে অনুরূপ ভাবে ঘুরে উত্তর মুখি হয়ে এগিয়ে আসছে তিনজন পুলিশের লোক। প্রথমে সহকারী দারোগা তার পেছনে দুইজন লাঠিধারী পুলিশ। তারা গিয়েছিল পদুয়া গ্রামে কোন এক বাড়ীতে আমারই খোঁজে। খবর দিয়েছিল ঐ ইউনিয়নের জনৈক জোতদার আসলে খবরটি তারা সঠিকই পেয়েছিল. কিন্তু আমি কোন বিশেষ কারণে গতকাল না গিয়ে আজকে যাচ্ছি সেই বাড়ীতে। সে যাই হোক, আমাকে দেখে ছোট দারোগা বাবু খুশিতে উৎফুল্ল হয়ে জোরে চিৎকার দিয়ে বল্‌ল এই যে সিকদার বাবু আমরাত আপনারই তল্লাশে গিয়ে ছিলাম।

ছোট দারোগার কথা শেষ না হতেই আমি ভাং করে অঙ্গভঙ্গিমায় নিজের থলেতে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে—

(যেন পিস্তল বের করছি) জোর গলায় হাঁক দিলাম "হল্ট"। তারা সামরিক ট্রেনিং প্রাপ্ত বলে "হল্ট" শব্দ শুনে দাঁড়িয়ে গেল। পুনঃ ততোধিক জোরে হাঁক দিলেম এবাউট টার্ন, সাথে সাথে তারা ঘুরে দাড়ালো। পর মুহূর্তে পুনঃ হাঁক দিলাম কুইক মার্চ, তারা হাটতে শুরু করল। কিছুদূর হাঁটার পর পুর্ব দিকে মাঠে যাওরার একটা রাস্তা ধরে চলার জন্য পুনঃরায় কমাণ্ড দেওয়া হল "লেফ্‌ট্‌টার্ন"। এইভাবে তাদেরে নিরাপদ দূরত্বে (পিস্তলের গুলির আওতার বাইরে) নিয়ে গিয়ে আবার হাঁক দিলাম "হল্ট" তারা দাঁড়ালো। এই সময়ে তাদের সাথে দুই চারটে কথা বললাম। ছোট দারোগা সাহেব ইতিমধ্যে কয়েকবার চেষ্টা করেছে আমাকে বুঝাবার জন্যে—কিন্তু তাদেরে চিন্তা-ভাবনা করার কোন সুযোগই দেইনি। ইহা করা হয় সচেতন ভাবে।

ছোট দারোগা সাহেব দীর্ঘ দিনের জানা শুনা লোক। সিপাহীরা ও তাই। তবু আমি তাদেরে বললাম আপনারা পুলিশের জাত আসামী ধরা, উপরের হুকুম পালন করা আপনাদের পেশা। চাকুরী রক্ষার খাতিরে ইহা করণীয় কর্তব্য। কাজেই কিছু মনে করবেন না আমিও আমার কর্তব্যের প্রয়োজনে পিস্তল ব্যবহার না করে আমার চলার পথের বাঁধা দুর করার জন্য বাধ্য হয়ে যা করেছি তার জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আপনারা এখন আপনাদের গন্তব্য পথে রওনা হতে পারেন। ততক্ষণে আমি তাদের থেকে অনেক দুরে এসে গেছি।

পরে জনৈক সিপাহীর নিকট শুনেছি পুলিশের দল থানায় ফিরে গিয়ে পথের এই ঘটনার কথা প্রকাশ করেনি। শুধু গত রাতে যে কয় বাড়ী খানা তল্লাশ করেছে সেইটুকু থানার ডাইরীতে লিপিবদ্ধ করেছে।

পাঠকগণ বুঝতে পারছেন, পুলিশকে, খালি হাতে, বিনা পিস্তলে ভয় দেখিয়ে ফাঁকি দেওয়া হয়েছে, এর জন্য যে দুইটি জিনিসের প্রয়োজন তাহল

(ক) উপস্থিত বুদ্ধি প্রয়োগ ও কলা কৌশল অবলম্বন।

(খ) আর প্রয়োজন দুর্দমনীয় সাহস ও মনোবল এবং ঝটিকা তৎপরতা।

আত্ম গোপন জীবনে সফলতার মূলে থাকে এই দু'টা জিনিষ। যা না হলে গোপনে থাকা সম্ভব হয় না। এছাড়া আরও নানা প্রকার জিনিষের প্রয়োজন, যা বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে বাস্তব ভাবে পরে পরে জানতে পারবেন।

দুই পথ-দুই প্রদর্শক

চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া থানার উত্তরের রাজার হাট হয়ে আরো উত্তর দিকে রাণীর হাটে যাওয়ার পথের মাঝখানে একটি ঘন জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়। পাহাড়টির মাথায় রয়েছে গর্জ্জন কাঠের বাগান। বিশেষ করে ঐ গর্জ্জন বনের চুড়াটা বেশ উচু এবং তার মাথা বেশ প্রশস্ত। সেই পাহাড়ের মাথায় একটি ছোট খাটো আশ্রম। আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ও সেবক কমঃ উপেন দাসের পিতা ও কাকা। তারা দুই ভাই। দুঃখের বিষয় তাদের নাম ভুলে গেছি। দুই জনেই কৃষক,—গরীব কৃষক। রাজার হাটের পূর্ব দিকে পুরাতন বাড়ীতে দুই তিন বিঘা জমি থাকলেও তাতে যা ফসল হয়, সেই ফসল দিয়ে সমগ্র পরিবারের ভরন পোষণ চলে না। আশ্রমের নামে পাহাড়টি আবাদ করে ২০/২৫ বিঘা জমি বের করে নিয়েছে। কঠোর পরিশ্রম করে আট-দশ বছরের শ্রম দিয়ে তিলে তিলে গড়া হয় আশ্রমের কালী মন্দির। তার দুই পাশে সংলগ্ন দুটি কামরা। প্রতিটি কামরায় একটি ছোট চকি পেতে এক জন সেবায়েত ঘুমাতে পারে।

মন্দির থেকে ৫০।৬০ হাত দূরে উত্তর দক্ষিণে লম্বা পূর্ব দুয়ারী একটি মাটির দালান কোঠা। তিন কামরা দালানটি ৩৬ হাত লম্বা। সাথে রয়েছে বারান্দা, সামনে বড় রকমের আঙ্গিনা। সেখানে ধান মাড়াই ঝাড়া ও শুকানো হয়।

মন্দিরের সামনে খড়ের ছানি দিয়ে একটি চৌচালা নাচ ঘর। নাচ ঘরের চারি দিকে সাজানো গুছানো সারিবদ্ধ ফুলের বাগান। নাচ ঘরটি গোলাকৃতির। কাঠের খুঁটির উপর দাঁড়ানো। মন্দিরে স্থাপিত “শ্রী শ্রী কালী মাতার মূর্তি’ যাকে বলা হয় “চামুণ্ডা মাতা” ডান হাতে কৃপাণ, বাম হাতে নরমুণ্ড, পদতলে শিব ঠাকুর, হরষে বিষাদে জিভে কামড় দিয়ে অনুতপ্ত ভঙ্গি। যাদের জীন, দৈত্য ভূত অপদেবতায় অন্ধ বিশ্বাস আছে তারা দিনের আলোতেও এই চামুণ্ডার-ভয়ঙ্কর রূপ দেখে ভয়ে শিউরে উঠবেন।

সমগ্র আশ্রম বাসী নারী পরুষ যুবা শিশু সবাই অত্যন্ত শান্ত শিষ্ট, স্বল্পভাষী অথচ নিরলস কর্মী। এখানে পাখীর ডাক কিচির মিচির শব্দ ছাড়া অন্য কোন শব্দ নেই। শব্দের ঝংকার পাওয়া যায় দুপুর একটায় ও সন্ধ্যা বেলায়। এ সময়ে এখানে আরতি হয়। দুপুর বেলা দেবীকে ভোগ দেওয়া হয়। দুধ দিয়ে চিকন আতপ চালের পায়েশ। রান্না ঘর, গোয়াল ঘর, অতিথি ঘর এমনকি ধান রাখার গোলা ঘর গুলি স্তরে স্তরে সাজানো। পরিস্কার পরিচ্ছন্ন, মানান সই উন্নত রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। অথচ এখানের কোন অধিবাসী উচ্চ শিক্ষিত নহে।

এই আশ্রম নিবাসী সকলের কুল গুরু হল চট্টগ্রাম জেলার বাসখালি থানার — — — অদ্বৈতানন্দ স্বামীজী। তিনি চির কুমার ব্রহ্মচারী, গৌর কান্তি হ্যাংলা স্বাস্থ্যবান, প্রৌঢ় বয়সের একজন সাধক। সব সময় ক্ষীণ কায় মুখে শান্ত মিষ্টি হাসি। নিরহংকার ধীর শান্ত মন মেজাজ, অনুরূপ ভঙ্গিতে দৃঢ়তা দিয়ে গম্ভীর স্বরে কথা বলেন। গুরুজীর সব চেয়ে বড় গুন হল পরমত সহিষ্ণুতা। ঘন্টার পর ঘন্টা তিনি ভিন্ন মত শ্রবনে অভ্যস্ত।

আমিও স্বামীজী উভয়ে এই আশ্রমের অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র। উভয়ের আগমণ হয় মাঝে মধ্যে। সুদীর্ঘ চার পাঁচ বছর অতিবাহিত হয়ে গেল, আমাদের দুই জনার মধ্যে একদিনও দেখা সাক্ষাৎ হলনা। তথা যোগাযোগ সে ভাবে ঘটছে না। তিনিও আসেন মাস-তিন মাসে একবার আমিও তাই। এই এলাকায় স্বামীজীর অনেক ভক্ত আছেন। আমারও রয়েছে অনেক অনুসারী কর্মী ও দরদী। যে বাড়ীতে নিরাপদে থাকা যায় সেখানে আশ্রয় নেওয়া যায় না, আবার যেখানে ঘর নেই, সেখানে থাকা নিরাপদ। এমন সমস্যায় মাঝে মধ্যে পড়তে হয়। অবশ্য আমি কখনও শুধুমাত্র আত্ম রক্ষার জন্য কোন বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করিনা।

আমরা উভয়ে আশ্রমবাসীদের মাধ্যমে পরস্পরের সাথে পরোক্ষ ভাবে পরিচিত। তাই উভয়ের মধ্যে সাক্ষাতের আগ্রহ জাগে সংগোপনে

যেহেতু উপস্থিত কোন জরুরী প্রয়োজন নেই, তাই সাক্ষাৎ এর কর্মসূচীও নেওয়া হয়না। এক পর্যায়ে আমাদের রাজনীতির প্রয়োজনে স্বামীজীকে কাজে লাগাবার জন্য তাঁর সাথে দেখা করার কর্মসূচী গ্রহণের প্রয়োজন বোধ করলাম।

সারা চট্টগ্রামে বহু হিন্দু বাড়ীতে রয়েছে স্বামীজির অনেক অন্ধ অনুগত ভক্ত। স্বামীজির একটু সমর্থন পেলে তারা আমাদের গোপন কর্মীদের আশ্রয় দিয়ে ধন্য হবে। বিশেষ করে এই সময়ে আমাদের গোপন কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় আশ্রয় স্থলের সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করে।

উত্তর রাঙ্গুনিয়ার আমার যত আশ্রয় স্থল ছিল তার মধ্যে এই আস্তানা ছিল সবচেয়ে নিরাপদ। বিশেষ করে ২০/২৫ জনের কোন বড় ও দীর্ঘ সময়ের বৈঠকের জন্য এই আশ্রম বাসীর আস্তানাটি ব্যবহার করা হত।

একদিন উপেন বাবুর বাবা ও কাকাকে এক সাথে পেয়ে সবিনয়ে জিজ্ঞেস করলাম আচ্ছা বাপুজীরা! আমার একটি কৌতুহল নিরসন করলে খুশী হব, প্রশ্নটি হচ্ছে আপনাদের এই আশ্রমে আপনাদের পরিবার বহির্ভূত দু'জন লোক সমভাবে আদৃত। একজন আমি অপরজন স্বামীজি। স্বামীজি আপনাদের কুল গুরু। তা ছাড়া তিনি সন্ন্যাসী। আপনাদের সৎ পথে চলার ও পরকালের মুক্তির পথ দেখাচ্ছেন। সেই তুলনায় আমিও আমাদের পার্টি, কৃষক সমিতি আপনাদের তেমন কোন আশু বা গৌন উপকারে আসি না কিন্তু তবু আপনাদের দরদ ও সেবা যত্নের কোন ত্রুটি দেখি না। উপরন্তু আপনারা ইহাও বিলক্ষন জানেন যে আমি যদিও অন্য কারো ধর্ম মতের বিরোধীতা করিনা, কিন্তু সে সব মতের উপর আমার কোন আস্থা নেই। এতসব সত্বেও আপনারা কি করে নির্লিপ্তভাবে আমাদের আশ্রয় দিতে পারছেন।

এর উত্তরে উপেন বাবুর পিতা যা বললেন তা শুনে আমার বাস্তব জ্ঞান বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেল। তিনি স্মিত হাস্যে বললেন "আমরা মূর্খ অজ্ঞানী মানুষ, ধরতে গেলে কিছুই জানিনা। বুঝি না। তবু আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে হিসেব নিকেশ করে যা বুঝেছি তাহল মানুষের দুইটি

কাল ইহকাল আর পরকাল। ইহকালে বেঁচে থাকার জন্য ঘর সংসার দেন দরবার, এক কথায় এখানে গতরে খাটতে হয়। আছে এখানে অনেক আপদ-বিপদ, শাসক ও শোষক গোষ্ঠির নির্যাতন, সেগুলির মোকাবিলা আমরা এককভাবে করতে পারিনা। প্রয়োজন সমাজ একতা, সমিতি, সংগঠন ও আন্দোলন,. সোজা কথায় ইহকালের আপদ বিপদ থেকে মুক্তির পথ প্রদর্শক আপনি ও আপনাদের সংঘ। আর পরকালের মুক্তির পথ প্রদর্শক স্বামীজি। এ কারণে আপনারা দুজনই আমাদের নিকট সমান শ্রদ্ধার পাত্র।

বাপুজীর সাথে এই আলাপের কয়েক দিন পর এই আশ্রমেই স্বামীজির সাথে আমার সাক্ষাৎ ঘটে গেল। দীর্ঘ সময় ধরে দুই জনের মধ্যে হৃদ্যতাপূর্ণ আলাপ হল। স্বামীজির সাথে আলাপ করেই বুঝতে পারলাম তাঁর ন্যায় জ্ঞান তাপসের শিষ্যত্ব ও শিক্ষা পেয়েই এই অরণ্যচারী নিরক্ষর আশ্রমবাসীরা গভীর জ্ঞানের অধিকারী হতে সক্ষম হয়েছেন। আজকের থেকে আমার শিক্ষা হল সকল মূর্খ লোক অজ্ঞানী নয়, তাদের মধ্যে রয়েছে অনেক মহাজ্ঞানী।

সাথে সাথে স্বামীজিও স্বীকৃতি দিলেন যে আপনাদের সংগ পেয়ে আমার অনেক ভক্ত উন্নত চিন্তা চেতনার অধিকারী হতে পেরেছেন।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে স্বামীজির অভিমত এই যে "মানব ইতিহাসের গতি ধারায় প্রথম ভাগে কোটি কোটি বছর যদি ঈশ্বর বিনা বিশ্বাসে চলতে ও বিকাশ হতে পারে—তবে ঈশ্বর আছে কি নেই এই বিতর্ক নিয়ে চলমান দুনিয়ার গতি স্তব্ধ হবে না, বরঞ্চ জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পাচ্ছে ও পাবে। ব্যক্তির অজ্ঞতা-মূর্খতা-অসহিষ্ণুতা কিংবা অন্ধ বিশ্বাস পরমতকে দমিত রাখতে পারেনা। অতএব, স্বামীজির মতে শত মত ব্যক্ত হউক, শত ফুল ফুটুক, ফুল ও মক্ষিকা বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়ে পরস্পরকে জানুক, বুঝুক ও চিনুক। পরস্পরের গুণ ও দোষ উপলব্ধি করুক।

আমার মতে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে সৎ-ধার্মিক ও সমাজ বিপ্লবীরা একে অন্যের শত্রু শিবিরের লোক নয়। সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে একই ঐক্য শিবি[illegible]সিন্দা।

প্রশ্ন হচ্ছে ধর্ম বিশ্বাসীদের মাঝে স্বামীজীও বাপুজীর ন্যায় কয়জন ধার্মিক আছে? এবং কমিউনিস্ট আদর্শ বিশ্বাসীদের মধ্যেও জ্ঞানী কর্মীর দারুণ অভাব রয়েছে।

চলমান সমাজে প্রতিটি সমাজ কর্মীর মনে রাখা উচিত সমাজ বিপ্লব বা পরিবর্তনের অর্থ প্রচলিত ধর্ম বিশ্বাসী লোকদের মনের উপর জোর করে আঘাত হানা নয়।

উচিৎ সমাজ সংঘাতকে তীব্র করা, এগিয়ে যেতে সাহায্য করা, নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করতে সহযোগিতা করা। তাদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। যেহেতু তারাই আদি গুরু। প্রধান শিক্ষক। উৎপাদন কারী শ্রমিক ও কৃষক।

মহামুনি

চট্টগ্রাম জিলার রাউজান থানার মহামুনি গ্রামটির অন্যান্য গ্রাম থেকে অনেক গুলি পৃথক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যা অন্য কোন গ্রামে খুঁজে পাওয়া যাবে না। প্রথমতঃ সমস্ত গ্রাম খানি অনেকগুলি পাহাড় ও টিলাকে কেন্দ্র করে গঠিত। দ্বিতীয়ত: এই গ্রামে স্থাপিত আছে গৌতম বুদ্ধ দেবের একটি বিরাটাকৃতির প্রস্তর মূর্তি ও মন্দির। তৃতীয়তঃ এই প্রস্তর মূর্তিকে কেন্দ্র করে প্রতি বছর চৈত্রের শেষ দিকে এখানে উদযাপিত হয় পনর দিন ব্যাপি একটি শাহী মেলা। চতুর্থতঃ এই মেলায় যারা প্রধানতঃ-দলে দলে আবাল বৃদ্ধ বনিতা যোগদান করে—তারা হল পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতির বিভিন্ন সম্প্রদায়। পঞ্চমতঃ উপজাতি যুবক যুবতীগণ এখানে এসে মহামুনি মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে পরস্পরে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার শপথ গ্রহন করে। ষষ্ঠতঃ গ্রামটির অধিবাসীরা ৯৮% ভাগ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ভুক্ত। সপ্তমতঃ এখানের অধিকাংশ বাড়ী একক পরিবারভুক্ত। অষ্টমতঃ গ্রাম খানির পূর্ব দিকে কোন জনবসতি নেই; সেখানে রয়েছে ঝাড়-ঝোপ পাহাড় জঙ্গল। নবমতঃ গ্রামটির শতকরা ৯৯টি পরিবারের ছাত্র-ছাত্রীরা ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে আমাদের পার্টির প্রতি শ্রদ্ধাশীল। দশমতঃ গ্রামের বয়স্ক লোকেরা রাজনৈতিকভাবে মোটা মুটি সচেতন। এই সমস্ত বৈশিষ্টের জন্য সমগ্র গ্রামটি আমাদের গোপন পার্টির

গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে তিন থানার (রাউজান, রাঙ্গুনিয়া ও বোয়ালখালি) সীমান্তে অবস্থিত বলে এর গুরুত্ব আরও অধিক ছিল।

যে সব কমরেডদের অবদান ও অগ্রণী ভূমিকা থাকার কারণে মহামুনি গ্রামটি আমাদের অন্যতম প্রধান গোপন ঘাটি হতে পেরেছিল—তারা আজ নানা বাস্তব কারণে বিচ্ছিন্ন—বিক্ষিপ্ত ভাবে জীবন যাপন করছে, অনেকের নাম স্মৃতিতে ধরে রাখা সম্ভব হয়নি, তবু যাদের নাম মনে আছে তারা হলেন ডাক্তার শৈলেন বড়ুয়া, (হোমিও ডাক্তার) পটল বড়ুয়া, দেবপ্রিয় বড়ুয়া, শংঘ মিত্র মুৎসুদ্দী, সুনীল বড়ুয়া বা সুনীল দাদা পার্শ্বর্বর্তীগ্রামের (পোমরা) মিলন বড়ুয়া। মেয়েদের মধ্যে ছিলেন শ্রীমতি প্রতিভা মুৎসুদ্দী; মল্লিকা, বানী ও করুণা বড়ুয়া এবং কমঃ পটলের মা ও কাকী মা।

এত বড় একটা গ্রামকে কেন্দ্র করে প্রায় হাজার দেড় হাজার মানুষের জানা মতে একটি গোপন দলের দুইজন নেতা এখানে থেকে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কাজ করে যাচ্ছে অথচ একবারও খবরটি শত্রুদের নিকট পৌছাল না। এই ঘটনা দিয়েই এই গ্রামের আবাল বৃদ্ধ বনিতার দেশ প্রেমের ও সমাজ পরিবর্তনের প্রতি নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। যদিও শোষক-শাসকদের রচিত ইতিহাসে এরা অখ্যাত-অজ্ঞাত থেকে যাচ্ছে। সত্যিকার ইতিহাস কোন দিন রচিত হওয়ার সুযোগ আসলে এদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে।

প্রধাণতঃ এই গ্রামের ছাত্র-ছাত্রীকে কেন্দ্র করে এখানে একটি হাই স্কুল রয়েছে, এই বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেণী হতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ঐ গ্রামের সকল ছাত্র-ছাত্রী আমাদের গোপন সংগঠনের সাথে জড়িত ছিল।

এদের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধির জন্য প্রতি মাসে একবার তাদের নিয়ে গোপনে সভা করতাম, এই সাধারণ সভাটি অনুষ্ঠিত হত একটি ঝোপ-জঙ্গল বিশিষ্ট পাহাড়ের চুড়ায়। সেখানে একশ সোয়াশ ছাত্র-ছাত্রী এক সাথে বসে সভা করা যেত। বাইর থেকে দেখার সম্ভাবনা ছিল না।

যে দিন এই সভা অনুষ্ঠিত হত বা কোন জরুরী প্রয়োজনে সভা ডাকা হত, সেদিন স্কুলে একজনের মাধ্যমে খবর পেঁছালেই—সকলে খবর পেয়ে যেত। তারপর তারা যথা সময়ে পৃথক পৃথক ভাবে বিভিন্ন পথে

সভা স্থলে হাজির হত। কোন কোন সময়ে মিটিং হত বন্ধের দিনে দীর্ঘ সময় ধরে।

এছাড়া প্রতিটি ক্লাশের উন্নত মানের (রাজনৈতিক চেতনার বিবেচনায়) ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে ছিল পৃথক পৃথক গ্রুপ। তাদের নিয়ে করা হত নিয়মিত রাজনৈতিক ক্লাশ। বাছাই করা ১০/১২ জনকে দেওয়া হত- শরীর চর্চ্চা ট্রেনিং অর্থাৎ জুজুৎসু শিক্ষা। কি ভাবে শত্রুর সাথে মোকাবিলা করা যায়। (আক্রমণ, ঘায়েল ও আত্মরক্ষা এবং পলায়ন) এই কাজটি করতেন পুলিন মহাজন।

পরবর্তী কালে এখান থেকে অনেক ভাল কর্মী বের হয়ে আসে। এদেরই সহায়তায় এই স্কুলে একবার রাজবন্দীর মুক্তির দাবীতে ধর্মঘট ও মিছিল হয়। কুমারী শ্রীযুক্তা প্রতিভা মুৎসুদ্দী (তখন দশম শ্রেণীর ছাত্রী) র নেতৃত্বে। এই কারণে সে গ্রেপ্তার হয়ে কিছুদিন হাজত বাস করতে বাধ্য হয়।

এই গ্রামের সর্ব শ্রেণীর জনতার সমর্থনে ১৯৫৪ সালে শংখ মিত্র মুৎসুদ্দী সাধারণ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন।

এই সময়ের ভাল ভাল কর্মীরা ও সকল ছাত্র-ছাত্রীরা আজ সারা দেশের সর্বত্র কর্মময় জীবনে ছড়িয়ে পড়েছে। সাংবাদিক, ডাক্তার, নার্স ইঞ্জিনিয়ার, উকিল-মোক্তার, কেরাণী-মাষ্টার আমলা-অফিসার, শ্রমিক ব্যবসায়ী সব পেশাতে তারা অবস্থান করছে। নানা কারণে এদের সকলের নাম ও পদবী উল্লেখ করতে পারছিনা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তারা কেহই তাদের সেই গৌরবময় অতীতকে ভুলে যায় নি। যেতে পারে না ভুলতে পারে না সমাজ পরিবর্তনের আদর্শকে। আগামীতে সময় ও সুযোগ পেলে তারা সেই কাজে ঝাপিয়ে পড়তে দ্বিধা করবে না ; কিংবা তাদের উত্তরসুরীদের সেই শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করবে না। প্রত্যেকে নিজদের উত্তর সুরীদের নিকট নিশ্চয়ই সেই সব অতীত গৌরবময় স্মৃতি তর্পন করছেন। যার যার পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে অবসর বিনোদনের সময়ে স্মৃতির জাবর কাটা মানুষের আদিম প্রকৃতিগত অভ্যাস যখন রয়েছে এ কাজ তারা করবেই।

শিক্ষনীয় ঃ এতবড় সম্ভাবনাময় একটি বিপ্লবী ঘাঁটি আজ যে একেবারে নিশ্চুপ হয়ে পড়ে আছে ; কোন কাজে লাগছে না, (আশু) তার জন্য এঁরা দায়ী নয়, দায়ী হল বিপ্লবী নামধারী পার্টি গুলোর নাম স্বর্বস্ব নেতাদের ভ্রান্ত নীতি ও অকমিউনিস্ট সুলভ স্বভাব চরিত্র ও কার্যকলাপ। যার পরিণতিতে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতা থাকে নাই। ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে না পারলে বিপ্লবের বহু মূল্যবান সম্পদ ঝড়ের তোরে ফুলের কুড়ির ন্যায় অকালে ঝরে যায়। ফুল ও ফলে রূপায়িত হওয়ার সুযোগ পায় না। অতৃপ্ত কামনা বাসনা নিয়ে তারা জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে হণ্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতে বাধ্য হয়। টানতে হয় কুলুর বলদের ন্যায় বাধ্যতামূলক জীবন যুদ্ধের ঘানি।

পুলিশী ভূত

চট্টগ্রাম জিলার রাউজান থানার ডাবুয়া গ্রামে পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে, জনসভা হতে সরে পড়ার পর থেকে কমঃ ছাত্তার প্রায় রাতে ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখতেন তিনি পুলিশ দ্বারা আক্রান্ত। পুলিশ তাকে ধরার জন্য পেছন থেকে ধাওয়া করছে। স্বপ্ন ভঙ্গের পর তিনি বেশ কিছুক্ষণ নার্ভাস হয়ে পড়তেন। যাকে বলে হৃদকম্প রোগে আক্রান্ত হতেন।

একদিন নয়া পাড়া গ্রামের পশ্চিম পাড়ায় ঘোষদের বাড়ীতে পার্টির জেলা কমিটির গোপন সভার আয়োজন হয়েছে। বাড়ীর মালিক অরুন কান্তি ঘোষ ও তার বৃদ্ধ পিতা এবং দুই জ্যেষ্ঠ বোন। (জ্যোতি দিদি ও কুমারী জ্যোৎস্না) আসলে অরুনের তিন বোন। মেজো বোন শ্রীযুক্তা অমিয়া সেন, আমাদের প্রাক্তন জেলা নেতা কমঃ বঙ্কিম সেনের সুযোগ্যা সহধর্মীনী। জ্যোতি দিদি সকলের বড়। তিনি না কুমারী, না সধবা, না বিধবা। তাঁকে সামাজিক সম্পর্কিত মতে বড় জোর অধবা বলা চলে। সে এক রোমাঞ্চকর কাহিনী, সংক্ষেপে বলছি-সকলে মনযোগ দিয়ে পড়ুন ও শুনুন। জ্যোতিঃ দিদির বয়স যখন বার/তের বছর তখন তিনি মাষ্টারদা সূর্য্য সেনের নেতৃত্বে গঠিত যুগান্তর নামে সন্ত্রাসবাদী দলে ভর্তি হন। এমন সময় তাঁর বিয়ের প্রস্তাব আসে। ঐ কুমারী বয়সের লাজলজ্জায় তিনি মুখ ফুটে স্পষ্টভাবে নিষেধ করতে পারলেন না যে তিনি

জীবনে বিয়ে করবেন না বা সংসার পাতবেন না, বললেও ঐ বয়সের মেয়েদের কথায় কেহই পাত্তা দেয় না। এমতাবস্থায় বিয়ে হয়ে গেল। জ্যোতি দিদি দেখতে খুবই সুন্দরী মহিলা। ছোট্ট দুর্গা প্রতিমার ন্যায় গড়ন ও গায়ের রং। অনেকটা দুধ-আলতা মেশানো। চোখা নাক। পটল চেরা আঁখি, বাকা ভ্রু, কোক্ড়ানো অজানুলুন্ঠিত কেশধাম। কন্ঠস্বরে রয়েছে মিষ্টতা ও স্নিগ্ধতা, চলার গতি তার খঞ্জন পক্ষিসম শব্দহীন। বুদ্ধিদীপ্ত চেখের মনিদ্বয়। এমন সুন্দরী বধু পেয়ে পাত্র নিজকে ধন্য মনে করলেন।

শ্বশুর বাড়ীতে গিয়ে তিনি বুদ্ধি খাটিয়ে বললেন তার এখন "মাসিক" সময় কাল চলছে। এই বলে দুই তিন দিন সময় হাতে নিলেন।

অতপর, একদিন সময় সুযোগ বুঝে স্বামীকে মনের কথা খুলে বললেন। স্বামীটিও ছিল বিপ্লবী দলের সমর্থক। তিনি সদ্য বিবাহ করা সুন্দরী দেশ প্রেমিক স্ত্রীকে সংসার বন্ধন থেকে মুক্তিদানে দ্বিমত পোষণ করলেন না। প্রতিশ্রুতি দিলেন—শুধু মুক্তি নয়, ঐ বিষয়ে সহায়তা করতে পর্যন্ত প্রস্তুত। জ্যোতি দিদি নিজে দেখে শুনে পছন্দ করে নিজের একজন পরিচিতা মেয়েকে ঠিক করে, এবং নিজের সমস্ত গয়না পাতি দিয়ে সাজিয়ে ঘরে এনে স্বামীর সাথে বিয়ে দিয়ে সংসার বন্ধন থেকে মুক্তি অর্জন করলেন। সেই হতে তিনি পিতৃ গৃহে আছেন এবং সকলের সাথে সন্ত্রাসবাদী দল ত্যাগ করে সাম্যবাদী দলে যোগদান করলেন। জ্যোতিঃ দিদি ছিলেন চট্রগ্রাম জেলার (অবিভক্ত বাংলার) প্রথম সর্বক্ষণের মহিলা কর্মী। স্বভাব চরিত্রে তিনি ছিলেন শান্ত ভদ্র ও বিনয়ী। চিন্তা চেতনায় ছিলেন—অসামান্য দৃঢ় চেতা, ভাল বক্তা, ততোধিক ভাল সংগঠক। কঠোর পরিশ্রমী; তিনি ছিলেন সর্বগুণে গুণান্বিতা আদর্শস্থানীয়া।

এ বাড়ীতে আমাদের জেলা কমিটির সভা বা বড় রকমের কর্মীসভা হতো প্রায় সময়ে। বাড়ীটি বার্মিজ স্থপতি ঢং এ গড়া। কাঠের দোতালা ঘর। পূর্বে ও পশ্চিমে টপ বারান্দা। দক্ষিণে সুপারী বাগান। ঘরের ভিতর দিয়ে দোতালায় উঠার কাঠের সিড়ি। বাড়ীর কর্তা সরকারী পেনশান প্রাপ্ত চাকুরে। প্রথম জীবনে বার্মায় পোষ্ট মাষ্টার ছিলেন। অরুন সকলের ছোট ভাই, ৪৭ সালের দিকে ম্যাট্রিক পাশ করে সাইন্স এ ভর্তি হয়েছে। লক্ষ্য ইঞ্জিনিয়ারিং লাইনে যাওয়া।

সুপারী বাগান প্রধান এই গ্রামে মশার উৎপাত বৃটিশ আমল থেকে। প্রতি বাড়ীতে ভিজা সুপারীর বড় বড় মট্‌কা, যেখানে মশা উৎপত্তির উর্ব্বরা স্থান। তাই জ্যোতিঃ দিদি দোতালার কামরার সমান একটি বিরাটাকৃতির মশারী তৈয়ার করে রেখেছেন। যার মধ্যে ২০/২৫ জন এক সাথে ঘুমান যায়।

এমন শাহী মশারী খাটিয়ে আমরা মিটিং ও খাওয়ার পর্ব সেরে রাত ১১/১২ টার দিকে ঘুমিয়ে পড়েছি। জ্যোতিঃ দির নেতৃত্বে তার ছোট ভাই বোন ও পাড়ার স্বেচ্ছা সেবক দল রাত জেগে পাহাড়া দিচ্ছে। এই ব্যবস্থা গোপন যুগের সব সভা স্থলে করা হয়। যার জন্যে আমরা সকলে দুঃশ্চিন্তা মুক্ত হয়ে ঘুমাতে পারি।

রাত প্রায় দুই/তিনটার দিকে হঠাৎ "পুলিশ" "পুলিশ" বলে এক বিকট শব্দে সকলের ঘুম ভেঙ্গে গেল। কে বা কারা মশারীর রশি ছিঁড়ে দিয়েছে। অন্ধকার ঘর। সকলের গায়ে মশারী জড়িয়ে অনেকটা বোরকায় আবৃত অবস্থা। ভাবছি কি হল? কই পুলিশেরতো কোন সাড়া শব্দ নেই। তাছাড়া বাইরেতো সচেতন স্বেচ্ছা সেবকরা রয়েছে। তারাতো জান থাকতে পুলিশকে ঘরে ঢুকতে দেবেনা? তাদেরওতো কোন সাড়া শব্দ নেই।

আমাদের মধ্যে থেকে পুলিশ পুলিশ শব্দ শুনে বাইরে পাহাড়ারত স্বেচ্ছা সেবক সেবিকারা প্রথমে হত চকিত হয়ে চারিদিকে দৌড়া দৌড়ি করে। খোঁজ-খবর নেয়। অতঃপর জ্যোতিঃ দি হ্যারিক্যান বাতি হাতে করে দোতালায় এসে জানতে চাইল কোথায়ও কোন পুলিশের নাম গন্ধ নেই অথচ আপনাদের মধ্যে থেকে কে হাঁক পাড়লেন "পুলিশ পুলিশ" বলে? উত্তর না দিয়ে আমরা সকলে নিশ্চুপ হয়ে এ ওর দিকে তাকাচ্ছি মাত্র। অনেকটা হতভম্বের ন্যায়।

অবশেষে কমঃ ছাত্তারের সম্বিত ফিরে আসার পর তিনি সকলকে আশ্বস্ত করে জানালেন—"দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই, আসলে ঘটনাটা ঘটছে—বাস্তবে নয়—স্বপ্নে।

পদলোভ

১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের ঐতিহাসিক সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে চট্টগ্রাম জেলা থেকে তিনজন প্রার্থীকে দাঁড় করানো হয়। পার্টির সিদ্ধান্ত মোতাবেক মূলতঃ একজনই শেষ পর্যন্ত প্রার্থী হিসেবে থাকবেন; বাকী দুই জন নিজদের নাম প্রত্যাহার করে নেবেন। যিনি প্রত্যাহার করবেন না তাঁর নাম হল কমঃ পূর্ণেন্দু দস্তিদার। যারা প্রত্যাহার করবেন তারা হল কমঃ আবদুস ছত্তার ও কমঃ শুধাংশু বিমল দত্ত। কমঃ দস্তিদার ও দত্ত দাঁড়িয়ে ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ের আসনে। কমঃ আবদুস ছত্তার রাউজান থানার মুসলীম আসনে।

কমঃ দস্তিদার তখন জেলে। বাকী দুই জন বাইরে আছেন। দুইজনেই পার্টির জেলা কমিটির সদস্য। আমি তখন জেলা সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য। কমঃ অমর সেন সম্পাদক। কমঃ দত্তকে দাঁড়া করানো হয়—কংগ্রেসের সাথে দর কষাকষি করার জন্য। কারণ কংগ্রেস দুইটি হিন্দু আসনে পার্থী দিয়ে ছিল। ঐ একই কারণে—মুসলীম আসনে কমঃ ছত্তারকে দাঁড়া করানো হয় প্রদেশের অন্যান্য মুসলীম আসনে যুক্তফ্রন্টের সাথে দর কষাকষির জন্য।

জেলা কংগ্রেস শেষ পর্যন্ত রাজী হন, চট্টগ্রাম দক্ষিণ আসন থেকে শ্রীযুক্ত যতীন রক্ষিতকে প্রত্যাহার করে নেবেন। উত্তর আসনে থাকবেন শ্রীযুক্তা নেলী সেন গুপ্তা (ব্যারিষ্টার দেশ প্রিয় যতীন্দ্র মোহন সেন গুপ্তের ইংরেজ স্ত্রী) যুক্তফ্রন্ট নেতৃত্ব ও মেনে নিলেন প্রদেশের অন্যান্য আসনে কমিউনিষ্টদের দাবী। ফলে কমঃ ছত্তার ও শুধাংশু দত্তের নির্বাচনে প্রার্থী থাকার আর প্রয়োজন রইল না। এই প্রত্যাহার করে নেওয়ার পেছনে আরও একটি কারণ ছিল। চট্টগ্রামে, আমাদের যদি এক জন প্রার্থী থাকে তাহলে আমাদের সমস্ত শক্তি ও কর্মী বাহিনী যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীর সমর্থনে মুসলীম আসনে কাজ করতে পারবে। তাতে করে মুসলীম জনগণের সাথে পার্টির কর্মীদের মাধ্যমে গণ সংযোগ বৃদ্ধি পাবে। মুসলীম সম্প্রদায় হতে নতুন নতুন কর্মী পাওয়া যাবে। এবং এতে করে পূর্ব পাকিস্তানে সমাজ বিপ্লবের কাজ ত্বরান্বিত হবে।

কিন্তু আমাদের কৌশলগত কারণে দাঁড় করানো প্রার্থী দুইজন নিজদের ব্যক্তিগত পদ মর্য্যাদা বৃদ্ধির জন্য—নীচের দিকের সরলমনা কর্মীদের মাধ্যমে উপরের দিকের জেলা ও কেন্দ্রীয় কমিটির উপর চাপ সৃষ্টির কাজে লেগে গেলেন।

এই অবস্থায় ব্যাপক কর্মীদের সাথে আলাপ করে তাদেরে বুঝিয়ে সুজিয়ে বিরত রাখার জন্য আমরা জেলা নেতৃবৃন্দ বেশ কয়েকটি বড় বড় কর্মী সভার আয়োজন করলাম। রাউজান থানায় উত্তরে-দক্ষিণে দুইটি এই ধরণের কর্মী সভা। উত্তরের সভার উদ্যোক্তা চিকদাইর গ্রামের ডাক্তার কমঃ দেবেন মজুমদার, দক্ষিণের সভার স্থল ছিল আঁধার মানিক গ্রামে কমঃ প্রিয় দর্শী বড়ুয়ার বাড়ীতে।

এই উপলক্ষে আমাকে অনেকটা খোলা খুলি ভাবে কাজ করতে হয়। সুবিধা হল আমার চেহারা ছিল পুলিশের নিকট অপরিচিত। প্রকাশ্য কর্মীরা যে ভাবে কাজ করতেন আমিও ঠিক সেই ভাবে ছদ্ম নামে চলা-ফিরা করতাম। তবে শত্রুদের গতিবিধি সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি রেখে চলতাম।

এই ভাবে বেশ কয়েকটি কর্মী সভা করে বুঝিয়ে দেওয়া হল কেন কমঃ ছত্তার ও দত্তের নাম প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তখন কর্মীরা মত প্রকাশ করলেন পার্টি সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে। ফলে কমঃ ছত্তার পার্টি ও কর্মীদের রায় মেনে নিতে বাধ্য হয়। যদিও তিনি মনে করেন তার ব্যক্তিগত মান মর্য্যাদা ক্ষুন্ন হচ্ছে।

অপর দিকে চট্টগ্রাম দক্ষিণ আসনে কমঃ দত্তের বিষয়ে কর্মীদের রাজী করানো গেল না। কমঃ দত্ত নিজেও পার্টি সিদ্ধান্ত মেনে নিতে রাজী নহেন। তাঁর যুক্তি আমরা দুই আসনেই জিতব, আমার তুলনায় কংগ্রেস প্রার্থী যতীন রক্ষিত দুর্বল। জেলা ও কেন্দ্রীয় নেতারা ও জানতেন যে, চট্টগ্রামের দুটি হিন্দু আসনেই কংগ্রেস হারবে, আমরা জিতব। কিন্তু তা হবে আশু লাভ। পরিণামে পার্টি ও বিপ্লবের স্বার্থে ক্ষতিকারক।

কম: দস্তিদারকে অবশ্য জেলে থাকা অবস্থাতেই দাঁড়া করানো হয়। পরিশেষে কমঃ দত্ত ও কর্মীদের চাপে পড়ে দুইটি হিন্দু আসনেই পার্টিকে সর্ব শক্তি নিয়োগ করতে হয়। ফলে মুসলিম আসনে বাস্তবে

তেমন কোন কর্মী নিয়োগ করা সম্ভব হল না। বিনিময়ে কোন ফায়দাও অর্জ্জন করা গেল না।

পরবর্তী কালে পাকিস্তানের রাজনীতি ও পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলী প্রমাণ করে যে কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে স্বাধীন পূর্ব বাংলা রাষ্ট্র গঠন এবং তার জন্য সংগ্রাম করতে হবে।

এ বিষয়ে যদি পার্টি সচেতন থাকত, তাহলে যে ঘটনা ঘটেছে ১৯৭১ সালে সেই ঘটনা ঘঠত ১৯৫৭/৫৮ সালে; যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রি সভা ভেঙ্গে দেওয়ার প্রাক্কালে।

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান আইন সভায় ৩০৯টি আসনের মধ্যে যুক্ত-ফ্রন্ট জয়লাভ করেছিল তিন শত আসনে। তার মধ্যে কমিউনিষ্ট ও ভাসানী পন্থীরা ছিল এক তৃতীয়াংশ। সারা পূর্ব পাকিস্তানে হাজার হাজার কর্মী বাহিনী ও সেচ্ছা সেবকদের শতকরা ৯৮ জন ছিল বামপন্থী।

মোদ্দা কথা হল তখন পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের বুর্জোয়া ও কমিউনিষ্ট নেতাদের মধ্যে পাকিস্তানের প্রতি মোহ পরিপূর্ণ ছিল। একমাত্র মওলানা ভাসানী মাঝে মধ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করতেন। '৫৪ সালের নির্বাচনী ফলাফল দিয়ে প্রমাণিত হয়—পাকিস্তানের প্রতি মোহ ছিলনা জনতার।

জনতার মধ্যে যেমন দ্রুত পাকিস্তানের প্রতি মোহ সৃষ্টি হয়েছিল অনুরূপ দ্রুততার সহিত সেই মোহ কেটে যায়।

যে মুসলিম লীগের আহবানে হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা করে পাকিস্তান কায়েম করেছিল, সেই মুসলিম লীগকে তারাই ভোটের বাক্সে কবর দিয়ে জানাজা পড়ে শেষ করে দিল।

কিন্তু শোষিত নির্য্যাতিত জনতার এই মন ও মেজাজ ধরতে পারল না এই দেশের কমিউনিষ্ট ও বুর্জোয়া নেতারা। কারণ খুবই সুস্পষ্ট বাংলাদেশের বুর্জোয়ারাও দেশ প্রেমিক বুর্জোয়া নয়, তারা ছিল ভিতরে বাইরে দালাল বুর্জোয়া, তেমনি কমিউনিষ্ট নেতারাও সৎ ও সাচ্চা কমিউনিষ্ট ছিল না। তারা ছিল ঐ দালাল বুর্জোয়াদের লেজুড়ে। যার জের বাংলাদেশের জনতাকে আজও বহন করতে হচ্ছে।

অদম্য

চট্টগ্রাম শহরের অদূরে জঙ্গলাকীর্ণ অরণ্য বেষ্টিত ছোট একটি পাহাড়ী মালভূমি। চারিদিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হরিতকি, আমলকী, বয়রা ইত্যাদি নানা জাতের বৃক্ষ। স্থানে স্থানে শন-উলু, নল খাগড়া আচ্ছাদিত গুল্ম-লতা। এরই ফাঁকে ফাঁকে গবাদি পশু ও কাঠুরিয়াদের চলাচলের সরু-চিক্কন আঁকা বাঁকা পায়ে চলার পথ। সব চেয়ে বড় আমলকী হরতকী গাছের পাদমূলে ফলাহারি জন্তু জানোয়ার আর রাখাল বালকের বিচরণের পদচিহ্ন বিরাজমান। মানুষ ও পশুর পদদলনে ঝরা আমলকী পাতার একটি মসৃন আস্তরণ পড়েছে স্থানটিতে। জঙ্গলের অন্যান্য স্থানের ন্যায় এখানে নেই কেঁচো উত্খোলিত মাটির ঢিলা। সব মিলে স্থানটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মনোরম।

অদূরে পাহাড়ী ঝরণায় প্রবাহিত অবিরাম জলস্রোতের কল কল আওয়াজ। জাপানী সর্প নৃত্যের ভঙ্গিমায় ঝরণাটি এঁকে বেঁকে নিম্ন মুখি প্রবাহিত। আস্তানা মুখি দলবদ্ধ কাকের দলের কাফেলা, বেলা অবসানের ইঙ্গিত দিচ্ছে। ঘরমুখি পাখির দলের চেচামেচি ও কিচির মিচির সঙ্গি সাথীদের আহবান জানাচ্ছে—বেলা গেল সন্ধ্যা হল ঘরে চল্‌রে সাথীরা। সূর্য পশ্চিমাকাশে এত নিচুতে নেমে গেছে যে মালভূমির থেকে তাকে আর দেখা যায় না। কেবল পূর্বদিকের পাহাড়ের মাথায় বৃক্ষ রাজীর শীর্ষদেশে মিষ্টি রোদের উজ্জ্বলতা দৃষ্টি গোচর হচ্ছে। রাখাল বালকেরা পশুর পাল নিয়ে অনেক আগেই সমতল ভূমিতে নেমে গেছে; কাঠুরিয়ার দল নেমে গেছে তারও আগে।

কেবল আমলকী বনের রাতে বাসিন্দা নানান জাতের ছোট ছোট পাখীদের কল গুঞ্জরণে আমার তন্দ্রা গেল ছুটে। যদিও জ্ঞান ফিরে এসেছে বহুক্ষণ আগে। কিন্তু শরীর অত্যন্ত কাহিল থাকায় তন্দ্রাচ্ছন্নের ন্যায় চুপ করে ভাবছিলাম আর স্মৃতিকে যথা স্থানে পুনঃ বহাল করার কসরৎ করছিলাম। চিন্তার যোগসূত্র সৃষ্টি করার। ধীরে অতি ধীরে জাগ্রত হয়ে উঠতে থাকে সারাদিনের দ্রুত ঘটে যাওয়া ঘটনাবলী। এ যেন বার ঘন্টার একটি একাংকিকা নাটক; তাতে ছিল অল্প কয়টি দৃশ্য। ভোর রাতে পথ চলতে গ্রেপ্তার? পলায়নের প্রচেষ্টা, সংঘাত-আহত হওয়া,

থানাতে গমন ও হাজত বাস, হাসপাতালে প্রেরণ, পুনঃ পলায়ন, দ্রুত গতিতে শহর অতিক্রম, পাহাড়ে প্রবেশ এবং সব শেষে অজ্ঞান হয়ে এই বৃক্ষতলে পড়ে থাকা। এখন মনে হচ্ছে এসবই যেন পূর্ব পরিকল্পিত। পর পর যথা নিয়মে ঘটে চলেছে। বহু দিনের মহড়া দেওয়া বার ঘন্টার একটি রোমাঞ্চকর একাংকিকা নাটক, যা পঞ্চম দৃশ্য পটের মধ্যেই সূচনা ও যবনিকা পাত।

সময়টি ছিল ১৯৫১ সাল। ক্ষমতাসীন রয়েছে জনাব নূরুল আমীন সরকার। আমার বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি করেছে বেশ কয়েক বছর আগে। এখন খোঁজ খবর তত্ত্ব তল্লাস নিচ্ছে আরও জোরে সোরে। কোথাও সুবিধা করতে পারছে না।

কার্ত্তিক মাসের শেষ ভাগে ভোরের কুয়াশা ঘেরা অস্পষ্ট আলো মোরগের প্রথম ধ্বনির সময় ঘুম ভেঙ্গে যায়। তারা হুড়া করে প্রাতঃকৃত্য শেষ করে তৈয়ার হয়ে নেই, লোকজন জেগে উঠার আগেই পৌঁছতে হবে নদীর ঘাটে। যাব সাম্পানে করে গ্রামে। হিসেব করে দেখা আছে—সূর্য উদয়ের দুই ঘন্টা পূর্বে সমুদ্রে জোয়ার হবে। কর্ণফুলী নদীতে জোয়ার আসতে দুই ঘন্টা সময় নেবে। নয়া পাড়া গ্রামে এই পথে যেতে হয়। বাস রুট বা অন্য যে পথ রয়েছে তা রাজনৈতিক পলাতকদের জন্য মোটেই নিরাপদ নয়। গোছ গাছ করে রওয়ানা দিতে যাব এমন সময় ফজরের নামাজের জন্য মোয়াজ্জিনের আজানের ধ্বনি কানে এল, পরনে একটি বার্মিজ লুঙ্গি খালি পা, খাকী রং এর একটা হাফ সার্ট গায়ে, বগলে গামছা দিয়ে মোড়া প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, সেণ্ডেল, লুঙ্গি পাজামা-পাঞ্জাবী, ঘড়ি ইত্যাদি। মুখে দুই তিন দিনের গজানো দাঁড়ি। দেখলে মনে হয়, প্রবাস মুখী কামলা মজুর। যদিও আমার চেহারায় রয়েছে অনেকটা বিহারী আদল। যার জন্য সাধারণতঃ রাস্তা ঘাটে কোন অপরিচিত বাঙ্গালী আমার সাথে শুরুতে বাংলায় কথা বলে না। চায়ের দোকানের বয়রা ডবল চিনি দিয়ে চা পরিবেশন করে।

আত্ম গোপন সম্পর্কে আমার পূর্বে ধারণা ছিল গোপন জীবন বুঝি তেমন কিছু কঠিন নয়; কিন্তু ধারণা আর বাস্তবতা আকাশ পাতাল তফাৎ। এখনও চলনে বলনে স্বাভাবিকতা আসেনি। দূর হতে লোকজনের আভাস ও আলো দেখতে পেলে, কোন কিছুর শব্দ শুনলে শশকের

ন্যায় ভীরুতায় তামাম শরীর শিউরে উঠে, লোমকুপগুলি—জাপানী বিতাড়িত বৃটিশ সৈনিকদের ন্যায়—এক যোগে লাফিয়ে খারা হয়ে দাঁড়ায়। রক্ত কণিকাগুলি সিন্ সিন শব্দে এক পলকে মাথায় উঠে আসে। এই অবস্থায় দেহের প্রতিটি স্নায়ু দূর্বল হয়ে পড়ে। হৃদপিণ্ডে শুরু হয় ঢেকির শব্দের ন্যায় ধূপ-ধূপানী। চোখের মণি সাবধানী ও মন দৃঢ়চেতা হলেও স্কুল পালানো ছাত্রের ন্যায় চোখের উপর চোখ রেখে দাঁড়াবার হিম্মত তখনও পরিপূর্ণ আয়ত্তে আসেনি। এই হল নবাগত আত্ম গোপন কারিদের মানসিকতার মনোজগত।

একেত ঘন কুয়াশা, তার উপর ঈশান কোণে হঠাৎ একটা মেঘ উঠে উষার আগমনী আলোকে ঝাপসা অন্ধকারে ঘিরে দিয়ে গেল। পথ চলতে গিয়ে অন্ধকারে প্রমাদ গুণে থমকে দাঁড়াতে হয়। তবু আধো আলোতে চেনা পথ ধরে এগুতে থাকি। উপায় নেই, দেরী করলে চলবে না। জরুরী কাজ রয়েছে।

রাতে যেখানে ছিলাম তার নাম পাথরঘাটা। বন্ধু ও পার্টি দরদী তারা শঙ্কর মজুমদারের বাসা, বন্ধুটি তখন কাজ করতেন জনাব এ্যায়ার আলী চৌধুরীর জমিদারী সেরেস্তায়। জমিদারের ডাক নাম হল পেচু মিয়া ভদ্রলোকের নাম আর কাজের মধ্যে যথেষ্ট মিল রয়েছে। এই আধুনিক যুগে তিনি প্রায়ই ঘোড়ায় চড়ে যাতায়াত করতেন।

পাথার ঘাটা গির্জ্জার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের বাসা থেকে বের হয়ে জেলা গারদ খানার পূর্ব পাশ দিয়ে মেথর পট্টির নিকটে পৌঁছতেই—দুইজন লোকের সাথে প্রায় মুখা মুখি ধাক্কা লাগার অবস্থায় বাধা প্রাপ্ত হলেম। তারা দুইজনেই এক যোগে হাক দিল কে? উত্তরে চট্টগ্রামী ভাষায় বললেম পথিক। সাথে সাথে জবাব এল কোথায় যাবে? বাড়ী কোথায়? নাম কি? এক সাথে অনেকগুলি প্রশ্ন মনে হল এক ঝাঁক ছড়া গুলি এসে বুকে বিধল! আমি এক নজর লোক দুইটিকে দেখে নিয়ে মনে মনে যাচাই করে নিলেম। খাকী জীন কাপড়ের পোষাকে হৃষ্ট পুষ্ট দেখালেও বাস্তবে গায়ে গতরে তেমন শক্তিশালী নয়। গলার হাঁড়গুলি স্পষ্ট প্রমাণ করে দিচ্ছে। তাছাড়া ভাঙ্গা চোয়াল আর কোটরাগত চোখ দুইটি দেখে এদের দেহের হিম্মত মাপা যায়। প্রয়োজন হলে এক হাত লড়া যাবে। তবে বাড়তি শক্তির মধ্যে দুইজনের

হাতে দুইটি কাঠের চেলা রয়েছে। এরা স্বভাবগত চোর। তাই আশু রাস্তার সওদাগররা এদেরে মাসিক বেতন-পোষাক দিয়ে রাতের পাহাড়াদার বানিয়েছে। উপাধি নাইটগার্ড।

প্রথমে বিনীত ভাবে উত্তর দিলেম, বাড়ী আমার গ্রামে। কলকাতায় থাকি ও ছোট খাটো ব্যবসা করি। রাতে ট্রেনে এসে প্লাটফরমে ছিলেম। (তখন ও পাস পোর্ট ভিসা চালু হয়নি) আমার নরম ও ভদ্র আচরণে গার্ডদ্বয়ের ঔদ্ধত্য বেড়ে যায়। বলে বগলের গাঠুরিতে কি আছে দেখাও? অপরজন দেখাবার অবসর না দিয়ে নিজেই এক ঝটকায় বগলের গাঠুরি নিয়ে খুলতে শুরু করে। বললেম খুলে কি হবে নিজের ব্যবহারের জিনিষপত্র। দুইজনে মিলে জিনিষপত্র দেখতে থাকে। আমি তখন বুঝে নিলেম বিপদ আরও জাকালোভাবে ঘনিয়ে আসছে। গাঠুরি খুলে দেখে কিছু কাগজপত্র, ইস্তাহার, ঘড়ি, কলম, মানিব্যাগ, লুঙ্গি, গামছা, সার্ট এবং জুতা। সব দেখে একজন বলে শালা নিশ্চয় চোর হবে। কোন বাসা থেকে এসব চুরি করে ভাগ্‌তেছে। দ্বিতীয় জন কিছু লিখা পড়া জানে। ইস্তাহার ও স্বাধীনতা পত্রিকার শিরোনাম পড়ে বুঝতে পারে ধৃত ব্যক্তি চোর নয়, সরকার বিরোধী লোক। টর্চ লাইটের আলোতে বাকী জিনিষপত্র এক নজর দেখে নিয়ে বলে চল থানায়। এবার আমি শেষবারের মত অনুরোধ জানালেম। পরিবারের অসুখের খবর পেয়ে বাড়ী যাচ্ছি। এই মরে সেই মরে অবস্থা। থানায় নিয়ে কেন অযথা হয়রানীতে ফেলবেন। বরঞ্চ এক কাজ করুন আমার যা আছে আপনারা নিয়ে যান। (নগদ ৫১.00 টাকা, হাত ঘড়িসহ প্রায় দুইশত টাকার মালামাল) তবু আমায় ছেড়ে দিন। গার্ডদ্বয় মোটা টাকার উপঢৌকনের কথা শুনে ভাবলো লোকটি নিশ্চয়ই জাদরেল গোছের হবে। থানায় নিয়ে গেলে হয়ত বেশী পারিতোষিক পাওয়া যাবে। তারা আমার প্রস্তাবে রাজী না হয়ে দুইজনে বগল দাবা করে আমায় থানার দিকে রওনা হল।

নাইট গার্ডরা টোপ না গিলায় আমি নতুন পন্থার কথা ভেবে নিলেম, তা অবশ্য আমার সহজাত অভ্যাস। যে কোন কাজ সফল করে তোলার জন্য পর পর কয়েকটি বিকল্প পথ পরিকল্পনায় রাখা। এটা না হলে ওটা অনুসরণ করে চলা। কোন অবস্থাতেই উদ্যমহারা হলে চলবে না। তা যত বড় বিপদ সংকুলই হউক না কেন?

ভাব্‌তে ভাব্‌তে নিরীহ গো-বেচারার মত কিছুদূর গিয়ে তে-মাথার মোড় এল, মোড় ঘুরতেই আচম্বিতে ডাইনের গার্ডের উপর জোজুৎসুর প্যাচ কষা হল. মনে মনে পরিকল্পনা ছিল প্রথমে ডান পাশের গার্ডকে নালায় ফেলে দিয়ে সাথে সাথে বাম পার্শ্বের গার্ডের উপর জোজুৎসুর প্যাঁচ মারবো, তার পর তাদের চেতনা ফিরে আসার পূর্বেই অনেক দূর চলে যাবো। কিন্তু নিজের ডান পায়ের হাটুর গিটু শত্রুর অণ্ডকোষে এবং ডান হাতের তালুর গোড়ালী শত্রুর থুথ্‌নীর নীচে একই সাথে জোরে আঘাত হান্‌তে পারেনি। কাজটা একটু আগে পড়ে হয়ে যায়, যেহেতু আমি নিজে তাদের বগল দাবা ছিলেম। ফলে ডাইনের গার্ডটি ছিট্‌কে নালায় পড়লো বটে, সাথে সাথে সে পরার সময় আমার মাথার লম্বা চূলে খাম্‌ছি দিয়ে ধরে ফেলাতে আমি সহ নালায় গিয়ে পড়লাম। নীচে ১ম গার্ড উপরে আমি, ইত্যিবসরে দ্বিতীয় গার্ড ছিট্‌কে দুরে গিয়ে পজিশন নিয়ে আমার উপর আঘাত হানে। তার হাতে ছিল চৌপাট্টা কাঠের টুক্‌রা। তাই দিয়ে সে পিটাতে শুরু করে। আমি তখন বাম হাত দিয়ে এক দিকে লাঠির আঘাতকে ঠেকাতে চেষ্টা করছি, ডান হাত মাথার চুলকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা নিয়েছি। মূল লক্ষ্য লাঠির আঘাত থেকে মাথাকে রক্ষা করা। দুই তিনটি লাঠির আঘাত বাম হাতে ঠেকানোর পর বাম হাত অকেজো হয়ে গেল। বৃদ্ধ আঙ্গুলের গোড়ায় আঘাত লেগে তা অনেকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো, এর পর বাম হাতের কব্জী দিয়ে লাঠির আঘাত ঠেকাতে গিয়ে কব্জিও কেটে গেল। তখনও আমার ডান হাত প্রথম গার্ডের গায়ের তলে আটক, এর পর দ্বিতীয় গার্ডের ৩/৪ টি লাঠির ঘা এসে পড়লো মাথায়। মাথা ৩/৪ আঘাতে ফেটে চৌচিড় হয়ে গেল। প্রতিরোধ ক্ষমতা আর রইলো না। তখন তারা দুই জনে আমাকে টেনে নালা থেকে উপরে উঠাল। এই অবস্থায় আত্ম সমর্পন করা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর রইলনা। অতঃপর দুই জনে পূর্বের মত বগলদাবা করে আমায় থানায় নিয়ে পৌছাল। ঘটনা স্থলটি থানা থেকে ৩/৪ মিনিটের রাস্তা। রক্ত ক্ষরণ হচ্ছে। সারা দেহ রক্তাক্ত। কিন্তু হুশ তখনও আমার বেশ আছে। থানায় নিয়ে তারা যখন যথারীতি-রিপোর্ট করছে, তখন আমি বুদ্ধি করে থানার পাকা মেঝেতে শুয়ে পড়লাম। মনে মনে ফন্দি আটলাম, যদি থানা থেকে কোন প্রকারে হাসপাতালে যাওয়া যায়; তাহলে সেখান

থেকে পালাবার আর একবার প্রচেষ্টা নেওয়া যায়, এই মতলব নিয়েই আমি থানার মেঝেতে শুয়ে পড়লাম।

থানায় ডিউটিতে ছিল ছোট দারোগা বাবু। তিনি সব শুনে আমার নাম ঠিকানা জিজ্ঞেস করলেন, একবার আসল নাম গোপন করে ভূয়া নাম দেলোয়ার হোসেন বলেই ফেললাম, ইতি মধ্যে দিনের আলো বেশ স্পষ্ট হয়ে গেছে, ডিউটি রত এক সিপাহী কামিনীদে আমাকে চিনতে পারলো। তার বাড়ী আমার বাড়ী হতে আধা মাইল দূরবর্ত্তী এক গ্রামে। ফলে দারোগা বাবু যখন দ্বিতীয় বার নাম জানতে চাইলেন তখন আর মিথ্যা বলা হল না। আসল নামই বলতে হল।

আসল নাম ঠিকানা বলার পর, কাগজ পত্র দেখে ছোট দারোগার স্পষ্ট ধারণা হল ধৃত আসামী রাজনৈতিক লোক, অতএব; ডি, আই বিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা উচিত। ফোন তুলে তিনি গোয়েন্দা অফিসে খবরটি পৌছালেন এবং কি করতে হবে জানতে চাইলেন। গোয়েন্দা অফিস থেকে কি খবর দিল সে খবর তিনিই জানেন। মাঝে মধ্যে জী হ্যাঁ, ইয়েস্ স্যার, ইত্যাদি কয়েকটি শব্দ শুনা গেল। তারপর ফোনটি রেখে একজন সিপাহীকে ডেকে বললেন—ডি, আই, বি বলতেছে—লোকটি সাংঘাতিক বিপদজনক, তাকে কড়া পাহাড়া দিয়ে হাতে হাত কড়া ও কোমড়ে দড়ি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে রাখতে হবে। যতক্ষণ না ডি, আই, বি'র লোক আসে।

এমন সময় সকালের ডিউটিতে এলেন বড় দারোগা বাবু। তিনি এসে দেখেন, থানার মেঝেতে রক্তাক্ত দেহে পরে রয়েছে একটি লাশ। দারোগা সাহেব ভাবলেন আসামী মৃত। তাই তিনি ছোট দারোগাকে জিজ্ঞেস করলেন এই লাশ কোথা থেকে এল ? ছোট দারোগা বললেন লাশ—নয় স্যার দেবেন সিকদার নামে এক রাজনৈতিক ফেরারী আসামী। বড় দারোগা এক নজর ভাল করে দেখে নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করে বললো—তা যে সিকদারই হউক না কেন ? হাসপাতালে পাঠিয়ে না দিয়ে এখানে কেন রেখে দিয়েছ ? ছোট দারোগা বললেন—স্যার ডি, এস, বি বলছে তারা নিয়ে যাবে আসামীকে। বড় দারোগা আরও বিরক্ত হয়ে ছোট দারোগাকে ধমক দিয়ে বললো—বুঝলাম আসামী

ভয়ঙ্কর, ডি, এস, বি, নেবে ? কিন্তু তারা নেওয়ার পূর্বেই যদি আসামী থানাতে মারা যায়, তখন তার দায়িত্ব কে নেবে শুনি।'

ছোট দারোগা ও বড় দারোগার এসব কথা স্পষ্টই আমি শুনতে পাচ্ছি। এবং আমার পরবর্তী উদ্দেশ্য সফলতার পথে এগুচ্ছে দেখে মনে মনে খুশি হয়ে—আরও নিশ্চুপ হয়ে পড়ে রইলেম। মাথা থেকে রক্ত ঝড়ে থানার মেঝের বিরাট জায়গায় রক্ত জমাট দেখে বড় দারোগা ভয় পাচ্ছিল—আসামী থানায় যদি মারা যায়, তাহলে অনেক বেশী ঝামেলা পোহাতে হবে। বিশেষ করে রাজনৈতিক মামলা। বলাত যায় না, কোথা থেকে কি বের হয়ে আসে ?

এখন ছোট দারোগা অনেকটা অপরাধীর ন্যায় বড় দারোগাকে জিজ্ঞেস করল, এখন কি করতে বলেন স্যার, বড় দারোগা বললো শিগ্রই—হাসপাতালে পাঠিয়ে দাও। মরলে সেখানে মরুক, ডি এস বি নিতে চায় সেখান থেকে নিয়ে যাক। অবশেষে তাই করা হল। বেলা তখন সকাল নয়টা, সদর হাসপাতাল তখন ছিল আন্দরকিল্লার পূর্ব দিকে পাহাড়ের মাথায়। যথারীতি রুগী দেখে-ভর্তি করে নেওয়া হল। অবশ্য সকল আসনে রুগী থাকায়—আমাকে নোয়াখালী ওয়ার্ডের পশ্চিম বারান্দায় স্থান করে দিল। মাথা ও হাতে যথারীতি সেলাই করে বেণ্ডেজ করে দিল। বেণ্ডেজ করার পর আমি বেশ সুস্থ বোধ করি। দুই এক বার পায়খানা প্রশ্রাবের অজুহাতে চারিদিক হেঁটে দেখে নেই। পরিবেশটা বুঝার চেষ্টা করি। সাথের সিপাহীদের কি ভাবে ফাঁকি দেওয়া যায় তার জন্য মনে মনে বুদ্ধি আঁটি। একবার ভাবলাম আমাদের ছাত্র সংগঠনের সাথে জড়িত মেডিক্যালে অধ্যয়নরত ছাত্রদের খোজ নেই (বর্তমানের ডাক্তার সরেশ দে, ডাক্তার নূরুল আজীম, ডাক্তার আনোয়ার ও দেলওয়ার।) কিন্তু সেই মুহুর্তে একটি নামও স্মরণে আনতে পারছিলাম না। অতপর, লোহার স্পিরিং এর চৌপায়ায় শুয়ে নিরবে পরিকল্পনা করলাম। প্রথমে দুইজন সিপাহীকে দেখে নিলাম। দুই জনই বয়স্ক। ত্রিশ বছর চাকুরীর মেয়াদ পূর্ণ হতে আর মাত্র ৪/৫ বছর বাকী। এক জনের বাড়ী ফরিদপুর, দ্বিতীয় জনের বাড়ী আমাদের পার্শ্বের গ্রামে। দুই জনই হিন্দু কৌশলের খাতিরে একটু সাম্প্রদায়িক

হলাম। বললাম দেখুন আমিও হিন্দু, আপনারাও হিন্দু। আর দারোগা, নাইট গার্ডরা মুসলিম। হিন্দু বলেই আমার উপর অবিচার-অত্যাচার করতে পারল। আর আপনারা হিন্দু বলে — দুই জনকে এই কাজে পাঠাল। কেন থানায় কি আর সিপাহী ছিলনা? সিপাহীদ্বয় আমার কথায় সায় দিল। পুনঃ বললাম কখন ডি-আই-বির লোক আমাকে নিতে আসে ঠিক নেই। বেলা গড়িয়েও যেতে পারে। তখন সারা দিন না খেয়ে থাক্‌তে হবে। সিপাহীরা এবারও সায় দেয়। বুঝলাম টোপ গিল্‌বে।

এবার প্রস্তাব করলাম। এক কাজ করুণ না কাকা বাবুরা। আমি নিজেও খুব ক্লান্ত। একটু ঘুমিয়ে নেই। আপনারা দুইজনে পালা করে একে একে খেয়ে আসুন। তাছাড়া পালিয়ে যাবার মত মোটেই আমার সামর্থ ও ইচ্ছা নেই। তাত দেখতেই পাচ্ছেন। প্রস্তাবটি তারা খুশি মনে গ্রহণ করল। তুলনামূলক বয়স্ক জন আগে খেতে গেল।

ঘন্টা দুই পর প্রথম জন খানা খেয়ে ফিরে এল। দ্বিতীয় জন খেতে গেল। ইতিমধ্যে হাসপাতাল থেকে পথ্য হিসেবে দুধ ও পাউরুটি দিয়ে গেল। খেয়ে সত্যিই একটু আরাম অনুভব করলাম।

এবার বৃদ্ধ সিপাহীকে অনুরোধ করলাম, আপনিত আমাদের পাশের গ্রামের বাসিন্দা। আমার বাবা-কাকাকে নিশ্চয় চিনেন-জানেন। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে আমার শরীর খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছে। একটু ঘুমাইলে বোধ হয় সুস্থ বোধ করতাম। আপনি একটু সজাগ দৃষ্টি রাখবেন আমাকে যেন কেহ না জাগায়। এই বলে পাশ ফিরে ঘুমের ভান করে নাক ডাকাতে শুরু করলাম।

বৃদ্ধ সিপাহী কামিনী বাবু মনে করলেন আমি সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে পড়েছি। তাই তিনি সামনের কৃষ্ণ চূড়া ফুল গাছের নীচে একটি পরিত্যক্ত খাটিয়ায় গা এলিয়ে দিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। ২/৩ তিন মিনিট পর সিপাহীজীর নিদ্রা এসে গেল। তিনি নাক ডাকতে শুরু করলেন। আঁড় চোখে একবার চোখ মেলে তাকিয়ে নিলাম। মনে মনে স্থির করলাম এইত মোক্ষম সুযোগ। আর মুহূর্তও দেরী করা উচিত হবেনা। যে কোন মুহূর্তে আই বি'র লোকেরা এসে পড়তে পারে।

খুব সন্তর্পনে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। হাত বাড়িয়ে পানির গ্লাসটা হাতে নিয়ে একবার সিপাহীজীর অবস্থা দেখে নিয়ে দ্রুত পায়ে হাসপাতালের পায়খানার দিকে এগিয়ে গেলাম। কান ছিল সজাগ. কোন পিছু ডাক শুনা গেলনা। ঢুকে পড়লাম পায়খানায়। পায়খানাটি ছিল সাগর কলার ন্যায় বাঁকানো। দুইদিকে সাত × দুই চৌদ্দ খানা কুটুরি। পেছন দিক খোলা। সোজা সিড়ি বেয়ে নেমে গেলাম। তার পর হাসপাতালের পোষ্টমোর্টম। পাহাড়ের গা ঘেষে ১০/১২ হাত নীচে। পাকা প্রসস্থ সিড়ি বেয়ে নেমে গেলাম; এর ১০/১৫ কদম দূরে কাটা পাহাড়ের গলি রাস্তা। আশে পাশে কোন লোকজন নেই। মুহূর্ত দাঁড়িয়ে মাথা ও হাতের বেণ্ডেজ খুলে ছুড়ে ফেলে দিলাম। গায়ের গেঞ্জি খানা খুলে মাথায় জড়িয়ে নিলাম। পরনের লুঙ্গি খানা চট্টগ্রামী মস্তানদের ন্যায় উল্টিয়ে কোমরে গীট মেরে সেণ্ডেল জোড়া ফেলে দৌড় মারলাম। গন্তব্য স্থল পূর্বেই মনে মনে ঠিক করে রেখেছি। ষোল শহর রেল ষ্টেশনের উত্তর দিকের পাহাড়। যেতে হবে ঘাট ফারহাদবেগ থেকে দেয়ানজী পুকুরের পার দিয়ে নেলি সেন গুপ্তার বাড়ীর সামনের গলি দিয়ে জামাল খান রোড, তারপর খাস্তগীর বালিকা বিদ্যালয় পার হয়ে আস্কার দিঘীর ঈসান কোন হয়ে জনাব ফজল কাদেরের বাড়ীর সামনে দিয়ে চট্টেশ্বরী রোড। চট্টেশ্বরী রোড থেকে ইটা খোলা দিয়ে বর্তমান মহিলা কলেজের পাশ দিয়ে রেল লাইন পার হয়ে ষোল শহর পাহাড়।

মনে মনে সময় নির্দিষ্ট করে নিলাম। পনর থেকে বিশ মিনিট। এর মধ্যই তিন চার মাইল পথ অতিক্রম করতে হবে। আর্থাৎ ডি আই বির লোক এসে যখন আসামীকে না পেয়ে চারি দিকে খোঁজ খবর ও তল্লাশীর নির্দ্দেশদানের (অবশ্য টেলিফোনে) প্রস্তুতি নেওয়ার মধ্যেই আমাকে শহর ছেড়ে যেতে হবে। এই অল্প সময়ের মধ্যে শহর ছেড়ে যেতে হলে-এক মাত্র উপায় হল দৌড়ান। হেঁটে অতিক্রম করা যাবেনা। শহরের রাস্থায় কোন স্বাভাবিক মানুষ দৌঁড়ায় না। মাঝে মধ্যে দৌঁড়ায় পাগল তথা বিকৃত মস্তিস্কের মানুষ। তাই আমি ঠিক করলাম, আমাকে পাগলের অভিনয় করতে হবে। অগত্যা তাই করা হল।

চট্টগ্রাম আঞ্চলিক ভাষায়-"শালা-শুয়ারকা লেড়কা, তেরি মাদার ইত্যাদি অকথ্য সুললিত ভাষায় উচ্চ মার্গের রাগীনির সুরে গালি দিতে দিতে দৌড়াতে লাগলাম।" মাঝ পথে কমরেড আরতী দত্তের বাসায় একবার ঢু মেরে দেখলাম কেহ আছে কিনা? কিন্তু কোন ফল হলনা। তখন কমঃ প্রণতি দত্ত (কমঃ শরদেন্দু দস্তিদারের স্ত্রী) বাসায় ছিলনা। তখন তিনি অবশ্য দস্তিদার হননি।

আমার এই "পাগল অভিনয়" খুবই চমৎকার হয়েছিল। মাঝে মধ্যে রাস্তায় দুপুরের ঘুম পালানো শিশুদের উক্তি 'ঐ যে এক পাগল দৌড়াচ্ছে'- ইত্যাদি কানে ভেসে আসছে।

অবশেষে ষোল শহর ষ্টেশনের পশ্চিম দিক দিয়ে রেল লাইন যখন পার হলাম-তখন শরীর একেবারে নিস্তেজ হয়ে আসতে লাগল। বিপদ সীমার সাথে মন ও দেহের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। সত্যিকার অর্থে আর বেশী দূর এগুনো গেলনা। শেষ শক্তি বিন্দু খরচ করে শ' খানেক গজ পাহাড়ের ভিতরে প্রবেশ করে এক আমলকি গাছের তলায় শুয়ে পড়লাম। সাথে সাথে ঘুম বা মুর্চ্ছা এসে গেল। বেলা তখন সাড়ে বারটা কি একটা।

বেলা পাঁচটা কি সাড়ে পাঁচটায় হুশ ফিরে এল। প্রথমে চোখ মেলে তাকিয়ে কিছুই বুঝতে পারছি না। পরে চিন্তার যোগ সূত্র-প্রথিত হল। কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল পরিপূর্ণ সম্বিত ফিরে পেতে। তার পর সবই স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল। দারুন জল পিপাসায় বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে। কিন্তু শক্তি নেই যে জল খুঁজে নিয়ে খাওয়ার। চারি দিকে একবার নজর বুলিয়ে নিলাম। এক দিকে একটা ছড়ার (খাল) ন্যায় মনে হল। বেশী দূরে নয় (১০/১২ গজ) সাহস করে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলাম। মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছি। আবার বসে পড়লাম। এবার ক্রলিং করার চেষ্টা করে দেখা যাক। তাও পারছিনা। অগত্যা গড়িয়ে গড়িয়ে ছড়ার নিকটে যাওয়ার মনোস্থ করলাম। যেমন করে রাজধানী ঢাকার গলি রাস্তায় ৩/৪ জন পঙ্গু গড়িয়ে ভিক্ষা সংগ্রহ করে, জল আমাকে অবশ্যই খেতে হবে। জল না খেলে শক্তি ফিরে পাবনা। ঘটনা চক্রে ভাল জল পাওয়া গেল। অনেক্ষণ ধরে জল খেলাম। হাত মুখ ধুয়ে, বেশ সুস্থ বোধ

করলাম। এবার নিজ পায়ে ভর করে হেটে পুনঃ আমলকী গাছের তলায় এসে বসলাম।

সূর্য্য অস্ত যাবার আর কয়েক মিনিট বাকী। এবার উঠতে হয়। কোথায় যাব তা আগে নির্দ্ধারিত ছিল। নতুবা এখানে আসতাম না। এখান থেকে মাইল দেড় দূরে উত্তর কাট্টলী গ্রাম। কৈবল্য ধাম রেল ষ্টেশনের নিকটে পায়ে চলার রাস্তাও সুপরিচিত। তবু একটু সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। যদি কেহ হঠাৎ চিনে ফেলে? তাছাড়া এই চার পাঁচ ঘন্টার মধ্যে শহরে কি পরিমাণ তল্লাশী হয়েছে তা কে জানে। হয়তো আসামী পালিয়ে যাওয়ার পর আই বি; ডি-এস-বি'র তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে?

শেষ পর্য্যন্ত হাল্কা ধরণের কিছু মরা কাঠ সংগ্রহ করে একটা আটি বেঁধে মাথার উপর রেখে গাঁয়ের পথে রওনা হলাম। পরনের লুঙ্গি উল্টানো অবস্থায় আছে। কাঠুরিয়ারাও সে ভাবেই লুঙ্গি পরিধান করে থাকে।

সন্ধ্যার গা-আঁধারী আলোতে খড়ির বোঝা নিয়ে প্রথমে কমঃ অনিল সেনের বাড়ীতে ঢুকে তার স্ত্রীর সামনে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম "খড়ি কিনবেন খড়ি" তিনি উঠানে দাঁড়িয়েছিলেন। আমাকে চিনতে পারেননি। অনিল দার স্ত্রী বললেন 'না গো না, খড়ি লাগবে না।' আমি বললাম দাদা পাঠিয়েছে তাই বলে তাহার পার্শ্বে খড়ির বোঝা ছুড়ে ফেললাম। তখন তিনি আমায় চিনতে পেরে আশ্চর্য্য হ'য়ে জিবে কামড় দিয়ে শুধালেন 'সিকদার দাদা' ?--আমি তৎক্ষণাৎ জিবে কামড় দিয়ে—হাত দিয়ে সংকেত দিয়ে জানালাম চুপ. কথা বলবেন না। তারপর ঘরে ঢুকে বারান্দায় স্থায়ীভাবে পাতা চকিতে আস্তে করে শুয়ে পড়লাম, ঈশারায় অনিলদার বিধবা বোন আমাদের সকলের সরলা দিদিকে কাছে ডেকে বললাম 'দেখুনত বিমল কিংবা রোহিনী বাড়ীতে আছে কিনা'। থাকলে সাথে করে নিয়ে আসবেন। না থাকলে খুঁজে পেতে বের করবেন। জরুরী দরকার আছে। সে সময়ে উত্তর ও দক্ষিণ কাট্টলী গ্রামে পার্টির অনেক কর্মী ছিল, তাদের বেশীর ভাগ ছিল পাহাড়তলী রেলওয়ে ওয়ার্কসপের শ্রমিক। কমঃ রোহিনী তালুকদার ও কমঃ বিমল দে ছিলেন পার্টির স্থানীয় নেতা, পেশাদার বিপ্লবী।

অল্পক্ষণের মধ্যেই কমঃ বিমল ও রোহিনী এসে হাজির হলেন। তারা ইতিমধ্যেই জানতে পেরেছেন যে কমঃ সেলিম ধরা পড়ে হাসপাতাল থেকে পালিয়ে গিয়েছে, যার জন্য তামাম শহরে হৈ চৈ পড়ে যায়। বেলা দুইটার দিকে সমস্ত শহরের প্রধান প্রধান রাস্তায় যান বাহন থামিয়ে তল্লাশী করা হয়। বহু পার্টি কর্মীর বাড়ীতেও খানা তল্লাশী চলে।

এর পরের ঘটনা খুবই সংক্ষিপ্ত ঃ-

* কমঃ বিমল সেই সন্ধ্যারাতে শহরে গিয়ে পার্টির বিশিষ্ট ডাক্তার কমঃ পরেশ দে কে ডেকে নিয়ে আসেন। তিনি এসে যথারীতি চিকিৎসার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এবং তার মাধ্যমেই পার্টি কেন্দ্রে খবর পৌঁছায় কমঃ সেলিম নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে গেছে।

* আই-বি অফিসের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের চরম অপদার্থতার জন্য কমঃ সেলিম গ্রেপ্তার হওয়ার সাত ঘন্টা পর হাসপাতাল থেকে পলায়ন করতে সক্ষম হয়, অথচ এর জন্য শাস্তি ভোগ করতে হয় নিরীহ সিপাহীদের। একজনের পেনশান বাতিল অপরজনের এক বছর বিনাবেতনে কাজ।)

* এই ঘটনার পর হতে সমগ্র পার্টির মধ্যে আমার সম্পর্কে নানান গল্প, গুজব ছড়িয়ে পড়তে থাকে যার মধ্যে অতিরঞ্জনই ছিল অধিক। যা মধ্যবিত্ত চরিত্রের প্রধান বীর পূজার প্রবণতা থেকে উৎপত্তি।

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্বপ্ন দ্রষ্টা

১৯৫৬ সাল। পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টির পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় গোপনে কলকাতায়। (পুনঃগঠিত হয় ১৯৪৮ সালে) সর্বমোট তেত্রিশ জন প্রতিনিধি উপস্থিত হওয়ার কথা ছিল। যতদুর মনে পড়ে সাতাইশ জন উপস্থিত ছিল।

চট্টগ্রাম থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধি চার জন। নগেন দে, আবদুস ছত্তার, চৌধুরী হারুনর রশিদ ও দেবেন সিকদার। চারজন পৃথক পৃথক পথে গোপনে পৌঁছলাম কলকাতায়। যথাস্থানে রিপোর্ট করে থাকলাম নিজ

নিজ প্রাক্তন বন্ধুদের বাসায়। আমি আত্মগোপনে থাকা সত্ত্বেও "অমিয় কান্তি ঘোষ" এই নামে পাশপোর্ট ভিসা করে প্রকাশ্যে দর্শনা সীমান্ত দিয়ে কলকাতায় গিয়েছিলাম। কোন প্রকার অসুবিধা হয়নি। কৌশলটা ছিল অতীব সহজ সরল। নিজের আসল ছবি দিয়ে কেবল নাম, ঠিকানা বাপের নাম পরিবর্তন করে দরখাস্ত দিয়ে পাশপোর্ট ভিসা বের করে নেওয়া। আর পুলিশী তদন্ত না হওয়ার জন্য ৫/১০ টাকা খরচ করা।

৪৭ সালে ভারত-বাংলা বিভক্তির দশ বছর পর কলকাতায় এসেছি অগণিত বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন কলকাতার প্রতিটি পাড়াতে। পশ্চিম বাংলার প্রতিটি জেলায়। আমি যাদের বাসা ও বাড়ীতে প্রধানত আতিথ্য গ্রহণ করেছি, তাদের মধ্য ছিল কলকাতায় কমঃ বঙ্কিম ও আমিয়া সেন, সুবোধ রায়, সুমতি মজুমদার, ডাঃ অনিল রায়, মোক্ষদা ও প্রিয়দা চক্রবর্ত্তী, সচীন ও সুব্রতা নন্দী, যোগেশ ও জ্যোৎস্না শ্যাম, পরেশ দাস, জ্যোতিঃ দিদি, অধ্যাপক জ্যোতির্ম্ময় বিশ্বাস, বেলঘরিয়ার কমঃ ব্রজেন স্বর্ণ প্রভা চৌধুরী, শুধাংশু দে, ডাঃ লাল মোহন দে, চন্দন নগরের কমঃ চিত্ত প্রিয় দাস এ্যাডভোকেট ও ডাঃ শান্তি প্রভা ঘোষ।

কলকাতার আরও ছিলেন কমঃ গনেশ ঘোষ, জুলু সেন, মধু সিংহ, অর্ধেন্দু গুহ। এছাড়া আরও অনেকে। সকলের নাম লিপিবদ্ধ করা হলে বই এর কলেবর তনেক বড় হয়ে যাবে আবার অনেকের নামও মনে নেই।

পাশপোর্ট ভিসা করে যাওয়াতে আমি অনেকের আগে কলকাতায় পৌঁছি। বন্ধু-বান্ধবদের সাথে দেখা করার বেশী সুযোগ পাই।

সেবার কলকাতায় প্রায় তিনমাস ছিলাম। ভিসার মেয়াদ দুই দুইবার বৃদ্ধি করতে হয়। উপরন্তু সেবার অন্ধ ব্যারিষ্টার কমঃ সাধন গুপ্তের পক্ষে একটা উপ নির্বাচনে কাজ করার সুযোগ হয়। সঞ্চিত হয় ঐ বিষয়ে অভিজ্ঞতা।

আমাদের কংগ্রেস বসেছিল দুই বার সর্ব মোট পনের দিন। তাও আবার ২০/২৫ দিন অন্তর। প্রথমবার যে বাড়ীতে বৈঠক বসে সে বাড়ীটা অস্থায়ী ভাবে ভাড়া নেওয়া হয় এক নকল বিবাহ অনুষ্ঠানের জন্য।

---

* প্রকৃত অমিয় কান্তির বাড়ী ছিল রাউজান থানার গহিরা গ্রামে।

দ্বিতীয় বাড়ীটি নেওয়া হয়েছিল এক নকল মৃত্যু শ্রাদ্ধ করার জন্য। ঘটনা চক্রে তা হয়ে দাঁড়ায় পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির মৃত্যু এবং পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির জন্য জীয়ত কর্ম অনুষ্ঠান। কারণ ঐ কংগ্রেসের পর, ঐ নামের পার্টির আর কোন কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়নি।

যতদূর স্মরণ করতে পারছি নিম্নলিখিত কমরেডগণ কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন।

১। সর্ব কমরেড মনি সিংহ ২। নেপাল নাগ ৩। খোকা রায় ৪। বারিন দত্ত ৫। অনিল মুখার্জি ৬। মোজাফফর আহমদ (অধ্যাপক) ৭। ডাঃ মারুফ হোসেন ৮। কুমার মিত্র ৯। এ্যাডভোকেট নূরুল ইসলাম ১০। শহিদুল্যা কায়সার ১১। সুকুমার ভাওয়াল। ১২। রুহিনী দাস ১৩। সুখেন্দু দস্তিদার (বশীর) ১৪। অমূল্য লাহিড়ী ১৫। মনি কৃষ্ণ সেন ১৬। কৃষ্ণ বিনোদ রায় ১৭। মোঃ তোয়াহা ১৮। গুরু দাস তালুকদার ১৯। রওশন আলী ২০। আফতাব আলী ২১। জ্ঞান চক্রবর্ত্তী ২২। ইলা মিত্র ২৩। আবদুল্লা রসুল ২৪। চৌধুরী হারুনর রশীদ ২৫। আবদুস ছাত্তার ২৬। নগেন দে ২৭। দেবেন সিকদার ২৮। সরদার ফজলুল করিম।

কংগ্রেসের ২য় অধিবেশনে পূর্ব পাক আইন সভার যারা সদস্য ছিল তারা উপস্থিত ছিলনা।

কংগ্রেসের শেষ অধিবেশনের শেষ দিকে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড অজয় ঘোষ একটি মূল্যবান ভাষণ দিয়েছিলেন সোভিয়েত রাশিয়ার ষ্টালিন উত্তর ১৯তম কংগ্রেস সম্পর্কে। তিনি সদ্য ঐ কংগ্রেস ফেরত ছিলেন। তাঁহার ভাষণ থেকে আমরা-সোভিয়েত রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ অনেক অজানা বিষয় জানতে পারি এবং রাশিয়ার সংশোধনবাদ সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়।

কমঃ অজয় ঘোষের ভাষনের পর আমাদের কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের মধ্যে দুই ধরণের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানে যারা সংশোধনবাদী লাইনে রয়েছেন-তারা ছিল অত্যধিক উৎফুল্ল। বিশ্ব কমিউনিজমে দুর্য্যোগের কালো মেঘ দেখে আমরা ৪ জন হয়ে পড়েছিলাম বিমর্ষ। ডাঃ মারুফ, নগেন দে, কুমার মৈত্র ও দেবেন সিকদার।

এখন আসা যাক শিরনমের প্রতিপাদ্য বিষয়ে। কমঃ **অনন্ত সিংহ** ১৯৪৮ সালে পার্টির চট্টগ্রাম জেলা কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। তারপর মাস ছয় সময় কাল চট্টগ্রাম ছিলেন। ঐ কমিটিতে আমিও সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলাম। সেই সূত্রে অনন্তদার সাথে গড়ে উঠেছিল ঘনিষ্ঠতা। তিনি আমাকে খুবই স্নেহ করতেন। কলকাতায় একদিন কমঃ "জুলু" সেনের মাধ্যমে অনন্ত সিং এর সাথে সাক্ষাৎ হয়।

অনন্ত সিংহ সাধারণতঃ বিপ্লবের সামরিক দিকটা নিয়েই চিন্তা ভাবনা করতেন। তিনি তা বলতেন সকলের নিকট। ঐ দিন কথা প্রসঙ্গে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক—ভৌগলিক ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলাপের পর তিনি বললেন-যদিও আমি বর্তমানে পাকিস্তানে অবস্থান করছিনা, অবস্থান করছি ভিন্ন রাষ্ট্র ভারতে, তথাপি আমার যতদূর মনে হয়ঃ—

"রাষ্ট্র বিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিয়ে বিচার করতে গেলে পাকিস্তান একটি অবৈজ্ঞানিক কৃত্রিম রাষ্ট্র। দুই বিছিন্ন ভূখণ্ড নিয়ে রাষ্ট্র হয় না। হলে তার অর্থনীতি এক থাকে না। এক রাষ্ট্রে দুই অর্থনীতি অচল।

বিকাশমান অবাঙ্গালী মুসলিম ধনীক শ্রেণীর স্বার্থে ভূয়া দুই জাতি তত্ত্বের আবরণে ইহার জন্ম।

ফলতঃ পূর্ব পাকিস্তান অনবরত শোষিত হচ্ছে এবং এখান থেকে সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হচ্ছে, এরই পরিনামে এক দিন না এক দিন পূর্বাঞ্চলের জনগণ জাগবে, পাকিস্তান ভাঙ্গার উদ্যোগ নেবে; স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা রাষ্ট্রের দাবী জোড়ালো হয়ে উঠবে।"

তাঁহার মতে সে কাজটা ঘটবে দুইদিন পরে. ঘটিতে বাধ্য রাষ্ট্র বিজ্ঞানের কারণে যেই কাজটাকে মার্কসবাদী দৃষ্টি কোণ থেকে বিশ্লেষণ করে সমাজ বিপ্লবের পথে চালিত করার দায়িত্ব কমিউনিষ্ট পার্টির। বিশেষ করে সেই মহান দায়িত্ব বাঙ্গালী বুর্জোয়ারা পালন করতে পারে না, যেমন পারেনি ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী - বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব দিতে। তারা আপোষকামী ছিল। যে ভুল ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি করেছে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে নেতৃত্ব না দিয়ে; সেই একই ভুল করা হবে

যদি বাংলা রাষ্ট্র, বাঙ্গালী জাতির জাতীয় সত্তা, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য সংগ্রাম করা ও নেতৃত্ব দানের সিদ্ধান্ত পূর্ব বাংলার কমিউনিষ্টরা গ্রহণ না করে।

তিনি আরও বললেন "ভালই হল তোমাদের সাথে দেখা হয়ে, তোমরা যদি আমার সাথে ঐক্য মত পোষণ কর, তবে এই বিষয় নিয়ে আমাদের পার্টির অভ্যন্তরে আলোচনার সূত্রপাত ঘটাইতে পার।"

এই আলোচনার পর প্রথমে আমি ও কমঃ নগেন দে, নিজদের মধ্যে পরে চট্টগ্রাম প্রতিনিধিদের সাথে আলাপ করি। তার পর কংগ্রেস প্রতিনিধি অনেকের সাথে আলাপ করলাম। কিন্তু তেমন কোন ফলপ্রসু সাড়া পাওয়া গেল না। কেবল মাত্র দুই জন কংগ্রেস প্রতিনিধি—উৎসাহিত হয়ে এগিয়ে এলেন। তারা হচ্ছে কমঃ ডাঃ মারুফ হোসেন ও কুমার মৈত্র। যথাক্রমে যশোর ও ফরিদপুরের প্রতিনিধি। এরা দুইজন মার্কসবাদী জ্ঞান গরিমায় নিঃসন্দেহে আমার তুলনায় অনেক উন্নত ছিল।

পরিশেষে সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্টের উপর আলোচনা করতে গিয়ে কমরেড কুমার মৈত্র অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় বিষয়টি বক্তব্য আকারে উপস্থাপন করলেন এবং কমঃ মারুফ হোসেন, নগেন দে ও আমি আমাদের বক্তব্যের সময় তাকে সমর্থন জানালাম। নিজদের দুর্বলতার কথা স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে, বর্তমানের তুলনায় তৎকালে (১৯৫৬) আমি অনেক বিষয়ে জ্ঞানের নিম্নমানে অবস্থান করছিলাম। যার জন্য আমরা কংগ্রেসকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হলাম না। ফলে চার ভোটে ব্যবধানে আমরা হেরে যাই। পরিণামে সেই হতে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত এ বিষয়ে পার্টির অভ্যন্তরে আপোষহীন সংগ্রাম চালাতে হয়।

এর পর ১৯৬৬ সালে ঐ পার্টি আপোষে ভেঙ্গে যায়। জন্ম নেয় পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টি। যার সম্পাদক ছিলেন সুখেন্দু দস্তিদার ওরফে বশীর। সম্পাদকমণ্ডলীতে ছিলেন মোহাম্মদ তোয়াহা ও আবদুল হক। এই পার্টিতেও সংগ্রাম চলে ঐ বিষয়ে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত। এরাও স্বাধীন পূর্ব বাংলা রাষ্ট্রের বিরোধীতা করে। তবে প্রত্যক্ষ ভাবে নয় ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের মাধ্যমে। কেননা ১৯৬৭ সালে এই পার্টির প্রতিষ্ঠা

কংগ্রেসে স্বাধীন সর্বভৌম পূর্ব বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লাইনটি সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয়।

এখান 'থেকে বের হয়ে নতুন করে গঠিত হয় পূর্ব বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টি" যার সম্পাদক ছিলাম আমি নিজে। সাংগঠনিক কমিটির সদস্য ছিলেন সর্ব কমরেড আবুল বাশার, আবদুল মতিন, আলাউদ্দিন, নুরুল হক চৌধুরী ওরফে মেহেদী। কিন্তু ১৯৬৯ সালের ১৭ই জুলাই আমি সুদীর্ঘ বাইশ বছর পর গ্রেপ্তার হয়ে যাওয়ায় কমঃ আবদুল মতিন ও আলাউদ্দিন পুনরায় ডিগবাজী খায়। পশ্চিম বাংলার নক্সাল নেতা শ্রী চারু মজুমদারের হঠকারী লাইন গ্রহণ করে। তারাও পাকিস্তান ভেঙ্গে পূর্ব বাংলায় পৃথক রাষ্ট্র গঠনে বিরোধীতা করে। ১৯৭১ সালে যখন স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় তখনও তারা তার বিরোধীতা করতে থাকায় সেই পার্টিও এই ইস্যুতে (যুদ্ধের পক্ষে-বিপক্ষে) কার্যতঃ ভাগ হয়ে যায়। শেষ পর্য্যন্ত তারা পাক বাহিনীর সাথে সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করে।

অপর দিকে কমঃ মনি সিংহের নেতৃত্বে কমিউনিষ্ট পার্টি বাঙ্গালী জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল ১৯৭১ সালের ১৩ই এপ্রিল ভারতের আগরতলা রাজ্যে পার্টির জরুরী কংগ্রেসে। তবে তাদের সিদ্ধান্তটি ছিল বাঙ্গালী মুৎসুদ্দী ধনীক শ্রেণীর দল আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে এবং রুশ ও ভারতের পৃষ্ঠ পোষকতায় এই কাজ করা হবে। তারা কোন কালেই কমিউনিষ্টদের নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার কথা ভাবেনি।

যার ফলে বাঙ্গালী জাতির স্বাধীনতা সংগ্রাম আজও অসমাপ্ত। যেমন অসমাপ্ত ছিল পাকিস্তানের বাইশ বছর কালে। এ ভাবেই কমঃ অনন্ত সিং এর স্বাধীন সার্বভৌম পূর্ব বাংলা রাষ্ট্রের স্বপ্ন এবং পূর্ব বাংলা তথা বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টির প্রচেষ্টা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। বাংলার দশ কোটি মানুষ আজও মুক্ত নয়। অর্জ্জিত হয়নি স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব। এক কথায় মানচিত্র পেলেও মান ও সম্পদের অধিকারী হতে পারেনি। কৃষকের ভাষায় বলা চলে এখানে চলছে নিজের জমিতে নিজ শ্রম ও হালে বর্গাচাষ।

কুমারী মন ও জটিল প্রেম

১৯৫৪ সাল। পূর্ব পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এই উপলক্ষে আমার কর্ম ক্ষেত্র কয়েক মাসের জন্য গ্রামে স্থানান্তর হয়েছে। দীর্ঘ বছর শহর ও শিল্পাঞ্চলে এবং যান্ত্রিক কোলাহলের পরিবর্তে শান্ত সবুজ প্রকৃতির কোলে বিচরণ, সহজ সরল কৃষক সমাজের সাথে মেলা-মেশা বেশ বৈচিত্রময় পরিবর্তন এনে দিল মনের রাজ্যে।

কাল এর হিসেবে আমার স্ত্রী বিয়োগের প্রায় এক যুগ পর, বয়সের দিক থেকে যৌবন ও পৌঢ়ত্বের সন্ধিক্ষণে (৩৪/৩৫) আমার মনের মধ্যকার একটি সুপ্ত কামনা মাঝে মধ্যে উঁকি মারতো। যদি কোন দিন মনের মত একটি মন ও সংবেদনশীল হৃদয় পাই তবে তাকে জীবন সঙ্গিনী করার কথা ভাববো। অবশ্য প্রধান শর্ত হবে “যার যার দায়িত্ব তার তার”। এর অর্থ কেহ কাহারও আর্থিক দায় দায়িত্ব বহন করবেনা। আরও সহজ কথায়-আমার জীবনের মূল লক্ষ্য “পেশাদার রাজনীতিতে যাতে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না হয়”। আমার এসব কথা শুনে অনেকে কৌতুক করে বলতো-‘নয় মন তেল ও জুটবেনা, রাধাও কোন দিন নাচবেনা’।

ইতিমধ্যে ভারত উপমহাদেশের সচ্ছ পানি অনেক অনেক ঘোলাটে হয়েছে। দ্বিতীয় মহা-সমর, সম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ভারত বিভাগ, রাজনৈতিক গগণে অনেক ওলট পালট সৃষ্টি হয়েছে। পার্টিতে অনেক রূপান্তর ঘটেছে। অনন্ত সিংহ, গনেশ ঘোষ; অম্বিকা চক্রবর্তী, কল্পতরু সেন, রণধীর দাস গুপ্ত, বঙ্কিম সেন, সুখেন্দু দস্তিদার (বড়), জ্যোতির্ময় দত্ত, যশোদা, মোক্ষদা ও প্রিয়দা চক্রবর্তী, রত্নেশ্বর শীল, ডাক্তার সুধীর কর, ডাক্তার অনিল রায়, সুবোধ রায়, এ্যাডভোকেট চিত্ত প্রিয় দাশ, জ্যোতিঃ দিদি, কল্পনা দত্ত, আমিয়া সেন, ব্রজেন ও প্রভাদাস, সুশীল দে, বিমল দে, রোহিনী তালুকদার, ব্রজেন ও স্বর্ণ প্রভা চৌধুরী, এ্যাডভোকেট সুচারু সেন, ইত্যাদি চট্টগ্রাম জেলার ১০৭ জন প্রথম সারির পার্টি নেতা ও পেশাদার কর্মীর বেশীর ভাগ পশ্চিম বঙ্গে চলে গেছে। বেশ কয়েক জন জেলে আবদ্ধ; অল্প কয়েকজন হতাশাগ্রস্থ হয়ে বসে পড়েছে।

১৯৪০ এর দশকের শেষ দিকে এবং ৫০ এর প্রথম দিকের সেই জম জমাট পরিবেশে অনেক যুবতীর চোখে আমি নানান দিক দিয়ে লোভনীয় সুপুরুষ ছিলাম। বিশেষ করে বিকাশ মুখি বলিষ্ঠ পার্টি সংগঠক হিসাবে। কিন্তু দুইটি বিষয়ে আমার ঘাটতি ছিল নিদারুন। (এক) প্রায় চাল চুলাহীন আমার ব্যক্তিগত পারিবারিক অর্থনৈতিক অবস্থা। (দুই) একাডেমিক অর্থাৎ স্কুলে কলেজে পড়া পদবীর শুন্যতা। এই দুইটার প্রথমটার থেকে জন্ম নিয়েছিল নতুন করে সংসার পাতার বিষয়ে আমার এক মাত্র শর্ত—"যার যার দায়িত্ব তার তার।" এ সবের কারণে–অনেকেই আমার আশে পাশে ঘুড় ঘুড় করেও শেষ পর্যন্ত পিছটান দিয়েছে। সাহস করে কেহই এগোতে পারেনি। এই বিষয়ে আমি কোন দিন তাদের দোষারোপ করিনি। বরঞ্চ তাদের বৈষয়িক বিচার বিশ্লেষণের জন্য প্রসংসা করেছি। আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছি। উপরন্ত সবচেয়ে বড় বিচার্য বিষয় ছিল আমার মন ও হৃদয়কে জয় করতে পারে এমন একটিও হৃদয় তখনকার দিনে চোখে পরেনি বলে--সব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রস্তাবই আমি সচেতনভাবে প্রত্যাখ্যান করে এসেছি।

এবার গ্রামে গিয়ে প্রথমেই একটি সংবেদনশীল হৃদয়ের স্পর্শ পেলাম। মেয়েটির নাম, 'অসিমা।' আমি তাকে "সীমা" নামেই ডাকতাম, স্নেহ করতাম। আদর করে খাওয়াতাম। মেয়েটির তেমন কোন রূপ ছিলনা। হ্যাংলা ছিপ ছিপে লম্বা গড়ন, সাওতালদের ন্যায় তেল তেলে কালো না হলেও–তার নিকটতম প্রতিবেশী। চেপ্টা বোচা নাক. খস্ খসে ত্বক। অন্তর ছিল বিপরীত শীতল ও মসৃন, যেন বট এর ছায়া. ঝরণার জল, শীতে উষ্ণ গরমে শীতল। প্রাচীন প্রবাদঃ কাল নারী বট এর ছায়া. ঝরণার জল. শীতে উষ্ণ গরমে শীতল। রশিক জনে বলে কাল নারী শীতে জীবন্ত কম্বল গরমে পাটি শীতল। বয়ষ ১৫/১৬, শিক্ষা অষ্টম শ্রণী পর্যন্ত। গরীব মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে, তিন ভাই দুই বোন. বড় বোন নানা কারণে "অধবা"। তিন ভাই এর এক ভাই চরম বৈষয়িক' মেজো কলির শ্রী কৃষ্ণকে হার মানায়। সোজা...সর্ব দিকে ত্যাগ তিতিক্ষার জীবন্ত প্রতীক। মেয়েটির গৌরবের ছিল তার অজানুলম্বিত ঘন কৃষ্ণ চিক্কন কেশধাম. সুললিত কন্ঠস্বর. মৃদুভাষী. মিষ্টি হাসি খুশি দৃষ্টি,–আর

ছিল কষ্ট সহিষ্ণুতায় গড়া দৈহিক গঠন। সর্ব পরিবেশে হাসি মুখে বরণ করে নেওয়ায় অসাধারণ ক্ষমতা।

একদিন মেয়েটি মনের দৃঢ়তা নিয়ে সাহস করে একটি আবদার করল "সুবোধদা আমি আবার লিখাপড়া শুরু করতে চাই। আমাকে দয়া করে সেই সুযোগটা করে দিন। আমি চিরদিন পার্টির নিকট কৃতজ্ঞ থাকব।" সেদিন আমি গ্রামের দায়িত্ব শেষ করে শহরে ফিরে আসতেছিলাম। উত্তরে সীমাকে আদর করে বললাম "শহরে গিয়ে সাধ্যমত চেষ্টা করব"।

শহরে এসে পার্টির একজন দরদী এক ব্যবসায়ী বন্ধুর নিকট প্রস্তাবটি উত্থাপন করলে তিনি সাগ্রহে প্রস্তাবটি মেনে নিলেন এবং তাঁহার বাসাতে রেখে সীমাকে পড়ার সুযোগ করে দিলেন, সীমাও "নন্দন কানন বালিকা বিদ্যালয়ে" অষ্টম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হয়ে লিখা পড়ায় মনোযোগ দিল। মাঝে মধ্যে গিয়ে সীমার খোজ খবর নিতাম।

সেই ব্যবসায়ী বন্ধুটি মাস ছয় পর সীমার সেজোভাইকেও একটা চাকুরী জুটিয়ে দিলেন এবং নিজের বাসাতে নিজের ছেলেমেদেরকে প্রাইভেট পড়ানোর বিনিময়ে লজিং দিয়ে রাখলেন। এর ফলে ঐ পরিবারটির (সীমাদের) একদিকে আর্থিক দুর্গতির লাঘব হল, অপর দিকে ভাই বোন একই বাসাতে থাকতে পারায় সীমার-লিখাপড়া চালিয়ে যাবার পরিবেশ আরও অনুকূলে এল।

এর পর সীমার সেজোভাই এর পরিচিতির পরিধী আরও বেড়ে যায় পার্টির কাজেও সেছিল নিরলস কর্মী। দুই বছরের মধ্যে তারা অনেকটা আত্মনির্ভরশীল হয়ে দাঁড়ায়।

১৯৫৮ সালে আইয়ুবী মার্শাল 'ল ঘোষণার আগ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে পার্টির অবস্থা বিকাশমুখী। বিশেষত চট্টগ্রামে পার্টি ও ভাসানী ন্যাপের অবস্থা আরও ভাল। পশ্চিম পাকিস্তানের বাম বুর্জোয়ারা এসে মওলানা ভাসানীর সাথে হাত মিলিয়েছে পাঞ্জাবের মিঞা ইফতিকার উদ্দীন, সীমান্তের আবদুল গফফার খান, বেলুচিস্তানের আচক যাই ও আরো অনেকে ১৯৫৯ সালে পাকিস্তানের উভয় অংশে প্রতিশ্রুত সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে পূর্ব ও পশ্চিম পাক এসেম্বিলিতে এবং কেন্দ্রে

মওলানা ভাষানীর ন্যাপই সংখ্যা গরিষ্টতা অর্জন করবে সর্বমহল কর্তৃক ইহা অনুমিত। এই নির্বাচন ও বাম পন্থীদের জয়কে প্রতিহত করার জন্য মার্কিন প্ররোচনায় এল–আইয়ুবী সামরিক শাসন।

আবার শুরু হল ধরপাকড়। গ্রেপ্তার, অনেক নতুন নতুন কর্মী এল গোপনে। পার্টির গোপন ক্রিয়া কর্ম পুনঃ প্রাধান্যে এল। এই পরিবেশে কিছু দিন সীমাদের বাসায় আস্তানা পাততে হল। সেই সুবাদে সীমার সাথে আরও ঘনিষ্ট হওয়ার বা সীমার জন্য আমার সান্নিধ্য পাবার সুযোগ হয়।

দেখতে দেখতে আরও দুই তিন বছর পার হয়ে গেল। এর কোন এক বিশেষ অন্তরঙ্গ পরিবেশে একাকী আমায় পেয়ে–সীমা নামে মেয়েটি এক দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত নিয়ে আমার নিকট নিঃসংকোচে প্রস্তাব করে বসল–"শুনুন সুবোধদা আজ থেকে আপনাকে আর আমি আপনি বলব না, বলব 'তুমি। কেমন রাজী?' আমি বললাম তা তোর যদি ইচ্ছে হয়–তাই বলিস। এই কথা বলার সাথে সাথে সে অত্যন্ত খুশি হয়ে শিশু সুলভ চপলতায় আমার—পদধূলি নিয়ে মাথায় ঠেকাল। তার—পর আমায় জড়িয়ে ধরে সোহাগ ভরে জানাল এবার তোমাকে বিয়ে করতে হবে। পাত্রী আমি ঠিক করে রেখেছি। কি বল রাজী! এর উত্তরে আমি বললাম—এতে করে তোর সুবিধা কি? তোর এত গরজ কেন? উত্তরে সে বলল–এতে করে আমার সুবিধা হবে–তুমি বিয়ে করলে আমি তোমার বাসার রান্না বান্নার কাজ করে লিখা পড়া চালিয়ে যেতে পারব নির্ভাবনায়।

এভাবে নানান কথার ছলে, অনেক কলা কৌশল করে সে দিন সীমা আমার নিকট থেকে পরোক্ষ অনুমোদন আদায় করে নিয়েছিল যা আমি সে দিন টের পাইনি, পেয়েছিলাম অনেক পরে। তার পর সে নিজ উদ্দোগে প্রথমে তার বৃদ্ধ বৃদ্ধা পিতা মাতা এবং সেজো ভাইকে এই বিষয়ে রাজি করিয়ে অনেকটা আট ঘাঠ বাঁধতে শুরু করে দেয়। অতপর বিষয়টি নিয়ে একদিন জেলা পার্টি কমিটিতে আলোচনা হল। সকলে মিলে দীর্ঘক্ষণ ধরে চিন্তাবিত আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হল–এর ফলে আমার "রাজনৈতিক জীবনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনাই

বেশী।" অতএব, চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত আপনি নিজেই গ্রহণ করুন। অবশ্য যে কোন কমরেডের বিয়ে সংক্রান্ত বিষয়ে তৎকালে এইভাবে অভিমত প্রকাশ করাই ছিল পার্টির রেওয়াজ। অতপর, সীমার সাথে এক দিন দীর্ঘ সময় ধরে আলাপ করে তাকে বুঝিয়ে বলা হল, এই যে বিয়ের পরণতির ভাল ও মন্দের দিক। উত্তরে সে একটি কথাই প্রথমে বলল– আমিতো তোমার রাজনীতির পথে প্রতিবন্ধক হব না, বরঞ্চ সহায়ক হতে চেষ্টা করব। উপরন্তু আমিতঃ তোমার দেওয়া একমাত্র শর্তে রাজী আছি 'যার যার পার্থিব দায়িত্ব তার তার' এ বিষয়ে আমি কোন দিন তোমার গলগ্রহ হবনা।

যখন তাকে বুঝিয়ে বললাম তুমি বয়সে আমার অনেক ছোট, প্রায় অর্দ্ধেক, উপরন্তু তুমি এখনও ম্যাট্রিক ও পাশ করতে পারনি। কি ভাবে তুমি আত্ম নির্ভরশীল হবে? উত্তরে সে যা বললো–তা সত্যিই প্রশংসনীয়। যেমন—সে চা বাগানে, বিড়ি ফ্যাক্টরীতে কিংবা দর্জির বা ছাপাখানায় কম্পোজিটরের কাজ করে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে। শেষ পর্য্যন্ত যদি কিছুই না জোটে তবে তোমাদের পার্টি কমিউনে রন্ধন শালায়) বাবুর্চ্চির কাজও করতে পারব। এই বলে সে পুনঃ বলল "তোমার পায়ে ধরি সুবোধদা তুমি দ্বিমত করো না, করোনা আমায় প্রত্যাখান। তাহলে আমার পক্ষে বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়ে দাড়াবে।" এ সময়ে সীমার চোখ দুটি ছল ছল করছিল, শরীরের পশমগুলি খাড়া হয়ে সারাদেহে একটা কাপুনী দিয়ে জ্বর এসে গেল। খুব ধীরে ধীরে সে বিছানায় এলিয়ে পড়ল। চোখ দুটি গেল বুজে, এই অবস্থায় তাকে ভাল করে বিছনায় শুইয়ে দিয়ে মাথায় কিছুক্ষণ বাতাস করলাম।

অতপর সীমার মাকে ডেকে বলে এলাম, "মনে হচ্ছে সীমার শরীরটি ভাল যাচ্ছে না, গায়ে জ্বর এসেছে। এখন একটু ঘুমাচ্ছে। ঘুমালে বোধ হয় আরাম বোধ করবে। যতক্ষণ খুশী ঘুমাতে দিন, জাগাবেন না। আমি কাল এসে খবর নেব।"

পরের দিন দিনের বেলা কতেক জরুরী কাজের চাপে পড়ে সীমাদের বাসায় যাওয়া সম্ভবপর হয়ে উঠেনি। আমার দেওয়া নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম করে যাওয়ায় সীমার মেজো ভাই পার্টি কেন্দ্রে এসে আমায়

খবর দিয়ে গেল—আমি যেন অবশ্য অবশ্য আজকের মধ্যে তাদের বাসায় যাই।

খবর পেয়ে সন্ধ্যায় সীমাদের বাসায় উপস্থিত হয়ে যা দেখলাম তাতে করে আমার আক্কেল-জ্ঞান গুম্ হয়ে যাবার উপক্রম।

গত চব্বিশ ঘণ্টার ধকলে সীমা প্রায় রক্ত শূন্য হয়ে পড়েছে। নিজ পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। কন্ঠস্বর ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আস্‌ছে। খাদ্য গ্রহণ এমন কি জল পর্যন্ত সে বর্জন করেছে। শরীর ক্রমে অবশের দিকে ধাবিত। আমাকে দেখে সে কেবল তার হরিণাক্ষী দুটি চোখে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল পলকহীন দৃষ্টিতে। কথা বলার ক্ষমতা তার তখন ছিল না। এই অবস্থায় কিংকর্তব্য বিমূঢ় না হয়ে সহসা দ্বিচক্র যানে চলে গেলাম লাল দিঘির পাড়ে পপুলার ফার্মেসীতে। সেখানে বসেন ডাঃ অজিত চৌধুরী ও কালিপদ পালিত। অজিতকে পাওয়া গেল না, সে আমার সম বয়সী এবং অন্তরঙ্গ, তার নিকট সব কিছু খোলাখুলি বলা যেত। ডাক্তার পালিত পার্টি কর্মী ও কম বয়সী। সদ্য পাশ করা ছাত্র, তার নিকট সব কিছু বলা যায় না। তাকে রুগীর কথা বলার সাথে সাথে তিনি রওনা হলেন। এসে ভাল করে রুগীকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখে আমায় নিরালায় ডেকে নিয়ে বললেন :- “ভয়ের কোন কারণ নেই, তবে এ রোগের এলোপ্যাথী কোন ঔষধ নেই। অসুখটা মানসিক। হঠাৎ কোন মানসিক আঘাৎ থেকে এর জন্ম। বয়স দেখে মনে হচ্ছে কোন পুরুষ বন্ধু থেকে এই মানসিক আঘাতটা এসেছে। আপনি খোঁজ খবর নিয়ে সেই লোকটির সন্ধান করুন এবং তাকে দিয়ে রোগ মুক্তির ব্যবস্থা করুন। অর্থাৎ যাহার দংশনে রুগী মৃত্যু শয্যায় শায়িত তাকে দিয়েই সে বিষ উৎখোলন করাতে হবে। আপাততঃ আমি ২/১টি ঔষধ লিখে দিয়ে যাচ্ছি তা ব্যবহার করলেই চলবে। এই বলে ডাক্তার কালিপদ পালিত বিদায় নিলেন। তিনি বিন্দু মাত্রও ধারণা করতে পারলেন না যে এ দুর্ঘটনার বা অপকর্মের জন্য আমি নিজেই দায়ী।

ডাক্তারত ঔষধ নির্দ্দেশ করে চলে গেলেন, সমস্যায় পরলাম আমি। এবার সত্যিকার অর্থে গোলক ধাঁধাঁয় পরে গেলাম। অনেকক্ষণ কিংকর্তব্য বিমূঢ় অবস্থায় থাকতে হল। অবশেষে মনস্থির করে নিলাম

আগেত সীমাকে বাঁচিয়ে সুস্থ করে তুলি। এই মুহূর্তে ইহাই প্রধান করণীয়। নতুবা সে চিরতরে পঙ্গু হয়ে যাবে। তখন সমস্যা আরও প্রকট ও জটিল হয়ে দেখা দেবে। জীবনের সমস্ত লক্ষ্য, কর্মসূচী জট পাকিয়ে ঘুরপাক খেয়ে অতল জলে তলিয়ে যাবে।

সে দিন নিজ ডেরায় ফিরে না এসে সীমাদের বাসায় রয়ে গেলাম। নিজ হাতে ঔষধ-পথ্য খাওয়ালাম। ধীরে সুস্থে গল্প গুজবের মধ্যে দিয়ে পরিবেশটাকে হাল্কা করে নিয়ে এক পর্যায়ে সীমাকে স্নেহ সোহাগে মাতিয়ে তুলে কানে কানে বললাম সীমা আমি আমার 'অপরাগতার' কথা প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। তুমি আর কোন দুশ্চিন্তা করো না। এতে করে যত কস্ট ও অসুবিধাই হউক না কেন তার মোকাবিলা করার মত মনের জোর আমার আছে। আজ থেকে সেই প্রস্তুতিই চলবে! এই বলে তার কপালে প্রথম বারের ন্যায় একটি আদরের চুম্বন এঁকে দিলাম। সাথে সাথেই অনুভব করলাম সীমার সারা অঙ্গে রক্ত কনিকার তাণ্ডব নৃত্য। চোখ বুঝে সে সেই অন্তর নৃত্য উপভোগ করছে আর ঘন ঘন আমার চোখের দিকে তাকিয়ে দেখছে। যেমন করে কচি শিশুরা চেয়ে দেখে কোলে নিতে উদ্যত আহবানকারীর মুখের দিকে।

এরপর সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে সীমার দীর্ঘ তিন চার মাস সময় লাগল। হাওয়া পরিবর্তনের জন্য তাকে নিয়ে সেই তিন চার মাস গ্রামের বাড়ীতে, বাটালী হিলের চুড়ায়, কুমিরার সমুদ্রতীরে, কর্ণফুলীর মোহনায় নৌ-ভ্রমণে গেলাম। ক্রমে ধীরে অতি ধীরে সীমার কুমারী জীবনের পূত পবিত্র অন্তরে যে বিষ ক্রিয়া ছড়িয়ে পরেছিল তা অপসারিত হয়ে পুনঃ সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। অতীত কালে মানব ইতিহাসের মধ্যযুগে এই চিকিৎসাকেই বলা হত, মন্ত্র শক্তি বা যাদু টোনা' পানি পড়া ও তাবিজ-কবজ। যে সাপে দংশিবে সেই সাপকে দিয়েই বিষ প্রত্যাহার করাইতে হবে। আধুনিক কালে যাকে বলে মনোস্তাত্বিক চিকিৎসা। সাইকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট।

এর পরের ঘটনা অতিব সংক্ষিপ্ত। আমি এখনও সেই বিচারে নিঃসঙ্গ। আর শ্রীমতি সীমাদেবী অন্যের ঘরের ঘরণী ও কয়েক সন্তানের জননী। ইহাই এই নাটকের শেষ দৃশ্যপটের ছবি তথা ঘটনার শেষ পরিণতি। ঘটনাই ইতিহাস এবং ইতিহাসই জীবনের প্রতিবিম্ব-প্রতিচ্ছবি।

বাঘের ঘরে ঘুঘু

তখন সারা পূর্ব পাকিস্তানের উপর জগদল পাথরের ন্যায় চেপে আছে আইয়ুবী সামরিক শাসন। শুধু জনগণ নয়, সরকারী আমলা পর্য্যন্ত শ্বাসরুদ্ধ পরিবেশে রয়েছে। কাজের সুনির্দিষ্ট অগ্রগতি দেখাতে না পারলে অনেকের পদ-অবনতি ঘটছে।

সেই সময় চট্টগ্রামের গোয়েন্দা বিভাগের কর্তা ব্যক্তি (ডি, আই, ও ১নং) নোয়াখালী জিলার ফেনী মহকুমার এক ভদ্রলোক, তাহার নাম জানার কোন দিন প্রয়োজন মনে করিনি। তিনি ছিলেন আমাদের শ্রমিক ফ্রন্টের এক বিশিষ্ট কর্মী, আই-সি-আই-অফিসে কর্মরত কমঃ বাহার উদ্দীন তথা জিয়াউদ্দীনের বড় ভাই।

দুই ভাই এর মধ্যে ছিল বেশ মিল মহববত। বড় ভাই এর অর্দ্ধাঙ্গিনী (স্ত্রী) সাহেবাও দেবর প্রবরকে ছোট ভাইএর ন্যায় অত্যন্ত স্নেহ করতেন। কমঃ বাহার থাকতেন আগ্রাবাদ ডেভার পাড়ের এক মেস বাড়ীতে, এবং বড় ভাই থাকতেন দাম পাড়া পুলিশ লাইনে সরকারী বাসভবনে।

মাঝে মধ্যে পালপর্বনে বাহার যেতেন বড় ভাইএর বাসায়। এক দিন কথা প্রসঙ্গে বড় ভাই বললেন, তোমার প্রসিদ্ধ নানা দেবেন সিকদারত আমাদের সকলের চাকরী খতম করে দিচ্ছে। বাহার ভাই আশ্চর্য্য হয়ে জানতে চাইলেন? তিনি করেন শ্রমিক আন্দোলন—কমিউষ্টি পার্টি, থাকেন আণ্ডার গ্রাউণ্ডে (আত্মগোপনে) তিনি কি করে তোমাদের চাকরী খাবেন?

উত্তরে বড় ভাই-ডি-আই-ও-ওয়ান বললেন খেতে পারে হে'-খেতে পারে? তাঁহার সেই ক্ষমতা রয়েছে? তাইতো তাঁহাকে দীর্ঘ এক যুগ ধরে গ্রেপ্তার করতে না পারাতে (আইয়ুবের শেষ সার্কুলার অনুসারে) আমাদের ডিপার্টমেন্টের সকলের চাকুরীতে পদ অবনতি হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। এই কথা বলে তিনি ছোট ভাই-এর সাহায্য কামনা করলেন। ছোট ভাই (বাহার) অত্যন্ত ন্যায় নিষ্ঠ সৎ প্রকৃতির লোক ছিলেন। বড় ভাই-এর এই প্রস্তাবে একটু রাগান্বিত হয়ে বললেন 'তুমি

আমায় পার্টির আদর্শের প্রতি বেঈমানী করার জন্য প্ররোচিত করার চেষ্টা করছো? কই, আমিত তোমাকে কোন দিন সরকারী গোপন তথ্য (খবর) সরবরাহের আহবান জানাইনি'।

এবার রাগান্বিত আবেগ প্রবন ছোট ভাইকে শান্ত করার জন্য পুলিশ সাহেব বললেন যাক যাক তোকে কিছু করতে হবে না। আমাদের চাকুরী আমারাই রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছি।

অর্থাৎ দেবেন সিকাদারকে মৃত বলে ঘোষণা দিয়ে তার সর্ম্পকে দুইটা ফাইল রক্ষা করতে হবে। একটা ফাইলে জমা হবে জীবিত দেবেন সিকদারের রিপোর্ট। অপর ফাইলটি থাকবে সরকারী ভাবে বাক্স বন্দী।

এভাবে কথার ফাঁকে ফাঁকে পুলিশের কিছু গোপন কথা আমরা ক্রমঃ বাহার মারফত পেতাম। খবর কিছু পাওয়া যেত তাহার ভাবীর মারফত। ভাবী ও দেবরের মধ্যে হাসি ঠাট্টা গল্পের ছলে। আবার বাহারের বড় ভাই ও কথোপকথনের আঁড়ালে খবর বের করে নিতে চেষ্টা চালাতেন। তারা উভয়ে-এ বিষয়ে ছিল দারুন সেয়ানা তথা চালাক চতুর।

বাস্তবে পাকিস্তান আমলে বিশেষ করে আইয়ুবী শাসনামলে চট্টগ্রামের গোয়েন্দা বিভাগ দেবেন সিকদারকে নিয়ে মহা ফ্যাসাদে পড়েছিলেন। বছরের পর বছর ধরে না পারছে তাহাকে ধরতে, না পারছে তাহার কাজের অগ্রগতি রোধ করতে।

এই জন্য একবার ঘোষণা দিয়েছিল (গোপনে ও জনে জনে) দেবেন সিকদারকে জীবিত ও মৃত অবস্থায় কেহ ধরিয়ে দিতে পারলে দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। এতে হয়েছে হিতে বিপরীত। জনগণের মধ্যে দেবেন সিকদারের গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়, যশ ও খ্যাতি বিস্তার লাভ করে।

আসলে বিষয়টিও নেহায়েৎ ফেলনা নয়. ছোট হতে বড় সকল গোপন নেতাই ধরা পড়ল আগে পরে, আর এই ক্ষুদে নেতাকে কেহ ধরতে পারল না।

আই, বি; ডি, এস, বি'র সমস্ত লোক হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রত্যেকেই যার যার উপরস্তদের নিকট হতে কটু বাক্যের কষাঘাত পাচ্ছে, লজ্জায়

মাথা নত হওয়ার উপক্রম, প্রমোশন সকলের বন্ধ। অথচ প্রতিদিনই সকাল বিকাল নীচের দিক থেকে রিপোর্ট আসছে—দেবেন সিকদার সকাল থেকে রাত দশটা, কোন কোন দিন সারাদিন রাত, মিল—কারখানায় কিংবা সারা শহরে সর্বত্র মিটিং করে বেড়াচ্ছে। সর্ব সময়েই খবরের আভাস তারা পায় ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর। চিড়িয়া তখন উড়ে চলে গেছে অনেক দূরে—নাগালের বাইরে। অবশ্য পাকিস্তান আমলের শেষ দিকে আমার কাজের পরিধি ছিল অনেক অনেক বিস্তৃত এবং পরিমাণ ছিল অনেক বেশী। চট্টগ্রাম থেকে রংপুর-সৈয়দপুর-পার্বতীপুর রেলওয়ে ওয়ার্কসপ, ঢাকা, আখাউড়া-লাকসাম কুমিল্লা এবং নোয়াখালী জিলা সর্বত্র।

মাস দুই মাস পর জেলা কমিটির বৈঠকে যখন প্রত্যেক জেলা কমিটির সদস্যের কাজের রিপোর্ট হত, হত পর্যালোচনা, তখম আমি নিজে অত্যন্ত বিব্রত বোধ করতাম। কারণ অন্য ৭/৮ জন জেলা কমিটির সদস্যের সর্ব মোট কাজের তুলনায় আমার কাজের পরিমাণ ও পরিধি সব সময় বেশী দেখা যেত। জিলা সম্পাদক হিসেবে সকলের কাজের মূল্যায়নের সাথে নিজের কাজের মূল্যায়ন করতে হতো নিজেকে।

এই ভাবে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর 'আত্ম প্রসস্থি' বয়ান করা আমার খুবই খারাপ লাগত। এবং কষ্ট দায়ক কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অনেক সময় বড় কাজকে ছোট করে শিরোনাম দিয়ে উল্লেখ করতাম। মাঝে মধ্যে ত্রিশঙ্কু রাজার কাহিনী মনে পড়তো। যিনি অমৃত ধামে স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন উত্তরে নিজের আত্ম কাহিনী প্রকাশ করতে গিয়ে পুনঃ স্বর্গ হতে চ্যুত বা পতিত হয়েছিলেন। আবার শিব ঠাকুরের বেখেয়ালী ক্রোধজনিত বাক্য ধ্বনীর (তিষ্ঠো) বেড়াজালে পড়ে স্বর্গ ও মর্ত্যের মাঝখানে (শূন্যে) অবস্থান করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

এমন এক জটিল অথচ তা ছিল বিপ্লবের স্বপক্ষে কর্মকাণ্ডের জোয়ারের সময় একদিন কমঃ বাহারের তথা জিয়াউদ্দিনের মাসিক লেভি (চাঁদা) আনতে গিয়ে খবর পেলাম বাহার ভাই সাংঘাতিকভাবে অসুস্থ। নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে বড় ভাই-এর বাসায় অবস্থান করছে।

অসুখের খবর পেয়ে বড় ভাই ও ভাবী সাহেবা এসে নিয়ে গিয়েছে। অসুখ গুরুতর। তদুপরি তার সাথে একটা গুরুত্বপূর্ণ আলাপ ছিল। অতএব, তাঁহাকে দেখার জন্য তখনই সাইকেল চেপে দামপাড়া পুলিশ লাইনের দিকে রওয়ানা হলাম।

আমার গোপন জীবনে সব চেয়ে সুবিধাজনক দিক হল আমার কোন ছবি পুলিশের নিকট ছিল না। যেখানে যে কয়টা ফটো আমার ছিল সব কয়টা আমি সংগ্রহ করে নষ্ট করে ফেলেছি। যার জন্য আজ আমার মৃত স্ত্রীর ছবিও হারিয়ে রিক্ত হয়ে বসেছি।

বেলা তখন দুপুর বারটা। গোয়েন্দা বিভাগের বড় কর্তার বাসা খুঁজে নিতে দেরী হলনা। বাসাটি একটি ত্রিতল দালানের নীচের তলায়। বাসায় পৌছে দেখি বাহার ভাই সে দিন ভাত পথ্য খেয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। জ্বর থেমেছে ২ দিন হল। আমাকে দেখে প্রথমে আশ্চর্য্যন্বিত হয়ে "নানা" শব্দ অর্দ্ধেক উচ্চারণ করে জিবে কামড় দিয়ে থেমে যায়। বিছানার সামনে একটা হেলান চেয়ারে বসতে ইঙ্গিত করে মৃদু স্বরে জানাল "কেন মিছি মিছি এই বিপদজনক জায়গায় এলেন। আমিতঃ সুস্থ হয়ে গেছি। ২/৪ দিন পরেই অফিসে ও মেসে ফিরে যেতাম।"

আমার সাথে কথা বলতে শুনে পার্শ্বের কামরা হতে ভাবি সাহেবা জিজ্ঞেস করলেন বাহার ভাই কার সাথে কথা বলছো? উত্তরে বাহার জানাল আমাদেরই অফিসের এক মুরব্বীর সাথে। আমার অসুখের খবর পেয়ে আমাকে দেখতে এসেছে। উত্তরে ভাবী সাহেবা জানতে চাইল সোজা অফিস থেকে আসছেন? না বাসা থেকে। বাহার জানাল অফিস থেকে। তার কিছুক্ষণ পর ভিতর থেকে এল এক কাপ দুধ ও বোম্বে টোষ্ট। বাহার খুশি হয়ে ভাবীকে জানাল অসংখ্য ধন্যবাদ। এই কথা শুনে ভাবী সাহেবা মিষ্টি শাসনের সুরে বলল আমার বাসায় যে মেহমান এসেছে, তাকে নাস্তা পানি দেওয়াতে তোমার ধন্যবাদের প্রয়োজন নেই। এতে করে বুঝা গেল ভাবী দেবরের মধ্যে সম্পর্কটা জৈষ্ঠ মধুর ন্যায়।

এর কয়েক মিনিট পর খাওয়া শেষ করে একটা বক সিগারেটে আগুন লাগিয়ে যেই মাত্র প্রথম টান মেরেছি এমন সময় বাহারের বড় ভাই

দুপুরের খানা খেতে মোটর সাইকেলে চেপে ফট ফট শব্দ ক'রে বাসায় আসলেন। সাইকেলের ষ্টার্ট বন্ধ করতে করতে বাইর থেকেই—তিনি জানতে চাইলেন আরে বাহার কেমন আছিস? উত্তরে বাহার ভাই একটু বিচলিত হয়ে জবাব দিলেন ভালই আছি।

পুলিশের কর্তা যেখানে সাইকেল রাখলেন, সেই বরাবর একটা কাঁচের জানালা আছে। তবে আমার সৌভাগ্য বলা চলে-সেটা ছিল বেশ উচুতে। ঐ জানালা দিয়ে কেবল মাত্র আমার মাথাটা বাইরে থেকে দেখতে পাওয়া যায়। তাই দেখে তিনি প্রশ্ন করলেন মেহেমান কেরে বাহার? বাহার চট পট উত্তর দিলেন আমার অফিসের এক কলিগ। (সহকর্মী)। উত্তরে সন্তুষ্ট হয়ে তিনি আর কোন কথা না বলে পার্শ্বের ঘরের দরজা দিয়ে ভিতরে চলে গেলেন।

এই ফাঁকে আমি কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ঘর থেকে বের হয়ে সাইকেলে চেপে চম্পট দিয়ে চলে এলাম।

খাওয়া দাওয়া সেরে পুলিশ সাহেব আসলেন বাহারের কামরায়। ইতিমধ্যে খবর পেয়েছেন—বেগম সাহেবা যথাযথ অতিথি পরায়নতা দেখিয়েছেন। ইহা তাঁহার একটি বিশেষ গুন। এই গুনটির জন্য তিনি স্বামীর বিশেষ আদরণীয়া হয়ে আছেন।

বাহারের ঘরে এসে তিনি মেহেমানকে দেখতে না পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন-কোথায় গেল তোর মেহেমান? উত্তরে বাহার বললেন তিনি চলে গেছেন। তুমি না এলে হয়তঃ আরও কিছুক্ষণ থাকতেন। বড় ভাই আশ্চর্য্য হয়ে ছোট ভাই-এর দিকে এক নজর তাকালেন—তার মানে? বাহার বলল মানে খুবই সহজ। তোমরা দুই জনের অর্থাৎ তিনি আর তুমি সামনা সামনি সাক্ষাৎ এর এখনও সময় হয়নি। তাই তিনি চলে গেছেন। বিশেষ করে তোমাদের (পুলিশ গোষ্টির) নিকট তিনি তার চেহারাটা দেখাতে এখন রাজি নয়।

এতক্ষনে গোয়েন্দা কর্তা বুঝতে পারলেন মেহেমানটি আর কেহ নহে—স্বয়ং দেবেন সিকদার। আফশোষ করে বললেন—"তখন যদি

ঐ দরজা দিয়ে ঘরে না ঢুকে এই দরজা দিয়ে ঢুকতাম তাহলে ভদ্র লোককে এক নজর দেখে ধন্য হতে পারতাম।"

তা' যাক–আমি ভাবছি তুই আমার সাথে রসিকতা করছিস। সত্যিই যদি তিনি আমার বাসায় এসে থাকেন, তাহলে আজ তোর নিকট আমি হার মেনে নিচ্ছি। এত বড় দুসাহস ও মনের হিম্মত যার রয়েছে, এমন দেশ প্রেমিক আত্মগোপনকারী বিপ্লবী নেতাকে পাকড়াও করা আমাদের ন্যায় বেতনভোগী গোয়েন্দাদের সাধ্যাতীত। এখন মনে হচ্ছে তিনি মোটেই আত্মগোপনে থাকেন না। তিনি থাকেন ও চলাফিরা করেন সম্পূর্ণ প্রকাশ্যে। সাধারণ জনগণের ন্যায়। কাজ কর্ম করেন আমাদের নাকের ডগায়। তিনি গোপন করেন স্থান বিশেষে কেবল মাত্র আত্মপরিচয়। ভদ্রলোককে আন্তরিক ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছি না। শুনরে বাহার, "তোদের নানাকে জানাইস আমার বহুত বহুত সালাম।" এই বলে তিনি ক্ষোভে দুঃখে ও আবেগে দ্রুতবেগে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

শাহী ঘেরাও

সর্বকালের (বৃটিশ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ) কমিউনিষ্ট নেতৃত্বে সংগঠিত সর্ববৃহৎ শ্রমিক সংগঠন, এক কালে জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশন এর সভাপতি কমরেড আবুল বাশার তখন নোয়াখালী জেলার রায়পুরা গ্রামে নজরবন্দী অবস্থায় অবস্থান করছেন। ইতিপূর্বে তিনি জেলে থাকা অবস্থায় তাঁর প্রথম স্ত্রী মৃত্যুবরণ করেন। বেশ কয়েকটি ষড়যন্ত্রমূলক মামলায় তিনি জড়িত। মাসের মধ্যে দুই একবার তাঁকে চট্টগ্রাম কোর্টে হাজির হতে হয়, তাঁর উপর সরকারী নির্দ্দেশ ছিল নোয়াখালী থেকে চট্টগ্রাম এসে প্রথমেই কোতোয়ালী থানায় দিতে হবে হাজিরা।

শাসক ও কারখানা মালিক গোষ্ঠির ভয়, তিনি চট্টগ্রামের শিল্পাঞ্চলে নজরবন্দী থাকলে পার্টি শ্রমিক আন্দোলন আরো জোরদার হয়ে উঠবে।

এভাবে কয়েক মিছিল মামলা চলার পর আর একদিন তাঁর জামিন বাতিল করে দিয়ে তাঁকে পুণঃ জেলে নিয়ে যাওয়া হল। এই অবস্থায় কি করা যায়? পার্টির জেলা কমিটি ও শ্রমিক নেতাদের সাথে ব্যাপক

আলোচনা হয়। ঐ সব সভায় তৎকালীন পার্টির জেলা সেক্রেটারী ও শ্রমিক ফ্রন্টের দায়িত্বে নিয়োজিত আমার মতামতই সকলে জানতে উৎসুক ছিল। কারণ ইতিমধ্যে শ্রমিক আন্দোলনে গতানুগতিক প্রক্রিয়া বাতিল ও বহু নতুন নতুন প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে আমি বেশ কয়েক ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। অনেক ক্ষেত্রে কিংবদন্তীর নায়ক বনে গেছি।

শাসক গোষ্ঠির ইদানিং কালের কার্য্যকলাপে আমার মধ্যে একটা ধারণা সৃষ্টি হয় যে গতানুগতিক আন্দোলনের পন্থায় কমঃ আবুল বাশার -কে জামিনে মুক্ত করা যাবে না। তার জন্য প্রয়োজন হবে বড় রকমের একটি আন্দোলন এবং সেই আন্দোলনের রণকৌশল হবে বৈচিত্রময়।

যদিও ঐ বৈচিত্রময় আন্দোলনের মাঝে একটা ক্ষতির দিকও রয়েছে। তা হচ্ছে বৈচিত্রময় আন্দোলনের ফলে ব্যাপক শ্রমিক ও জনতার মধ্যে কমঃ আবুল বাশারের পরিচিতি দ্রুত বৃদ্ধি পাবে। পরিণতিতে বৃদ্ধি পাবে যশ ও খ্যাতি। এবং পরিশেষে মোহ ও প্রভাব, যা তিনি যথাযথভাবে হজম (হৃদয়ঙ্গম) করতে না পারলে জন্ম নিতে বাধ্য তার মাঝে ভবিষ্যতে পদলোভ, আত্মমর্যাদাবোধ তথা অহমিকা–অহঙ্কার। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী ক্রিয়ায় এই সব না বোধক প্রক্রিয়া পরিণামে কমরেডটির বিকাশের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে।

তৎসত্বেও বাস্তব অবস্থার প্রয়োজনে একটি বৈচিত্রময় কর্মসূচী পেশ করা হল। তা হচ্ছে ঃ ১) মামলার তারিখের দিন চট্টগ্রাম কাচারী পাহাড়টিকে ঘেরাও করতে হবে। ২) কম করে হলেও ১০/১৫ হাজার সংগঠিত শ্রমিকের সমাবেশ ঘটাতে হবে। (৩) জামিনের আবেদন মনজুর না হওয়া পর্য্যন্ত জঙ্গী বিক্ষোভ প্রকাশ করতে হবে।

পাঠকগণ অনেকেই অবহিত নহেন যে চট্টগ্রাম কাচারী পাহাড়টি চট্টগ্রাম শহরের মধ্যেখানে অবস্থিত। যে পাহাড়ের চুড়ায় বিরাট বহু কামরা (প্রায় হাজার) বিশিষ্ট ত্রিতল দালান। আঁকা বাঁকা সর্পিল গতিতে পাহাড়ের গা বেয়ে পীচ্ ঢালা প্রশস্থ রাজপথ। যে পাহাড়ের (গোড়ায়) চতুর্দিকে অনুরূপ রাজপথ ও পাকা ফুটপাত। যার চক্রের বেড় হবে প্রায় দেড় মাইল।

আমাদের মিছিল এই পাহাড়ের চুড়ায় উঠে–সমস্ত দালানটাকে ঘেরাও করে রাখবে, যাতে কোন হাকিম, আইনজীবি, ও মক্কেল আসা যাওয়া করতে না পারে। ফলে আদালতের সমস্ত কাজ অচল হয়ে পরবে।

সিদ্ধান্ত ভিত্তিক গুরুত্ব সহকারে প্রস্তুতি শুরু হল। চারটি শিল্পাঞ্চলে গিয়ে গোপনে চারটি বড় কর্মী সভা ডেকে—সমস্ত কর্মীদের বুঝিয়ে উৎসাহিত করা হল।

আমাদের কর্মসূচী বাস্তবায়নের দিন সকাল নয় ঘটিকায় এই পথে আর একটি নতুন বাঁধা এসে পথ আগলে দাঁড়ালো। তা হচ্ছে পার্টির দুইজন দরদী আইনজীবি যথাক্রমে কমঃ পুর্ণেন্দু দস্তিদার ও ব্যারিষ্টার সলিমুল হক খান মিলকী। তাদের যুক্তি হল এই কাজটি করা হলে তা হবে আইনের দৃষ্টিতে কোর্টকে অমান্য করা। ইহার অর্থ অপ্রয়োজনে কারাবাস ডেকে আনা।

ঘটনার দিন আমি অবস্থান করছিলাম রেল ইউনিয়ন ও ক্লাব সংলগ্ন রেলওয়ে ইউনিয়নের অফিস সম্পাদক জনাব শফিকুর রহমানের বাসায়। যাতে করে জরুরী প্রয়োজনে কর্মীরা দ্রুত আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারে।

ঘটনা তাই ঘটল। ব্যারিষ্টার মিলকী ও দস্তিদার যখন বাঁধা সৃষ্টি করল তখন সমস্ত নেতৃস্থানীয় কর্মীরা আমার আস্তানায় এসে হাজির হল। তারা অনেকটা হতাশাগ্রস্থ। কিছুটা বিক্ষুব্ধও বটে।

আগত গুরুত্বপুর্ণ কর্মীদের নিকট হতে সব শুনলাম। শুনে তাদের মতামত চাইলাম। যা আমি সাধারণত করে থাকি। কোন বিষয়েই সিদ্ধান্ত আগে চাপিয়ে দেইনা। বরঞ্চ কর্মী ও জনতার নিকট থেকে শিখে তাদের শিখাই।

তাদের মতামত ছিল, তুমুল উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে একদিন প্রতীক ধর্মঘট করে সব কল কারখানার শ্রমিক কর্মচারীরা কাচারী পাহাড় ঘেরাও করতে আসছে। সকলের নিকট এই কর্মসূচীর মধ্যে একটা নতুনত্ব আছে। আছে অভিনবত্ব। কাজেই এই প্রোগ্রাম বাতিল করা হলে সবাইর মধ্যে সাময়িক হতাশা এসে যাবে।

অতএব চিন্তা করে দেখুন কি করা যায়। কেহ কেহ ঘেরাও অভিযান বাদ দিয়ে মিছিল ও মিটিং করার প্রস্তাব দিলেন।

এই অবস্থায় দীর্ঘক্ষণ আলোচনা পর্যালোচনা করার সময় নাই। ইতি-মধ্যে হয়ত কোন কোন মিছিল শহরের মধ্যে প্রবেশ করেছে। তাই তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত দিতে হল।

সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললাম কমরেডগণ, এই অবস্থায় পরীর পাহাড় (কাচারী পাহাড়) ঘেরাও কর্মসূচী বাতিল করা যায় না। তাহলে সমস্ত পরিকল্পনা টপসি-টারবে (ওলট-পালট) হয়ে যাবে, আবার আমাদের আইন-জীবি বন্ধুদেরও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অতএব, কাচারী পাহাড়ের উপরে গিয়ে কোর্ট ঘেরাও না করে গোটা পাহাড়টা নীচে ঘেরাও করা হউক। এতে করে কোর্টকেও অমান্য করা হবে না, আবার বাস্তবে কাচারী ঘেরাও হবে। কারণ এই ঘেরাও অভিযানেও কাচারীতে লোকের আসা যাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। অপর দিকে কয়েকটি রাস্তায় গাড়ী ঘোড়া লোক চলাচল বন্ধ হয়ে ট্রাফিক জাম হয়ে পরবে। এবং সাধারণ পথচারী উৎসুক্য হয়ে মিছিলের সাথে ঘুরবে। মিছিল দশগুণ বড় দেখাবে। অতএব, বন্ধুরা দ্রুত গিয়ে এই কর্মসূচী পালন করুন। এই প্রস্তাব শুনে সকলে উৎসাহিত হয়ে দ্রুত কাজে নামলেন।

সিদ্ধান্তটি দেওয়া হয়েছিল মূল পরিকল্পনার বিকল্প হিসেবে। কিন্তু তার শুভ পরিণতি যে আমাদের স্বপক্ষে এত আশাতীত ভাবে ক্রিয়া করবে ইহা ছিল সকলের ধারণার অতীত। মাত্র আধ ঘন্টার পর খবর এল অবস্থা গুরুতর *[১]। মিছিলে যোগদান করেছে প্রথমে কালুর ঘাট অঞ্চলের পাঁচ থেকে ছয় হাজার শ্রমিক, তারপর আমিন নাছিরাবাদের ৪/৫ হাজার, তারও পরে ডক বন্দরের ৫/৫২ হাজার, চতুর্থ বৃহৎ মিছিল পাহাড়-তলী রেল ওয়ার্কসপ সি, আর বি'র রেল কর্মচারীদের প্রায় ৬/৭ হাজার। স্মরণকালের ইতিহাসে সুসংঘঠিত শ্রমিকের সর্ববৃহৎ একটি সম্মিলিত ঐতিহাসিক মিছিল।

---

*[১] ইহা চট্টগ্রামী ভাষার ভাব। কোন জিনিষকে গুরুত্ব দিয়ে বুঝাতে গিয়ে—বিপরীত শব্দ প্রয়োগ করা হয়। যেমন কেহ নিমন্ত্রণ ভাল খাওয়ালে প্রশংসা করে বলা হয় শালায় যা খাওয়ালে...............

নীচের ফুটপাত ধরে চালিত হওয়ায় মিছিলের সাথে রাস্তার পথচারী শামিল হয়ে মিছিলের কলেবর হয়ে দাঁড়ায় বিরাটাকার। সাধারণের ধারণা লক্ষাধিক, রক্ষণশীল হিসেবে ৬০/৭০ হাজার। যত সময় অতিবাহিত হচ্ছে ততোই মিছিলের কলেবর কল্পনাতীতভাবে বৃদ্ধি লাভ করেছে। বার্তাবাহকের রিপোর্টকে বিশ্বাস যোগ্য মনে না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত ঘটনাটি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার জন্য সাইকেলে চেপে রওয়ানা হলাম। বেলা তখন এগারটার পর। মিছিলটির চারিদিকে প্রদক্ষিণ করা সম্ভব হলনা (ট্রাফিক জাম)। অবশেষে সাইকেল থেকে নেমে সাইকেলটি এক পরিচিত দোকানে রেখে পায়ে হেটে চারিদিক ঘুরে হাজারী লেইনের ফেডারেশন অফিসে এসে ঘাপটি মেরে বসে রইলাম। বিশেষ লোক মারফত খবরা খবর নিচ্ছিলাম।

অল্পক্ষণের মধ্যে সমস্ত শহরে খবরটি ছড়িয়ে পড়ল বিদ্যুৎ গতিতে। রোমাঞ্চকর কাহিনী আকারে। এই বিশাল মিছিলের প্রধান শ্লোগান ছিল কমঃ আবুল বাশারের মুক্তি চাই, জামিন চাই। পোষ্টার, ফেষ্টুন ও রক্ত পতাকায় মিছিল ছিল সুসজ্জিত।

মিছিলে শ্রমিক আর রাস্তার জনতা মিশে একাকার হয়ে কেবল ঘুরছে এবং লক্ষাধিক মানুষের একটি বজ্র ধ্বনী আকাশের বায়ু মণ্ডলের সাথে যুক্ত হয়ে জলন্ত আগ্নেয়গিরির লালা উদগীরণের মত ফোঁস ফোঁস করছে। প্রতিটি লোকের মুখে আনন্দ আর বিচিত্রময় ঘটনার উল্লাস ধ্বনী। এমন ঘটনা কোন একটি মানুষের কল্পনার বাইরের বিষয় বস্তু; মিছিলে অংশ গ্রহণকারী প্রতিটি মানুষ ভাবছে জীবনে একটি ইতিহাস সৃষ্টিকারী ঘটনার সাথে যুক্ত হতে পেরে নিজকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করছে। যারা বিপরীত ফুটপাতে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছে তাদের নয়ন তৃপ্ত হয়ে মিছিলকারীদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করছে সারা শহর ভেঙে পড়ছে পরীর পাহাড়ের চতুর্দিকে। প্রতিটি দোকান মালিক ও কর্মচারীরা পালা করে মিছিলের তামাশা দেখে যাচ্ছে। দুরন্ত কিশোর কিশোরী ও যুবতীদের এবং দুঃসাহসী মহিলাদের মিছিলের ঘটনা চুম্বকের ন্যায় আকর্ষণ করে টেনে নিয়ে এসেছে।

দর্শনার্থীরা কেহই হাটছেনা, বলা চলে দৌড়াচ্ছে। যদি কোন কারণে মিছিল বন্ধ বা শেষ হয়ে যায় তাহলে সেই পথিক এই তীর্থ দর্শন

থেকে বঞ্চিত হবে। এই হচ্ছে তাদের মনের গোপন কোণের আশঙ্কা।

সুদীর্ঘ পাঁচটি ঘন্টা সারা শহরের মানুষ এই ভাবে স্ব স্ব কাজকর্ম স্থগিত রেখে একটি মাত্র বিষয়ের সাথে নিজেদেরকে যুক্ত করে চক্রাকারে ঘুরতে থাকার পর কাচারী পাহাড়ের মাথার আইনের আরাম কেদারায় অধিষ্টিত মাথাভারী আমলাতন্ত্রের শিরমণিদের শিরপীড়া দেখা দিল।

তারা সারাক্ষণই জরুরী গোপন আলাচনা সভায় আলোচনা করে যাচ্ছিল। বেলা সাড়ে তিন ঘটিকার দিকে বরফ গলা শুরু হল। তারা আতঙ্কিত হয়ে উঠল, মনে মনে ডি, সি, কমিশনার, জজ সাহেবেরা ভাবতে লাগল যে, যদি আবুল বাশারকে জামিন দেওয়া না হয় তাহলে ঐ মিছিলের ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে যাবে। তখন তারা ক্ষুব্ধ হয়ে ধাবিত হবে কাচারী পাহাড়ের উপর দিকে। অর্থাৎ হাকিম সাহেবদের দিকে। সে অবস্থায় জনতা আমাদের পদদলিত করে পিশে ধূলির সাথে মিশিয়ে দেবে। এমতাবস্থায় "জান বাঁচান ফরজ কাজ" বুদ্ধিমানের কাজ তঃ বটেই। বাংলার মানুষ বিপদে ও রসিকতা করে থাকে। এদের মধ্যে জেলা জজ সাহেবের মুখে ছিল দাঁড়ি, গাল ভরতি। কমিশনার সাহেব একটু গম্ভীর ভাবে রস করে বললেন "হুজুর মেহের বাণী করে নিজের দাঁড়িগুলি মেপে দেখুন। আট আঙ্গুলের বেশী লম্বা কিনা? অর্থাৎ একটি প্রসিদ্ধ প্রবাদে আছেঃ—কারো দাঁড়ির দৈর্ঘ্যত্ব যদি আট আঙ্গুলের বেশী হয়, তবে তিনি বেকুপ। নিজ মুখের আট আঙ্গুলের অধিক দাঁড়ি নিজ হাতে দেশালাই এর কাঠির আগুনে পুড়তে গিয়ে জনৈক জজ সাহেব নিজের মুখ পুড়ে প্রমাণ করেছিলেন তিনি সত্যিই বেকুপ ছিলেন।

কমিশনার সাহেবের রসিকতার মাধ্যমে তার মানসিকতা জজ, সাহেব বুঝলেন এবং আবুল বাশারের জামিন মনজুর করার জন্য তিনি নিজেই প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। সাথে সাথে বাকী সবাই নিজ নিজ মতামত জামিনের স্বপক্ষে ব্যক্ত করে সারা দিনের কণ্টকর মৃত্যু যন্ত্রণার হাত থেকে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন।

জেলা জজের সই করা জামিন মনজুরের দরখাস্ত নিয়ে আমাদের দুই আইনজীবি বন্ধু নিজেদের কুকীত্তির কথা (কাচারী ঘেরাও না করার

পরামর্শ দান) বেমালুম ভুলে বা উহ্য রেখে খুশিতে টগ্ বগ্ করতে করতে দৌড়ে এগিয়ে গেলেন জেল গেইটে, তাদের মনের ভাবখানা ছিল এই লক্ষ জনতা জানুক এই ঐতিহাসিক সুকীর্ত্তির ঘটনার নায়ক তারা দুই জনা।

এই হল আমাদের ন্যায় দেশের অধিকাংশ বিদ্বান বুদ্ধিজীবি সমাজের চরিত্র। সত্যিকার ভাবে শ্রেণীচ্যুত হতে না পারা পর্য্যন্ত তাদের চরিত্র হয় দোমুখী সাপের ন্যায়।

আসলে মধ্যবিত্ত সমাজটাই মুলতঃ পাতিবুর্জোয়া; পাতি বুর্জোয়ারা পৃথক কোন শ্রণী নয়, তারা বুর্জোয়া শ্রেণীরই অংশ।

এর পরের ঘটনা হল ঃ কমঃ আবুল বাশার জামিনে মুক্ত হওয়ার পর কালুরঘাট অঞ্চলের শ্রমিকেরা নিজ প্রিয় নেতাকে কাঁধে করে নাচতে নাচতে চলে গেলেন—কালুর ঘাটের দিকে। সাথে নিলেন শহর থেকে ভাড়া করে ব্যাণ্ড বাদ্য। শ্রমিক জনতা বিজয় উল্লাসে ফিরে গেলেন নিজ নিজ এলাকার দিকে।

নিঃসন্দেহে বলা চলে আজকের দিনের সর্ব প্রধান ঘটনা ও আলোচ্য বিষয় ছিল—কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে সংগঠিত এই ইতিহাস সৃষ্টিকারী শাহী মিছিল।

এই দিনে এই ঐতিহাসিক ঘটনার আগে কমঃ আবুল বাশার ছিলেন শুধু মাত্র কালুর ঘাট ইস্পাহানী জুট মিলের শ্রমিকদের নেতা। এই ঘটনার পর তার পরিচিতি ও খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত শ্রেণীর মধ্যে ও এলাকায়। গ্রামের ব্যাপক জনতার মধ্যেও ইহা ছড়িয়ে গেল। কমঃ আবুল বাশার কিংবদন্তির নায়ক হয়ে দাঁড়াল। ইহা অনেকটা—"বানে বাতাসে বগা মরে, ফকিরের কেরামতি বাড়ে" ঘটনার ন্যায় বলা চলে। ফলে এই ঘটনার পর থেকে চট্টগ্রাম তথাপূর্ব বাংলার শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে কমঃ আবুল বাশার সর্ম্পকে বেশ কিছু বাড়তি ধারণার সৃষ্টি করেছিল।

নানা কারণে ঠিক অনুরূপ বাড়তি ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল দেবেন সিকদারের নেতৃত্বের যোগ্যতা সর্ম্পকে। বাস্তবে আমরা উভয়েই ঐ পরিমাণ প্রশংসার অধিকারী তথনও ছিলামনা। আসলে সকল কৃতিত্বের মুলে ছিল চট্টগ্রামের সংগ্রামী এবং কিছুটা শ্রেণী সচেতন তৎ-

কালীন শ্রমিক শ্রেণী ও তার অগ্র বাহিনীর। আর কিছুটা পরোক্ষ অবদান ছিল এ্যাড্ভোকেট দস্তিদার ও ব্যারিষ্টার মিলকীর। তারা যদি কাচারী পাহাড়ের মাথায় মিছিল করতে বাঁধা না দিত, তাহলে ঘটনাটি এত বড় আকার ধারণ করতে পারতো না। দ্বান্দ্বিক প্রদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করলে এর প্রধান কৃতিত্ব ছিল শত্রু পক্ষের। কারণ তারাই সমস্ত কর্মকাণ্ডের ছিল হোতা বা উস্কানিদাতা। তারা নিজ দেহ চুলকিয়ে ক্ষত সৃষ্টির ন্যায় কমঃ বাশারকে নজর বন্দী করে জামিন বাতিল করে, জেলে পুরে, পুনঃ জামিন না দিয়ে, শ্রমিক শ্রেণী থেকে নিজ নেতাকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র করে। এই ঐতিহাসিক ঘটনার বীজ বপন করেছে, মহান মার্ক্সের ভাষায় নিজেদের কবর নিজেরাই খনন করার উদ্যোগ নিয়েছে।

"গোদাপায়ের লাথি"

১৯৬৫ সাল। সমগ্র দেশ জুড়ে রেল ধর্মঘটের প্রস্তুতি চলছে। যেহেতু রেলের হেড অফিস ও ইউনিয়নের কেন্দ্র চট্টগ্রামে সেই সুবাদে চট্টগ্রাম পার্টির সংগঠক হয়েও আমি সমগ্র দেশ জুড়ে রেল সংগঠন পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি অনেকটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই ব্যবস্থা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। তখন পার্টি ছিল অবিভক্ত এবং কেন্দ্রীয় কমিটিতে শ্রমিক ফ্রন্টের দায়িত্বে ছিল কমঃ মোহাম্মদ তোয়াহা, বাস্তবে তিনি ছিলেন ঢাল তলোয়ার হীন নিধিরাম সর্দার। তিনি কোন কালে শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করে নিজ শ্রমে একটিও ট্রেড্ ইউনিয়ন গড়ে তুলেছেন এমন কোন নজীর নেই।

"হিন্দু-মুসলিম দুই জাতি" এই ভ্রান্ত তত্ত্বের সুবাদে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বকারী তিনি সহ অধ্যাপক মোজাফফর, সহিদুল্লা কায়সার, চৌধুরী হারুনর রশিদ ইত্যাদির পার্টিতে নেতৃত্ব পদে আসীন হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন বা পার্টি ও আমাদের ভ্রান্ত সাংগঠনিক নীতি-কৌশল গ্রহণের জন্য সুযোগ

দেওয়া হয়েছিল। বাস্তবে তখন তাদের পার্টিগত যোগ্যতার স্তর ছিল বড় জোর সাধারণ সদস্য পদ অর্জ্জনের। যে কারণেই হউক পার্টিকে ইসলামাইষ্ট করার জন্য এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়। ইহাই ঘটনা এবং ঘটনাই ইতিহাস।

সে যাই হউক, প্রায় ৪ হাজার মাইল রেল পথ জুড়ে ব্যাপক প্রস্তুতি চলছে। তখন রেল সংগঠনে ইউনিয়ন ছিল একটি। যার সভাপতি ছিলেন জনাব মাহবুবুল হক। তিনি ছিলেন আগা গোড়া রেল কর্তৃপক্ষের খয়ের খা তথা দালাল। আমরা কমিউনিষ্টরা এখানে নিজেদের সংগঠন (রেল রোড্ ওয়ার্কাস ইউনিয়ন) বিলুপ্ত করে দিয়ে (কৃষকের ভাষায় নিজের জমি বিক্রি করে দিয়ে সেই জমিতে বর্গা চাষ করার ন্যায়) ফ্যাকসানাল ওয়ার্ক করছি। অর্থাৎ অপরের নেতৃত্বে পরিচালিত সংগঠনে সংগোপনে সুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বের হয়ে আসার কৌশল অনুসরণ করছি। সাধারনতঃ ফ্যাসীবাদী সন্ত্রাসী শাসনের আমলে এই কৌশল অবলম্বন করা হয়।

বাস্তবে রেল ইউনিয়নের অভ্যন্তরে কতৃত্ব ছিল কমিউনিষ্টদের, উপরি কাঠামোতে ছিল দালালরা। কমিউনিষ্টরা সংখ্যা গরিষ্ঠ না হয়েও সব সময় গরিষ্ঠকে পক্ষে নিয়ে কাজ করতে পারতেন। আর সেই সব বুদ্ধি পরামর্শ কৌশল বাতলাইয়ে দেওয়ার দায়িত্বে নিয়োজ্জিত ছিলাম আমি নিজ্জে। এক কথায় রেল ইউনিয়ন পরিচালিত হচ্ছে দ্বৈত নেতৃত্বে।

আমি গোপনে আছি নাম মাত্র। কার্য্যতঃ কাজ করতাম প্রকাশ্যে। রেলের কেবল মাত্র আমাদের লোকদের মধ্যে নেতৃস্থানীয়রাই জানতো যে আমি গোপন কর্মী, তবে তাদের মধ্যেকার শতকরা ৯৮ জনে জানতো না যে আমি দেবেন সিকদার। তাদের নিকট আমার পরিচিত নাম ছিল মকবুল আহমদ বা মকবুল সাহেব। কোন কোন স্থানে সেলিম খান, দেলোয়ার হোসেন ইত্যাদি। অপর দিকে রেলের দালালরা জানতো যে আমি রেলের প্রাক্তন শ্রমিক। এবং রেল থেকে বন্দর পৃথক হয়ে যাওয়ায় এখন বন্দর শ্রমিক। অবিভক্ত—ভারত বাংলায় ছিলাম—কলকাতায়। শিয়ালদা রেলে। সেখান থেকে রেল শ্রমিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত, সাক্ষী হল কমঃ নূরুজ্জামান চৌধুরী, ও হামিদুর রহমান অতএব অবিশ্বাসের

কোন কারণ নেই। ইত্যাদি সাজানো কাহিনী। তারা দুই জন রেলের হিসাব রক্ষন বিভাগে কলকাতায় চাকুরী করতেন। হামিদ ভাই মাহবুবুল হকের দালালীর জন্য রেলের চাকুরী হারিয়ে তখন মারক্যান্টাইল ব্যাঙ্কে চাকরী করছেন। এই দুই জন বয়স্ক ও সৎ এবং স্বল্প ভাষী শ্রমিক নেতাকে—রেলের সকল স্তরের কর্মীরা জানতো ও শ্রদ্ধার চোখে দেখতো,। এখন তারা সাক্ষী দিচ্ছে 'খান সাহেব' প্রাক্তন রেলের লোক এবং দক্ষ শ্রমিক নেতা, তখন বিনা বাক্য ব্যয়ে সকলে বিশ্বাস করে নিচ্ছে; কোন প্রকার প্রশ্নের অবকাশ নেই।

আমার ছিল একান্ত একটি ঘনিষ্ট সাথী দ্বিচক্র যান, অত্যন্ত বিশ্বস্ত সহচর। তদুপরি ছিলাম এক কালের সাইকেল প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারী বিচক্ষণ চালক। উপরন্ত চেহারা ছুরুতে, চলনে বলনে কেহ ধারণা করতে পারতো না যে আমি মুসলিম সম্প্রদায়ের লোক নই। অনেকের ধারণা আমি মুলতঃ অবাঙ্গালী, আমাকে কেহ আগে ভাগে ছালাম জানাতে পারতো না।

সেবারের রেল ধর্মঘটের প্রস্তুতির সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যৌথ সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান সরকারী কর্মচারী সংগঠন। যার কেন্দ্র ছিল চট্টগ্রামে এবং যার অন্যতম এক মুল নেতা হল জনাব "খোদাবক্স"। ঐ সংগঠনের প্রায় নেতার সাথেই আমি প্রকাশ্যে আলোচনা করতাম উপরোক্ত ছদ্ম নাম ও পরিচয়ে।

তখন রেলে অনেক কর্মী। প্রায় ৫০/৬০ জন সর্বক্ষণের কর্মী। প্রথম দিকে আমি ছাড়া আর কেহ সর্বক্ষণের কর্মী ছিল না। কিংবা-বাস্তবে ২০/৩০ জন চাকুরী করলেও মূলতঃ ইউনিয়নের কাজই সর্বক্ষণ করে বেড়াতেন। রেল কর্তৃপক্ষের অপরিণাম দর্শিতার জন্য আমরা অনেকগুলি সার্বক্ষণিক কর্মী পেয়ে গেলাম। কর্তৃপক্ষ এক দিকে ধর্মঘটের প্রস্তুতিকে বানচাল করার অপর দিকে সংগঠনকে দুর্বল ও ঘায়েল করার জন্য ভাল ভাল কর্মীগুলিকে সাময়িক ভাবে সাসপেণ্ড তথা কর্মচ্যুত করলেন। এতে করে অভিশাপে আশির্বাদের মত হল। সংগঠন পেল অনেকগুলি আংশিক কর্মীকে সর্বক্ষণের কর্মী রূপে।

রেল কতৃপক্ষের ধারণা ছিল কর্মচ্যুত কর্মীরা ভয়ে ও অর্থাভাবে হতাশ হয়ে বসে পরবে। কিন্তু ফল হল উল্টা। এর প্রতিকারে আমরা সিদ্ধান্ত

নিলাম যে-কর্মীর চাকুরী যাবে, তিনি যে পরিমাণ বেতন কম পাবে, ইউনিয়ন তা পূরণ করে দেবে। অর্থাৎ ভূতুর্কী দেবে। ফলে সংগঠন দ্রুত জোরদার হতে থাকে এবং ইউনিয়নের তহবিল দ্রুতস্ফীত হয়ে উঠে। সাধারণ শ্রমিক–কর্মচারীরা আরও আগ্রহশীল হয়। অপর দিকে এই সমস্ত কর্মচ্যুত শ্রমিক নেতাদের মনে পরিবার পরিজনের ভরণ পোষণের বিষয়ে নিরাপত্তার ভাব জাগ্রত হয়।

এই সমস্ত কর্মী ও নেতাদের তিন চারজনের দলে ভাগ করে রেলের বিভিন্ন শাখায় সংগঠক হিসেবে পাঠানো হয়। রেল শ্রমিক ও নেতা হিসেবে তাদের আর একটি সুবিধা ছিল রেলের পাশে বা বিনা ভাড়ায় ভ্রমণ করতে পারতো বলে অতি কম খরচে কাজ করা যেত।

তখন সমগ্র রেলকে তেত্রিশটি শাখায় ভাগ করা হয়। করা হয় সাংগঠনিক কাঠামো। গুরুত্বপূর্ণ রেল জংসন ও ওয়ার্কসপকে কেন্দ্র করে রেলের এই সব শাখা সংগঠন। যেমন পাহাড়তলী রেলে দুটি শাখা একটি ওয়ার্কসপ অপরটি ওপেন লাইন। সি, আর বি, বন্দর ও চট্টগ্রাম-ষ্টেশনে একটি করে শাখা। অনুরূপ সৈয়দপুর ওয়ার্কসপ, পার্বতীপুর, লালমনিরহাট, বোনারপাড়া, শান্তাহার, ঈশ্বরদী, রাজবাড়ী, ঢাকা, ভৈরব, ময়মনসিংহ; আখাউড়া ইত্যাদি শাখা।

সমস্যা হত, অনভিজ্ঞ কর্মী:দের বিচার বিশ্লেষণমূলক ভুল বিচ্যুতির রিপোর্টকে যাচাই করা নিয়ে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে থাকতো বাড়তি ধারণা জনিত রিপোর্ট, দুই এক জনের রিপোর্টে থাকতো হতাশা। আমাদের কর্মীদের মধ্যে যিনি প্রায়ই হতাশামূলক রিপোর্ট বহন করে আনতেন তিনি হচ্ছেন পাহাড়তলী ষ্টোরের কমঃ এম, আর ভূইয়া। আর সব চেয়ে বেশী বাড়তি রিপোর্ট থাকতো কমঃ এম, এস, হকের রিপোর্টে। বর্তমানে এই দুই বন্ধু ট্রেড্ ইউনিয়ন কেন্দ্রে অবস্থান করছেন।

জনাব মাহববুল হকের গ্রুপের লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান, করিতকর্মা, এবং সাংগঠনিক যোগ্যতা ছিল জনাব রহমতউল্লাহ চৌধুরীর। তিনি বর্তমানে আওয়ামী লীগ পন্থী রেলশ্রমিক লীগের সভাপতি। আর সবচেয়ে যোগ্যতাহীন লোক ছিল সম্পাদক জনাব মাহবুব আলী সাহেব, এবং তিনি ছিলেন কৃপনের হদ্দ। রোজ সকালে বাসা থেকে বের হওয়ার সময় পকেট খালি করে বের হতেন, এমন কি ম্যাচ

পর্য্যন্ত বাসায় রেখে আসতেন। তারপর সারাদিন অন্যের পকেটের পয়সায় সব কিছু চালিয়ে নিতেন। বুদ্ধি শুদ্ধি তেমন প্রখর ছিলনা। কেন যে জনাব মহাবুবুল হক সাহেব তাকে সম্পাদক মনোনীত করেছিলেন–বোধ হয় ঐ কারণে। যে নিজের বুদ্ধিতে চলতে পারেনা। সে কোন দিন নেতার বিরুদ্ধাচারণ করবে ? আগের একটি লিখায় উল্লেখ করা হয়েছে–এখানে আমরা কাজ করতাম দ্বিমুখি সংগ্রামের কায়দায়। মাঝে মধ্যে দালাল নেতাদের কাবু করার জন্য সাধারণ শ্রমিক দিয়ে তাদের ঘেরাও করার কর্মসূচী ও নেওয়া হত।

অবশেষে পাঁচ মাসের প্রস্তুতির পর চুড়ান্ত দিন ঘনিয়ে এল। সরকারী কর্মচারী ইউনিয়ন (ইউকাসেপের) সাথে পরামর্শ করে ধর্মঘটের তারিখ নিদ্ধারণ করা হল। প্রয়োজন নিজ নিজ সংগঠনের কাউন্সিল সভার অনুমোদন। রেল ইউনিয়নের কাউন্সিল সভা ডাকা হল ঢাকার মাহাবুব আলী মিলনায়তনে, কাউন্সিল সর্ব সম্মত ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল ১৫ই আগষ্ট ১৯৬৫ দিবাগত রাত ১২টার পর থেকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য ধর্মবট শুরু হবে। কিন্তু ধর্মঘট শুরু করার পুর্বে যদি ধরপাকড় হয়, তা'হলে যেদিন–যে মূহুর্তে ধরপাকড় হবে সেইদিন–সেই মূহর্ত থেকে ধর্মঘট শুরু হয়ে যাবে। তার জন্য নতুন কোন সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হবেনা। বিশেষ করে যে শাখার কর্মী গ্রেপ্তার হবে, সেই শাখায় প্রতিবাদে ধর্মঘট শুরু করতে হবে সকলের আগে।

বলা বাহুল্য–এই প্রস্তাব পাশ করতে হয়েছে দালালদের বিরুদ্ধে তুমুল লড়াই করে।

কাউন্সিল মিটিং যেদিন সমাপ্ত হয়, সেই দিন দিবাগত রাত থেকেই ধরপাকড় শুরু হল। সর্বকমঃ আলমশা, এম ইউ সিকদার, কাজী অহিদুজামান, জলিল উদ্দীন আহমদ. এম এস হক, মাহাবুব আলী, তোতা মিঞ্রা (আখাউরা) সহ সারা দেশ থেকে প্রায় অর্দ্ধ শতাধিক ইউনিয়ন নেতা ও পার্টি কর্মী গেপ্তার হল। অনেককে গেপ্তার করার জন্য ঢাকা থেকে গোয়েন্দা পুলিশের দল—রেল গাড়ীতে অনুসরণ করে। যারা ইহা টের পেয়েছিল তারা ট্রেন থেকে কেটে পরে। কেহ কেহ ষ্টেশন থেকে গেপ্তার হয়। কেহ গেলেন আত্মগোপনে।

সেদিন আমি ছিলাম-ফতেয়াবাদ নামক শহর থেকে-৮ মাইল দুরে এক গ্রামে। খবর পেলাম বিকাল চারটার দিকে। আরও খবর পেলাম প্রতিবাদে কোন ধর্মঘট-মিছিল হয়নি। বুঝতে কষ্ট হলনা পরিবেশ ও বাস্তব অবস্থা থাকা সত্বেও নেতৃত্বদানের অভাবে প্রতিবাদ ধর্মঘট-পালিত হয়নি।

তখন দ্রুত রওয়ানা দিয়ে শহরে এসে সাইকেল যোগে সর্বত্র খোজ খবর নিলাম, যোগাযোগ প্রতিষ্টা করলাম। রাত প্রায় নয়টার দিকে কৈবল্য ধামের পাশে ফিরোজ শাহ কলোনীর কমঃ জোহার বাসায় আত্মগোপনকারী ইউনিয়ন নেতাদের সমবেত করতে সক্ষম হলাম।

খুব দ্রুত ও সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা শেষ করে প্রতিবাদ ধর্মঘট করার সিদ্ধান্ত দিলাম। কেহ আপত্তি করলেন না। যতদূর মনে পরে সেই গোপন সভায় উপস্থিত ছিলেন জনাব রহমত উল্লাহ চৌধুরী, কমঃ নূরুজ্জামান চৌধুরী, ইব্রাহিম মণ্ডল, আবদুর রউফ সর্দ্দার, জাফর আহমদ, ওয়ালী উল্লাহ, খান সাহেব প্রমূখ দশ/বার জন।

সকলের রিপোর্ট সমগ্র শ্রমিক কর্মচারীরা বিক্ষুদ্ধ। পিকেটিং ছাড়াই ধর্মঘট হবে। প্রয়োজন কেবল মাত্র উদ্যোগ গ্রহণ ও নেতৃত্ব দান।

রাত সাড়ে এগারটায় বৈঠক শেষ হল। কর্মীরা বিদায় নিলেন, সারা রাত ধরে তারা যার যার এলাকায়—শ্রমিকদের ঘুম থেকে জাগিয়ে প্রচার করলেন। পোষ্টার লিখে লাগালেন। ভোর সাড়ে ছয়টার হুইসেল (বাশী) বাজার আগেই যার যার নিদিষ্ট স্থানে কর্মীরা হাজির হল। মুখে মুখে প্রচার করে দিলেন "আজ এবং আগামী কাল গেপ্তারের প্রতিবাদে ধর্মঘট।" চাকা বন্ধ।

সকাল সাতটায় একজন শ্রমিক কর্মচারীও কাজে হাজির হল না। কেবল মাত্র হাজিরা বাবু ও ঘন্টিওয়ালা উপস্থিত ছিল।

সিদ্ধান্ত মোতাবেক পাহাড়তলী থেকে জঙ্গি মিছিল রেলের হেড অফিসে আসে, সেই মিছিলের আমেজ ও মেজাজে প্রভাবিত হয়ে—সি, আর, বি, (হেড কোয়ার্টার) ধর্মঘট হল, তারাও মিছিলে যোগদান করল। মিছিল আরো বড় এবং জঙ্গী রূপ ধারণ করে সকাল নয় ঘটিকায় পৌছল চট্টগ্রাম রেল ষ্টেশনে। এখানে আর একটি মিছিল এসে তাদের সাথে যুক্ত হল। তা'হল কমঃ ফরিদ উদ্দীন ও কবীরের নেতৃত্বে বন্দর রেল শ্রমিকদের মিছিল।

সকাল এগারটার পর—চট্টগ্রাম থেকে কোন ট্রেন যাত্রা করতে পারল না। প্রায় ১০/১৫ হাজার শ্রমিক কর্মচারী ও তাদের স্ত্রী-পুত্র কন্যারা রেল লাইনের উপর বসে পড়ল। বেলা একটার দিকে—স্থিরিকৃত হল প্রতিবাদ ধর্মঘট চট্টগ্রামে সম্পূর্ণ সফল।

পরের দিন প্রতিবাদ ধর্মঘটকে কোন শক্তিই ঠেকাতে পারবে না। সংগঠিত শ্রমিক কর্মচারীদের প্রতিরোধ স্পৃহার বাঁধন খুলে গেছে।

পরে সরকারী মহল থেকে খবর পাওয়া গিয়েছিল-সেদিন রাত এগারটা পর্য্যন্ত প্রতিবাদ ধর্মঘটের কোন প্রকার প্রস্তুতি না দেখে স্থানীয় গোয়েন্দা পুলিশেরা পৃথক পৃথক ভাবে রিপোর্ট দিয়েছিল। 'সিদ্ধান্ত থাকা সত্ত্বেও আজ কোন প্রকার প্রতিবাদ ধর্মঘট ও মিছিল হয়নি। আগামী দিনেরও কোন প্রস্তুতি নেই। সর্বত্র নীরবতা বিরাজ করছে।' ফলে-গোয়েন্দা বিভাগের কর্তারা নিশ্চিন্ত মনে নাকে তেল দিয়ে আরামে যখন নিদ্রা যাচ্ছিল তখন ঘটনা ঘটে গেল তার বিপরীত। এ আঘাত ছিল তাদের নিকট বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের ন্যায়।

এতে করে তাদের এই ধারণা হল যে এই ধর্মঘটের পেছনে রয়েছে কমিউনিষ্ট পার্টি এবং যে পাটির গোপন সংগঠন চট্টগ্রামে খুবই মজবুত। নতুবা অর্ধ রাতের পর কি করে এত বড় ঘটনা ঘটে গেল-সংগঠিত হল-প্রতিবাদ ধর্মঘট ও মিছিল।

তখন পূর্ব বাংলার গভর্ণর পদে আসীন ছিলেন পাকিস্তানের রাম দালাল জনাব মোনায়েম খান। তিনি জানতে চাইলেন পরিস্থিতি কিরূপ? —আগের দিনের ও পরের দিনের রিপোর্টের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য দেখে পুলিশের বড় সাহেবকে ভর্ৎসনা করলেন। পরের দিনের প্রতিবাদ ধর্মঘটকে কঠোর হস্তে দমনের জন্য নির্দেশ দিলেন, কিন্তু সেই সুযোগ তারা পেল না।

অগত্যা স্থানীয় প্রশাসন রেল ইউনিয়ন এর সাথে আপোষে আসার জন্য গভর্ণর সাহেবকে পরামর্শ দিলেন।

গভর্ণর মোনায়েম ইউনিয়নের সভাপতি জনাব মাহবুবুল হকের সাথে টেলিফোন যোগে (ঢাকায়) একক ভাবে আপোষ করার প্রস্তাব রাখলেন। জনাব মাহবুবুল হক স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন যে "আমি হলাম গিয়ে রেল ইউনিয়ন এর আলংকারিক সভাপতি। বাস্তব ও কার্যকরী সভাপতি হলেন কমিউনিষ্ট নেতা দেবেন সিকদার। তিনি থাকেন গোপনে। তাকে

ধরা ছোয়ায় পাওয়া যাবে না। সত্যিকার আপোষ হতে হবে তার দলের চেলা চামুণ্ডাদের সাথে ; তারা এখন দেশের বিভিন্ন কারাগারে। অতএব সমস্ত নেতৃস্থানীয় কর্মীদেরে ঢাকা জেলে আনা হউক। নতুবা তাদেরে মুক্তি দেওয়া হউক। একমাত্র এই পথেই এই সমস্যার সমাধান হতে পারে, অন্য কোন পথে নয়।

গভর্ণর মোনায়েম তাই করলেন। সারা দেশের বিভিন্ন কারাগার থেকে সংগ্রাম কমিটির নেতাদের বিমান যোগে ঢাকা জেলে আনা হল। রাত এগারটায় সিদ্ধান্ত হল–বিনা শর্তে বন্দীদের মুক্তি এবং ত্রিপক্ষীয় আলোচনায় বসতে রাজি হলে ধর্মঘট সাময়িকভাবে প্রত্যাহার করা হবে।

উল্লেখযোগ্য যে এই প্রতিবাদ ধর্মঘটের পূর্বে সরকার আলোচনা বৈঠকে বসতেও রাজী ছিল না।

রাত এগারটার রেডিওতে খবর ঘোষণা করা হল, কিন্তু কেহই তা বিশ্বাস করলোনা। পরের দিন আরও সুসংগঠিত ধর্মঘট ও মিছিল হল। মুক্তি প্রাপ্ত নেতাদের নিয়ে জনসভায় শ্রমিক জনতা বিজয় উল্লাসে ভেঙ্গে পড়ল।

বাস্তবে দীর্ঘস্থায়ী রেল ধর্মঘট চালাবার প্রস্তুতি আমাদের ছিল না। তাই গোদা পায়ের লাথি দেখিয়ে সেদিন সরকারকে বাধ্য করা হয়েছিল বন্দী মুক্তি ও আলোচনায় বসার জন্য।

জুয়ার আড্ডা থেকে নেতৃত্বে

১৯৬০ এর দশকে পূর্ব বাংলার রেলের হেড কোয়ার্টার ও বড় কেন্দ্র চট্টগ্রামে রেল শ্রমিক ও কর্মচারীরা তাদের বহু দিনের পুঞ্জিভূত অনেক গুলো দাবী দাওয়া নিয়ে ব্যাপক আন্দোলনের সূচনা করেছে।

ছোট, বড় মাঝারী (সংখ্যাগত ভাবে) অনেক গুলো ঘেরাও আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে। এতে করে নগদা নগদ ফল পাওয়া যায়। যেমন মাসের শেষে বেতন দানের সময় শুধু মাত্র বেতনের টাকা পয়সা না দিয়ে "সাথে পে শ্লিপ দিতে হবে।" যাতে শ্রমিকেরা বুঝতে পারে কোন খাতে কত টাকা পাওয়া বা কর্তন গেল। এই দাবী শ্রমিকদের বহু বছরের। কিন্তু কর্তৃপক্ষ কানে তালা লাগিয়ে বসে আছে। "কাকস্য পরিবেদনা"।

রেলের নিজস্ব জল কলের জল পাহাড়ের চুড়ায় সাহেবদের বাংলায় উর্দ্ধমুখি উঠ্‌তে পারে কিন্তু ঐ পাহাড়ের গোড়ায় অবস্থিত শ্রমিকদের কোয়ার্টারে জল আসে না। রেলের কাঠ, রেলের যন্ত্রপাতি, রেলের বেতনধারী কাঠ-মিস্ত্রী দিয়ে সাহেবদের বাংলায় আসবাব পত্র তৈয়ার হয়ে বাজারে বিক্রি হয়, অথচ শ্রমিকদের কোয়ার্টারের ভাঙ্গা দরজা-জানালা মেরামত হয় না। এমন ধরণের হাজারো দাবী ও অভিযোগ। যার কোন প্রতিকার হয় না। এমন কি ৩০/৩৫ বছর চাকুরী করার পর অস্থায়ী ভাবে অবসর নিতে হয়েছে। মৃত্যু বরণ করেছে, তবু চাকুরীতে স্থায়ী হতে পারেনি। অবসরের পর জমা টাকা পেতে বছরের পর বছর দেরী হয়। এই সবের জন্য ধনন্তরী দাবাই এর ন্যায় কাজ করে ঘেরাও আন্দোলন।

অবশেষে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল সারা রেলে। বিভিন্ন জায়গায় ঘেরাও করে সারা দেশের রেল শ্রমিক কর্মচারীরা দাবী উঠাল, দাবী নামা পেশ করে ধর্মঘটের নোটিশ দানের জন্য। এই দাবীর প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় ইউনিয়ন কাউন্সিল সভা ডেকে মতামত গ্রহণ করল। সিদ্ধান্ত হল এক মাসের নোটিশ দিয়ে ধর্মঘট ঘোষণা করার।

রেল কর্তৃপক্ষও সরকারের মাথায় বাজ পড়ল। তারা ক্ষিপ্ত হয়ে পাগলা কুকুরের ন্যায় কামড় বসালো, ধর পাকর শুরু হল। ঘোষিত হল ধর্মঘট বেআইনি। প্রায় সমস্ত নেতা ও কর্মী গ্রেপ্তার হয়ে গেছে। সাহস করে বেআইনি ধর্মঘটের প্রচার পত্র বিলি করার সাহসী কর্মীর দারুণ অভাব।

এমন সময় আমি অবস্থান করছি—রেলের ইউনিয়ন সংলগ্ন জনাব শফিকুর রহমানের বাসায় ? তাঁহার সাথে প্রথম পরিচয় হয়—। প্রসিদ্ধ চক্ষু চিকিৎসক ও আকুপাংচারিষ্ট ডাক্তার আবুল খায়ের এর মাধ্যমে। কারণ জনাব শফি ছিলেন তাঁহার স্ত্রী জনাবা "তারা"র বড় ভাই।

ঐ বাসা হতে রেলের তখনকার ক্লাব ছিল খুবই সন্নিকটে। ঐ ক্লাবে চলতো বা বসতো দিনরাত তাসের আড্ডা তথা জুয়া-ফ্লাশ ইত্যাদি। জনা ২০/২৫ জন জুয়ামোদি যারা রেলের কর্মচারীও বটে। এই জুয়ারীদের শিরমনি ছিলেন তিন জন। সর্ব জনাব মকবুল আহমদ, রহমত উল্লাহ চৌধুরী ও আবদুস ছোবান। তার মধ্যে জনাব মকবুল আহমদ ছিলেন সেরা খেলোয়াড়। সেরা অভিনেতা, পরবর্তী কালে সেরা বক্তা ও সংগঠক।

তিনি জুয়াতে এত দক্ষ ছিলেন যে কাহারও পক্ষে খেলতে যাবার সময় তিনি প্রতি রাতের জন্য অগ্রীম ১০০'০০ টাকা নগদ নিয়ে তারপর খেলতে যেতেন। তদুপরি খাওয়া-দাওয়া পানীয় ও যাতায়াত দিতে হবে যথা-রীতি। এই জুয়ারীদের বড় অংশ আবার শ্রমিক আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন। প্রতিমাসে ইউনিয়নের চাঁদা উঠাবার কালে তারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করতেন। নিজেরা সকলের আগে চাঁদা দিতেন ও চাঁদা উঠাতে সাহায্য করতেন।

আমি এদের সকলকে না চিনলেও প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের চিনতাম তারাও আমাকে জানতো—

যদিও শ্রমিক নেতা হিসেবে আমি গোপন ও বে-আইনি মানুষ ইহা তাদের ধারণার বাইরে ছিল। আমার গোপন নামের সাথে জনাব মকবুলের নামের মিল থাকায় আমি তাকে মিতা বা দোস্ত বলে সম্বোধন করতাম।

সেদিন ইউনিয়নের প্রচার পত্র বিতরণের সমস্যায় পড়ে ক্লাবের জুয়ার আড্ডায় গিয়ে দোস্তের শরণাপন্ন হলাম। তাঁকে সমস্যাটা বুঝিয়ে বলাতে তিনি তৎক্ষানাৎ জনাব ছোবান সাহেবকে সাথে করে আমার আহবানে সারা দিয়ে প্রচার পত্র বিতরণের কাজে নেমে পড়লেন।

সেই যে তিনি ইউনিয়নের কাজে প্রত্যক্ষ ভাবে নামলেন এই নামা তার জন্য অত্যন্ত শুভ হয়ে দাঁড়াল। তখন থেকে তিনি বিকশিত হলেন প্রথমে প্রথম শ্রেণীর ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী হিসেবে, পরে ইউনিয়ন ও শ্রমিক ফেডারেশনের নেতার পর্য্যায়ে উন্নীত হলেন। ছাড়লেন জুয়া ও মদ। অর্জ্জন করলেন পার্টির সদস্য পদ। তারও পরবর্তী কালে জেলা পার্টির নেতা এবং ১৯৭০ সালে হলেন গ্রেপ্তার। হলেন রাজবন্দী। স্বাধীনতা যুদ্ধ চলা কালে তিনি কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন। ১৯৭১ সালে তিনি-বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। ১৯৬৮ সালে তিনি রেলের সংগ্রামী ইউনিয়ন পারওয়েলের প্রতিষ্টাতা সম্পাদক। যার সভাপতি ছিলেন প্রসিদ্ধ ব্যারীষ্টার জনাব আবদুল হক।

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের নিয়মে বস্তুর ভিতরকার দুই বিপরীত শক্তির (হাঁ ও না) দ্বন্দ্বকে সঠিক ভাবে ব্যবহার করতে পারায় কমঃ মকবুল আহমদ এর চরম বিকাশ ঘটেছিল। পরবর্তী কালে বেঠিক ব্যবহারে তার অধঃপতন ঘঠে। তিনি পুণঃ যথা স্থানে ফিরে যেতে বাধ্য হয়ে-

ছিলেন। তার জন্য তিনি নিজে প্রধানতঃ দায়ী ছিলেন না। দায়ী ছিল তৎকালীন পার্টি নেতৃত্বের পারিপার্শ্বিকতা ও ব্যবহার।

১৯৭৫ সালে তিনি বি, এন, পির শ্রমিক সংগঠনের সাথে যুক্ত হন। তার ও আগে তিনি শেখ মুজিবকে রেলের সেচ্ছা সেবক বাহিনীর তরফ থেকে গার্ড অব অনার জানান।

এই হল একটি বিপ্লবীর কর্ম শক্তির উত্থান-পতনের ইতিবৃত্ত। কমঃ মাও যথার্থই বলেছেন সঠিক ব্যবহারে অনেক প্রতিকুল বিরোধ অনুকূলে আসে, বেঠিক ব্যবহারে অনুকুল বিরোধ—প্রতিকুলে যায়। কমঃ মকবুলের ক্ষেত্রে ইহা জীবন্ত নজীর হিসেবে পরিলক্ষিত হয়।

কম্পিত সতীন

গোপন জীবনের নিরসতা ও এক ঘেয়েমী কাটাবার জন্যে মাঝে মধ্যে আমি সুযোগ বুঝে পার্টি কর্মীদের নিয়ে সিনেমা, থিয়েটার, কবিয়াল গান, বনভোজন, শিকার ইত্যাদিতে যোগদান করতাম, এতে করে মনের প্রফুল্লতা বাড়ে, কাজে কর্মে উৎসাহ বৃদ্ধি পায়।

পূর্বের এক লিখাতে বলা হয়েছে, রেলের ইউনিয়ন নেতা কমরেড মকবুল অহেমদ এক জন ভাল মঞ্চ শিল্পী ছিলেন। বিপরীতে তার স্ত্রী ছিলেন ঐ বিষয়ে ভয়ানক খুত খুতে স্বভাবের।

এক দিন রেলের সৌখিন মঞ্চ শিল্পীরা চট্টগ্রাম রেলওয়ে ক্লাবে একটি নাটক মঞ্চস্থ করছিলেন। এই রকম নাটক তারা প্রায়ই মঞ্চস্থ করতেন। কমরেড মকবুল করছিলেন নায়কের ভূমিকায় অভিনয়। নাটকটির কি নাম ছিল আজ তা আর মনে নেই, তবে মূল প্রতি পাদ্য বিষয়টি মনে আছে।

অভিনয় চলা কালে নায়ক-নায়িকার প্রেমের চরম পরিনতি হিসেবে মঞ্চে ছিল বিবাহ অনুষ্ঠান।

বেশ কয়েক দিন ধরে অনেক রাত পর্য্যন্ত চলছিল মহড়া। অভিনয়ে অংশ গ্রহণকারী আমাদের পার্টি ও শ্রমিক সংগঠনের সাথে সংশ্লিষ্ট বেশ কয়েক জনের বাসা ছিল ক্লাব ঘরের অতি নিকটে। তারা বাসস্থানের অভাবে রেলের পরিত্যক্ত জমিতে পাশা পাশি কয়েকটি কাঁচা ঘর নিজদের

খরচে তৈরী করে বসবাস করতো। এই ভাবে রেলের পরিত্যক্ত জমিতে বল প্রয়োগ করে বাসস্থান নিম্মর্মান করা ছিল পাকিস্থান আমলের এক পর্য্যায়ের শ্রমিক আন্দোলনের ফলশ্রুতি। কেননা রেলের সোয়া শত বছর বয়সের মধ্যে তার অর্দ্ধেক শ্রমিক-কর্মচারীকে বাসস্থান দিতে অনিচ্ছুক অপরাগ হয়েছিল মাথা ভারি আমলাতন্ত্র।

এখানে পাশাপাশি বাস করতো সর্ব কমঃ মকবুল আহমদ, আলম শা, মেজবাউদ্দীন সিকদার, এরশাদ হোসেন এবং জনাব শফিকুর রহমান। এদের প্রতিটি বাসায় ছিল আমার অবাধ যাতায়াত। এরা কেহই আমার আসল নাম জানতো না, জানত না জন্মগত ধর্মীয় পরিচয়। কেবল জানতো আমি একজন গোপন পার্টি সংগঠক। রেলের সাধারণ শ্রমিক কর্মচারী এবং অফিসারগণ জানত আমি প্রাক্তন রেল শ্রমিক, বর্তমানে চট্টগ্রাম বন্দরে কাজ করি।

কমরেডদের দেখা দেখি তাদের স্ত্রী-ভগ্নি, বন্ধুরা ও আমাকে "নানা" বলে সম্বোধন করতেন, ছেলে মেয়েরা যার যার খুশি মত, মামা, কাকা, চাচা খালু নামে। এমনকি এ সব পরিবারের নিকট আত্মীয় স্বজনের নিকটও অতি আপন জন হিসেবে সম্পর্কীত ছিলাম। কেননা আমার দ্বারা তারা নানা ভাবে উপকৃত হতেন। উদাহরণ স্বরূপ স্বামীর ব্যবহারে মার্জিত ভাব আনা, স্ত্রীর সাথে মুনীবী আচরনের পরিবর্তে সম্মান জনক আচরণ করা, দৈহিক নির্য্যাতন বন্ধ করা, স্বামী স্ত্রীর বিবাদ মিটমাট করা, ছেলে মেয়েদের ন্যায্য আবদার আদায় করে দেওয়া ইত্যাদি ইত্যাকার কারণে আমি ছিলাম সকলের নিকট অত্যন্ত আদরের মেহমান।

যেদিন থিয়েটার মঞ্চস্থ হচ্ছিল সে দিন আমি রাতের বেলায় কোন কাজ রাখিনি। এই কাজ রাখা না রাখাটি একজন কমিউনিষ্ট পার্টি নেতার জন্য কঠিন পরীক্ষা। নিজের ছুটি নিজে মন্‌জুর করে কিছু সময় অবসর বিনোদনে ব্যয় করা স্থান, কাল, পাত্র ভিন্নতায়—সঠিক হচ্ছে কিনা? সঠিক না হলে সেই কাজটির তথা নেতাটির চরিত্র গড়াবে আরাম প্রিয়তার থেকে সুবিধাবাদের দিকে।

আমাদের আলোচ্য বিষয়ের নায়ক মকবুল ভাই এর দেহের ভাল অংশের শরিকদার স্ত্রী শ্রীমতি পুতুলের মাতা ছিলেন স্বল্প শিক্ষিতা মহিলা। একেতঃ আত্ম কেন্দ্রিক তদুপরি হিন্দু বিধবার ন্যায় স্বামী সংশ্রব সম্পর্কে

শুচিবাই গ্রস্থ। তার সামনে মকবুল ভাই অন্য কোন মহিলার সাথে হাসি, ঠাট্টা মশকারী করতে পারতো না, এমন কি সেই মহিলা যদি শালী, শালার স্ত্রী, বন্ধুর বোন, গৃহিনী বা জেলেনী হলেও পুতুলের মা তেলে বেগুনে জ্বলে উঠতেন। চোখের পানি আর নাকে 'শি' একত্রে করে একটা বিশ্রী সীন্ সৃষ্টি করতেন।

পুতুলের মার এই বিশেষ দিকটি আমার জানা ছিল বিধায় সেদিন থিয়েটার শুরু হওয়ার অল্পক্ষণ পূর্বে আমার মাথায় তাকে নিয়ে একটু রগর করার ফঁন্দি খেলে গেল। ফন্দিটি কাজে লাগাবার জন্যে সেদিন সন্ধ্যা বেলা পুতুলের মা সহ সকল কমরেডের স্ত্রীদের বললাম—আজকে একটা ভাল থিয়েটার মঞ্চস্থ হচ্ছে, তোমরা সকলে কাপড় চোপড় পড়ে নাও। এক সাথে থিয়েটার দেখা হবে। আমাদের দেশের মেয়েরা ঘরের বাইরে যাবার কথা শুনলেই সাধারণতঃ অতিশয় আনন্দিত হয়, ততোধীক খুশী হয়, সিনেমা, থিয়েটার, বনভোজন ও পিতৃলয়ের যাবার কথা শুনলে। কথা মুখ থেকে বের হওয়ার সাথে সাথে কঁচি কাঁচাদের মধ্যে আনন্দের ঢেউ বয়ে যেতে লাগলো, সকলেই দ্রুত কাজ কর্ম সেরে সাজ গোছ করে তৈয়ারী হয়ে নিল। সেদিন পুতুলের মার সাজ গোছটা ছিল একটু বেশী উগ্র, তীব্র লাল রং এর বেনারশী শাড়ী, তার চাইতে তীক্ষ্ণ লাল চাইনীজ সিল্কের ব্লাউজ এবং রঙ্গিন ঠোঁটে লাল লিপষ্টীক ঘন করে লাগানো, কপালে লাল টিপ্।

সাজ গোছ দেখে সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম-আজকের পুতুলের মাকে ১৬/১৭ বছরের কিশোরী হিসেবে ইচ্ছে করলে নতুন করে বিয়ে দেওয়া যাবে। কি বল তোমরা? সাথে সাথে সিকদার, আলমশা ও এরশাদ সাহেবের স্ত্রী-এক যোগে করতালী দিয়ে সমর্থন জানাল। অবশ্য পুতুলের মা-এই ধরণের প্রসংশায় মুখেযা তা বললেও মনে মনে ঠিক বেলুনের ন্যায় ফুলে ফেঁপে উৎফুল্ল হচ্ছিল।

অবশেষে সকলকে নিয়ে হলে আসা হল, মাত্র ২/১ মিনিটের রাস্তা। সকলকে মেয়েদের আসনের সামনের দিকে বসিয়ে দেওয়া হল। বই শুরু হতে আর বেশী দেরী নেই, সীন্ সীনারী, আলো, মঞ্চ সজ্জা পরিচালনা সবাই যথাযথ ভাবে প্রস্তুত।

অভিনয়ে প্রধান ভূমিকায় রয়েছেন, সর্ব জনাব, ছাদেক আলী, ছাদেক নবী, অমলেন্দু বিশ্বাস (১৯৭৯-৮০ সালের প্রতিযোগিতায় খ্যাত

নাট্ট ও সম্রাট) মকবুল আহমদ, লুৎফর রহমান (বড় ভাই) প্রমুখ। মহিলাদের মধ্যে রয়েছেন মিসেস নবী, এবং ছন্দা ভাট্টাচার্য্য।

বড় ভাই লুৎফর রহমান এবং অমলেন্দু যখন-যথাক্রমে 'মশিয়ে লালী' ও সিরাজদৌল্লার অভিনয় করতেন তখন হল ঘর ঘন ঘন করতালী ও হাস্য ধ্বনীতে-গরম হয়ে উঠতো।

আমার 'রগড়' টি চুড়ান্ত মার্গে নেওয়ার জন্য সেদিন-সবাইকে কিছু চা নাস্থা খাওয়াতে হয়েছিল। অবশেষে এল সেই বাঞ্চিত দৃশ্য পট। এর মধ্যেই পুতুলের মা রাগে ফুলছে। চোখ মুখ গম্ভীর করে ঘন ঘন চারি দিকে তাকিয়ে কেবল আমায় খুঁজছে আর-দাঁত কট মট করে নিজের ঠোট নিজে কামড়াচ্ছে। আমি ইচ্ছে করে তার দিকে মোটেই দেখছি না। অন্যান্য বন্ধুদের স্ত্রীরা তার এই অবস্থা দেখে বেশ মজা উপভোগ করছে আর মুচ্‌কী মুচ্‌কী হাঁসছে।

এদিকে মঞ্চে চল্‌ছে-নায়িকার পিতা-মাতার অমতে ও অজ্ঞাতে নায়কের এক বন্ধুর বাসায়—একান্ত সব বন্ধু-বান্ধবীদের উপস্থিতিতে বিবাহ অনুষ্ঠান। মোল্লার স্থলে পুরোহিত ব্রাক্ষ্মণ, বাদ্য-বাজনা, উলু-ধ্বনী শাঁক-শানাই বাজিতেছে। সর্ব শেষে সাত পাক ঘুরে সাত বার বরের গলে মাল্য দান চল্‌ছে। এই দৃশ্য পুতুলের মার সহ্য হল না। তৃতীয় বার মাল্য দানের আগেই তিনি আসন ছেড়ে উঠে দাড়ালেন। বুকের কলিজায় বাজছিল ইসলামী রীতির এক, দুই, তিন তালাকের অশুভ মর্ম ব্যাথার ধ্বনী। দুই হাতে ছেলে-মেয়েদের ধরে টেনে হেচ্‌ড়ে গট্‌ গট্‌ করে তিনি হল থেকে বের হয়ে গেলেন। তার যাওয়ার দৃশ্যটা এতই প্রকট রূপ ধারণ করে যে হলের দর্শকরা এক সাথে দুইটা দৃশ্য দেখে যুগপত-আনন্দ লাভ করে।

বাসায় গিয়ে তার গুমট রাগটা প্রকাশ হওয়ার ক্ষেত্র পেল। প্রথমে আমার উদ্দেশ্যে নানা প্রকার মন্তব্য করে ক্ষোভ প্রকাশ করল, দিল সুললিত কণ্ঠে গালি গালাজ, তার পর মঞ্চের-নায়িকার উদ্দেশ্যে 'খানকি' 'বেশ্যা' হারামজাদী ইত্যাদি অশ্লীল মন্দ বাক্য, তার পর স্বামীকে জব্দ করার জন্য দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লেন।

সাধারণতঃ থিয়েটারের পর শিল্পীরা খানা পিনা করে থাকে। মকবুল ভাই ও খানা খেয়ে বাসায় ফেরার সময় আমায় ডাকলেন। আমি বললাম আপনি যান। আমি পরে আসছি। বাসায় গিয়ে অল্প কিছু ক্ষণ পরই মকবুল ভাই ক্লাবে ফিরে এসে বললেন-কি জানি আজ কি হয়েছে? পুতুলের মা কিছুতেই দরজা খুলে দিলনা, আর বলে কি, "মঞ্চে যার সাথে বিয়ে হয়েছে, তার ঘরে গিয়ে ঘুমাও।" আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি "পুতুলের মা কি করে জানলো আজকের মঞ্চের কথা? তারতো জানার কথা নয়।"

মকবুল ভাই এর মানসিক অবস্থা বুঝে আমি বললাম মাফ করবেন মকবুল ভাই, ঘটনাটা আমিই–একটু রগড় করার জন্য ঘঠিয়েছি। পুতুলের মা সহ সকলকে আমি থিয়েটারে নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু তার পরিণতি এত দূর গড়াবে তা ভাবতে পারিনি।

সত্যিই ভদ্র মহিলার জন্য আন্তরিক দুঃখ পাই, তিনি এতই আনাড়ী, সরল ছিলেন যে মঞ্চের অভিনয়কে সত্যিকার বিয়ে ধরে নিয়ে আপন মনে দুঃখ পাচ্ছিলেন। এ জাতের মেয়েরা বড়ই খুত খুতে স্বভাবের হয়, আর তিলকে তাল ভেবে চুলকিয়ে ঘা সৃষ্টি করে সারা জীবন অনুতাপের আগুনে জ্বলে পুড়ে মরে। দগ্ধ হয়।

নজীর বিহীন নেতৃত্বের খায়েশ

১৯৬৬ সালের মাঝা মাঝি সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবৃন্দ সর্ব কমরেড মনি সিংহ, খোকা রায়, নেপাল নাগ, অনিল মুখার্জ্জি, আবদুস সামাদ (বারীন দত্ত) সুখেন্দু দস্তিদার, সহিদুল্লা কায়সার, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, চৌধুরী হারুনর রশিদ এবং অপর একজন আপোষে পার্টিকে বিভক্ত করে নিলেন। একদিকে চীনা পন্থী মোহাম্মদ তোয়াহা, সুখেন্দু দস্তিদার অপর দিকে বাকী নয় জন মস্কো পন্থী।

মোহাম্মদ তোয়াহা ও সুখেন্দু দস্তিদার মস্কো পন্থীদের আড্ডা থেকে বের হয়ে আর চার জন কমরেডকে সাথে করে একটি সাংগঠনিক কমিটি

গঠন করেন ; তাঁরা হলেন সর্ব কমরেড আবদুল হক, নজরুল ইসলাম, সিলেটের জনৈক দাদা এবং হাবিবুর রহমান (টাকু)।

এ সময়ে সমস্ত পূর্ব পাকিস্তানের পার্টি সদস্য ও সমর্থকরা দুইভাগে বিভক্ত হয়ে যায়—মস্কো ও পিকিং পন্থী নামে। এর পূর্বে ভাগ হয় ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া ও মেনন গ্রুপ) ও ভাসানী ন্যাপ (ভাসানী ও মোজাফর গ্রুপ)। কিন্তু মস্কো পন্থীরা সর্বত্র সংগঠিত ছিল। পিকিং পন্থীরা ছিল বিক্ষিপ্ত ও অসংগঠিত। বিশেষ করে সিলেট, ময়মনসিংহ ঢাকা থেকে শুরু করে পাবনা ছাড়া সমগ্র উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গ।

এক মাত্র চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও কুমিল্লা জিলায়-পিকিং পন্থীরা শক্তিশালী ছিল। ছিল সংগঠিত। তৎসত্বেও কেন্দ্রের ন্যায় জেলা পর্য্যায়ে পুরাতন নেতৃত্বের বড় অংশ ছিল মস্কোদের সাথে।

এই সময়ে অর্থাৎ মস্কো-পিকিং ভাগা-ভাগীর শুরুতে জেলা পর্য্যায়ে যারা পিকিং পন্থী হিসেবে নিজেদের ঘোষণা দিয়েছিলেন-তাদের নাম বিশেষ ভাবে স্মরণীয় তাঁরা হলেন ঃ-

১। চট্টগ্রাম – সর্ব কমরেড ঃ-আবুল বাশার, আবদুল মালেক, মনীন্দ্র মহাজন, ইছাক ভূইয়া, শরদিন্দু মিত্র (মন্টু মিত্র) লুৎফুল হক মজুমদার, এ, টি, এম নিজাম উদ্দীন, জামালউদ্দিন, বদিউল আলম। শুধাংশু বিমল দত্ত, আরতী দত্ত শরদিন্দু দস্তিদার, অধ্যাপক আসাব উদ্দীন আহমদ। এই সময়ে চট্টগ্রামের নেতৃস্থানীয় যারা মস্কো পন্থী হিসেবে নিজেদের ঘোষণা দিয়েছিলেন তারা হলেন ঃ- সর্ব কমরেড অমর সেন, আবদুস ছত্তার, অনঙ্গ সেন, পুর্ণেন্দু কানুনগো, চৌধুরী হারুনর রশিদ, সামসুদ্দীন, ও আহমদুর রহমান আজমী।

শ্রমিক নেতাদের মধ্যে যারা মস্কো পন্থী ছিলেন তারা হলেন এম, এস হক, ইব্রাহিম মণ্ডল. এম আর ভূইয়া, জাফর মিস্ত্রী, নুরজ্জামান চৌধুরী, এম ইউ সিকদার, আহছান উল্লা চৌধুরী, আবুল কালাম, মোজাফফর আহমদ, হামিদুর রহমান, নুরুল আমীন, মন্নান সিকদার প্রমুখ।

২। নোয়াখালী ঃ—সর্ব কমঃ নুরুল হক চৌধুরী, ডাক্তার আবুল খায়ের, নীল মনি কবিরাজ, ডাক্তার নিজাম, হরিমোহন দাস ওরফে অভয় দাস (চট্টগ্রামের অধীবাসী) এরা ছিলেন চীন পন্থী।

৩। কুমিল্লা জিলা :—চীন পন্থী ছিলেন সর্ব কমঃ নাছির উদ্দীন ভূইয়া, হায়াতুন নবী, আবদুর রউফ, ছিদ্দিক উল্লা, তোতা মিঞা, অধ্যাপক আবদুল মোমেন, ডাক্তার চণ্ডিচরণ চক্রবর্তী, ডাক্তার জে, আমীন, মোঃ মুছা প্রমুখ, পরবর্তীকালে সুভাস ভৌমিক, আবদুস ছালাম।

৪। ঢাকা জিলা :—সর্ব কমঃ আনোয়ার জাহিদ, নূরুল হুদা কাদের বক্স, ছালাহউদ্দীন মাহমুদ, রসিদ আহমদ, হাবিবুর রহমান অধ্যাপক—ননী গোপাল দত্ত।

ঢাকার শ্রমিকদের মধ্য ছিল কমরেড শফিকুর রহমান মজুমদার, মার্শাল শিরাজ, এবং প্রতাপ উদ্দীন। সাংবাদিকদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ছিলেন—কমঃ শিরাজুল হোসেন খান, ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন—কাজী জাফর, রাশেদ খান মেনন, হায়দার আকবর খান (রাণো) মাহবুব উল্লাহ ও আবুল কাশেম ফজলুল হক।

৫। পাবনা জিলা ঃ— আবদুল মতিন, আলাউদ্দীন, আবদুস ছামাদ, আতিয়ার রহমান, আহাদ আলী, ফজলুল রহমান, হাছান মোল্লা, এবং তারা মিঞা (মনিরুজ্জামান}।

(আপোষে) পার্টি বিভক্ত হওয়ায় একটি বিষয়ে সুবিধা হল এই যে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় গিয়ে পার্টি সংগঠন করার ক্ষেত্রে কোন প্রকার "ঘেরা-বেড়া" রইলনা, যা মনিসিংহ এণ্ড কোম্পানীরা নিজেদের অযোগ্যতা ঢেকে রাখার জন্য প্রায়ই করতেন যদিও নিয়ম শৃঙ্খলার নামে।

এই পরিবেশে সারা দেশ জুড়ে চীন পন্থিদের মধ্যে যেন একটা পাহাড়ী ঢলের স্রোত বয়ে চললো। বন্ধন মুক্ত হয়ে কর্মীরা চারিদিকে ছুটা ছুটি করে পার্টিকে সংগঠিত করার কাজে নামলো।

সকলেই মনের আনন্দে মূলতঃ ঢাকাকে কেন্দ্র করে পরস্পরের মধ্যে চেনা জানা ও ঘনিষ্টতা শুরু হয়ে গেল। এ সময়ে চিন্তার জগতে খুবই নিকটবর্তী হওয়া গেল কমঃ মতিন, আলাউদ্দীন, আনোয়ার জাহিদ ও নরুল হুদা মির্জ্জার সাথে।

কেন্দ্রীয় কমিটির মধ্যে (যুক্তপার্টি) মোহাম্মদ তোয়াহা ও সুখেন্দ দস্তিদার যে চীনা পন্থী এই কথা আগে তেমন কেহ জানতো না। তারা সব সময় মনিসিংহদের লেজুর হিসেবে কাজ করে এসেছে। কেবল মাত্র ৬৬ সালের প্রথম দিকে তারা 'খালেদ বশীরের' নামে একটি দলিল

প্রকাশ করে। তাও আবার কেবল মাত্র আন্তর্জাতিক প্রশ্নের উপর। জাতীয় ক্ষেত্রে কোন দ্বিমত তারা ঐ দলিলে উথ্থাপন করেনি। ঐ দলিলের মধ্যে দিয়ে তারা ব্যাপক কর্মীদের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পায়।

প্রথম দিকে তাদের চীনা পন্থী কর্মীরা আন্তরিক ভাবেই গ্রহণ করে নেয়। পরে যখন জানা জানি হল সম্ভাব্য পার্টি সংগঠনের নেতৃত্বকে নিজেদের কুক্ষিগর্ত করে রাখার সংকীর্ণতা, তখন সারা দেশের চীনা পন্থী কর্মীদের মধ্যে একটা চাপা ক্ষোভ বিক্ষোভ আকারে প্রকাশ পেল। সেই চাপা বিক্ষোভের মুখেপড়ে তারা বাধ্য হল, দেবেন সিকদার ও আলাউদ্দীন সাহেবকে কেন্দ্রীয় কমিটির সংগঠক নিযুক্ত করতে। সে সময়কার কমরেড 'খালেদ–বশীর,' আবদুল হক ও শরদিন্দু দস্তিদার ইত্যাদির প্রতিটি পদক্ষেপ গুলি দেখা দিল "গায়ে মানে না আপনি মোড়ল" ধরণের। কারণ তৎকালে সারা পূর্ব পাকিস্তানে যত জন চীনা পন্থী ছিল তার শত করা ৫ জনের সাথে তাদের পরিচিতি ও সংযোগ ছিল না।

এই পরিস্থিতি ও পরিবেশে বেশ কিছু ঝুকি নিয়ে গোপনে–আধা গোপন ও আধা প্রকাশ্যে সারা দেশময় যোগাযোগ করে চীনা পন্থী * কমিউনিস্ট পার্টির একটি কেন্দ্র গড়ে তোলার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হল।

মাত্র তিন মাসের চেষ্টায় চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, কুমিল্লা, ঢাকা, পাবনা জিলায় জেলা সাংগঠনিক কমিটির ভিত রচিত হল।

এ সময়ে প্রধানতঃ কমঃ মতিন ও আলাউদ্দীনের প্রচেষ্টায় কুষ্টিয়া, যশোর, বগুড়া ও রাজশাহীতে পার্টি গঠনের প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন হয়।

১৯৬৮ সালের মে জুন মাসের দিকে আহবান করা হল চীনা পন্থীদের পার্টি কংগ্রেস। স্থান মনোনীত হয় তৎকালীন ভাসানী ন্যাপের কোষাধ্যক্ষ জনাব ছায়দুল হাছান সাহেবের সিলেটের এক চা বাগানে। সময় নিদ্ধারিত হয়— পাঁচ দিন। যাতে করে ব্যাপক আলোচনার মাধ্যমে

---

* পরবর্তী কালে ১৯৭১ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে, মহানচীনের কমিউনিস্ট পার্টি ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের মধ্যে সঠিক উপলব্ধি জন্মে, কোন একটি দেশের বা পার্টির পন্থী হওয়া সাঠিক মার্ক্সবাদীনীতি নহে।

সঠিক নীতি আদর্শ গ্রহণ করা যায়। যত দূর মনে পরে নিম্ন লিখিত কমরেডগণ উক্ত চীনা পন্থী পার্টির প্রথম কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন।

সর্ব কমরেড্ সুখেন্দু দস্তিদার, মোহমদ তোয়াহা, আবদুল হক, নজরুল ইসলাম (খুলনা) জনৈক ডাক্তার (খুলনা) হেমন্তদা (যশোর) ইদ্রিছ লোহানী (রংপুর) আবদুল মতীন ও আলাউদ্দীন (পাবনা) হাবিবুর রহমান, আনোয়ার জাহীদ, নূরুল হুদা কাদের বক্স (ঢাকা), অজয় ভট্টাচার্য্য, ও জনৈক দাদা, (সিলেট) নাসীর উদ্দীন ভূইয়া (লাকসাম) অধ্যাপক আবদুল মোমেন (বিঃ বাড়িয়া) নুরুল হক চৌধুরী (মেহেদী) ডাক্তার আবুল খায়ের (নোয়াখালী) শরদিন্দু দস্তিদার, শুধাংশু বিমল দত্ত, আবুল বাশার এবং দেবেন সিকদার। (চট্টগ্রাম)।

স্মরণ যোগ্য যে তৎকালে-ছাত্র ফ্রন্টের বিশিষ্ট কর্মী কাজী জাফর ও হায়দর আকবর খান (রণো) পার্টি কংগ্রেসে যোগদান করতে পারলেন না যেহেতু তারা পার্টি সদস্য ছিলেন না; কারণ মস্কোপন্থী পার্টি এবং চীনা পন্থী ঢাকা জিলা কমিটি উপদলীয় চক্রান্ত করে এবং উপদলীয় চক্রান্ত কারী এই অজুহাতে তাদেরে পার্টি সদস্য পদ দেননি।

দ্বিতীয়তঃ কমঃ নূরুল হুদা কাদের বক্স এবং অধ্যাপক আছাব উদ্দীন ছিলেন ভাসানী ন্যাপের মধ্যেকার বিশিষ্ট কর্মী হিসেবে কংগ্রেসের বিশেষ মনোনীত প্রতিনিধি। কমঃ আছাব উদ্দীনের বিকল্প প্রতিনিধি ছিলেন কমরেড আবুল বাশার।

কংগ্রেসের শুরুতে তিনটি পরস্পর বিরোধী পৃথক রাজনৈতিক লাইনের উপর বক্তব্য হাজির করা হয়।

প্রথম বক্তব্য ছিল অফিসিয়েল অর্থাৎ কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক লিখিত ছয় জনের অভিমত (খালেদ, বশীর, নজরুল, হাবিবুর, হক ও সিলেটের জনৈক দাদা)

এই বক্তব্যটি সাইক্লো করে কংগ্রেসের তিন মাস পুর্বে মতামত সংগ্রহের জন্য প্রচারে দেওয়া হয়। এবং চীনা পন্থী পার্টির সবগুলি জেলা সাংগঠনিক কমিটি কর্তৃক বাতিল হয়ে যায়। দলিলটির মূল বক্তব্য ছিল—পাকিস্তান ভিত্তিক জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব। এই প্রস্তাবে পাকিস্তানের

অখণ্ডতা রক্ষা করে পাকিস্তানের দুই অংশে জনগণের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা বলা হয়।

দ্বিতীয় বক্তব্যটি আসে অনাহুতভাবে। কমঃ মতীন ও আলাউদ্দীন কংগ্রেসের কয়েক মাস পূর্বে 'কৃষিতে ধনতন্ত্র' মুল্যায়ন করে পূর্ব পাকিস্তানে ও পাকিস্তানের উভয় অংশে কৃষি বিপ্লবের অবস্থা রয়েছে এই মর্মে এক পুস্তিকা ছাপিয়ে প্রকাশ করেছিল।

কিন্তু তারা ঐ বক্তব্য কংগ্রেসে উপস্থিত করেননি, তৎসত্ত্বেও ঐ বক্তব্যের সমালোচনা কংগ্রেসে উপস্থিত করা হয়। এই পুস্তিকার কোথাও পাকিস্তান রাষ্ট্রের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থার রাজনৈতিক মূল্যায়ন ছিল না।

তৃতীয় প্রস্তাবটি হাজির করেছিলেন দেবেন সিকদার, সর্ব প্রথম সমর্থন করেছিলেন কমঃ আবুল বাশার ও নুরুল হক চৌধুরী। এই প্রস্তাবে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট ভাবে বলা হয়--

ক) দুই পৃথক ভূখণ্ডজনিত কারণে পাকিস্তান অবৈজ্ঞানিক রাষ্ট্র। ইহার অর্থনীতি এক নহে, দুই। এক রাষ্ট্রে দুই অর্থনীতি অচল।

খ) পাকিস্তানের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থা হল নয়া উপনিবেশিক আধা সামন্ততান্ত্রিক।

গ) পূর্ব পাকিস্তানে চলেছে পাকিস্তানের উপনিবেশ ধরনের শোষণ ঃ

ঘ) পূর্ব পাকিস্তানে ঘটাতে হবে 'জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব' তথা জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম।

ঙ) এই জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে পূর্ব বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টিকে। পূর্ব বাংলার ধনীক শ্রেণী ঐতিহাসিক ভাবে এই দায়িত্ব পালন করতে পারে না।

চ) বিপ্লবের সাফল্যের জন্য পাকিস্তান ভিত্তিক পার্টি না গড়ে পূর্ব বাংলা ভিত্তিক পার্টি গড়তে হবে।

ছ) বিপ্লবের চরিত্র হবে পূর্ব বাংলা ভিত্তিক জাতীয় তথা জনগণের গণতান্ত্রিক বিপ্লব। দীর্ঘ বির্তকের পর প্রথম লাইনটি প্রস্তাবকেরা প্রত্যাহার করে নিলেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, দ্বিতীয় লাইনটি প্রস্তাবাকারে আসেনি।

তৃতীয় লাইনটি তুমুল উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এই দিন ছিল পার্টি কংগ্রেসের তৃতীয় দিন। প্রতিনিধিদের হাতে সময় রয়েছে আর ও দুইটি দিন। সকলে মিলে ভাগ ভাগ হয়ে বসে ধীরে সুস্থে চিন্তা ভাবনা করছে যোগ্য নেতৃত্ব নির্ব্বাচন, এবং পার্টির নতুন নাম করণ নিয়ে। এমন সময় কংগ্রেস অধিবেশনের স্থান সংগ্রহের ভার প্রাপ্ত কমঃ আবদুল হক জরুরী ভিত্তিক (অসময়ে) অধিবেশন আহবান করে প্রস্তাব করলেন "কংগ্রেস অধিবেশনের গোপনীয়তা যে কোন কারণে ফাঁস হয়ে পড়েছে। অতএব, দুই ঘন্টার মধ্যে কংগ্রেস সমাপ্ত করে সকলকে আজকের রাতের মধ্যে এই স্থান ত্যাগ করে যেতে হবে"।

এরপর সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় সকলে বাধ্য হল, অত্যন্ত তাড়াহুড়ার মধ্যে কংগ্রেসের বাকী আলোচনা সমাপ্ত করতে।

কিন্তু পরবর্ত্তীকালে প্রমানিত হয়েছিল যে "ঐ গোপনীয়তা ফাঁস" কথাটি ছিল কমঃ হক ও তোয়াহা সাহেবের চক্রান্তমূলক কারসাজী।

কারণ বিশ্ব কমিউনিষ্ট আন্দোলন সংগঠনের ইতিহাসে সাধারণরীতি নিয়মের মধ্যে একটি জিনিষ রয়েছে যে কোন পার্টি কংগ্রেসে যে রণনীতি রণকৌশল দলিল গৃহীত হয়, তার প্রবক্তারা আগামী দিনের নেতৃত্বে নির্বাচিত হয়। যাদের লাইন ভুল বলে কংগ্রেস কতৃক বর্জন করা হয়, তার প্রবক্তারা আগামী দিনের নেতৃত্ব থেকে সরে দাড়ান বা বাদ পড়েন।

উপরোক্ত বিশ্বজনীন রীতি-নিয়মকে সামনে রেখে বিচার করলে আমাদের উক্ত পাটি কংগ্রেসে পরাজিত রাজনৈতিক লাইনের নেতারা কেহই নতুন কমিটির মূল নেতৃত্বে নির্বাচিত হতে পারে না। ধারা বাহিকতা রক্ষা করার জন্য দুই/এক জন হয়তো থাকতে পারতেন ; কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হয়ে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই নতুন কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও রাজনৈতিক ব্যুরোতে থাকতে পারে না।

কিন্তু এখানে ঘটনা ঘটলো তার বিপরীত। দুই দিনের কাজ দুই ঘন্টায় সমাপ্ত করতে গিয়ে প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে এক অংশ দাবী জানাল পুরাতন নেতৃত্বের নিকট "আপনারাই একটি পূর্ণাঙ্গ কমিটির প্রস্তাব পেশ করুন।" সে অনুসারে তারা প্রস্তাব পেশ করলো নিম্নরূপ ঃ

১। সুখেন্দু দস্তিদার ২। মোঃ তোয়াহা ৩। আবদুল হক ৪। অজয় ভট্টাচার্য্য ৫। দেবেন সিকদার ৬। আলাউদ্দীন ৭। শরদিন্দু দস্তিদার ৮। নজরুল ইসলাম ৯। হাবিবুর রহমান। এবং পরবর্ত্তী কালে সম্পাদক ও সম্পাদক মণ্ডলী বা পলিটবুরো নির্ব্বাচন করবেন নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটি। এই প্রস্তাবটি বিনা আলোচনাতেই (সমগ্রভাবে) পাশ হয়ে গেল।

এখানে বিশেষভাবে স্মরণ যোগ্য যে পরবর্ত্তীকালে প্রমাণিত হয়েছে উক্ত নয় জনের মধ্যে ৮ জনই ছিল (দেবেন সিকদার ছাড়া) পাকিস্তানের অখণ্ডতায় বিশ্বাসী। তারা কেহই কংগ্রেসে গৃহীত সর্ব্ব সম্মত সিদ্ধান্তকে (পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাঙ্গালী জাতির জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে নেতৃত্বদান করতে হবে পূর্ব বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টিকে) শ্রদ্ধা সহকারে কার্য্যকরী করতে এগিয়ে আসেনি। বরঞ্চ কেহ কেহ বিরোধিতা করেছে। ইহাই হল ঘটনা বা ইতিহাস।

এর পর নতুন পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম বৈঠকেই সংখ্যা গরিষ্ট ভোটে (৭--২ ভোট) কমঃ সুখেন্দু দস্তিদার সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং দস্তিদার, তোয়াহা এবং হককে নিয়ে গঠিত হয় সম্পাদকমণ্ডলী। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভোট দান করে—কমঃ আলাউদ্দীন ও দেবেন সিকদার।

উপরোক্ত ঘটনাটিকে ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে ধরে রাখার জন্যই এই রচনার নামকরণ করা হয়--

"নজীরবিহীন নেতৃত্বের খায়েস"

সূতাকল ধর্মঘট

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের প্রভাব পড়েছে দেশের সর্বত্র শ্রমিক কৃষক, আবাল বৃদ্ধ, বনিতার কর্মকাণ্ডে। অবিভক্ত বাংলার সাতটি সূতাকল পাকিস্তান তথা পূর্ব পাকিস্তানের ভাগে। কুষ্টিয়া জেলার মোহিনী মিল, ঢাকেশ্বরী ১, ২, ৩ নং, চিত্তরঞ্জন ১, ২, নং এবং চট্টগ্রামের ন্যাশনাল কটন মিল।

প্রধানতঃ শ্রমিক আন্দোলন সংগঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করে ১৯৫০ সাল থেকে আমি শহরে অবস্থান করতেছি। সবগুলি শিল্প কারখানায় (বিশেষ করে আমাদের নেতৃত্ব থেকে জনাব জহুর আহমদ চৌধুরীর কতৃত্বে নিয়ে যাওয়া সংগঠন গুলির পুনঃ উদ্ধারের জন্য) পার্টি প্রভাবিত শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলার কাজে মনোনিবেশ করেছি। তখনকার আমার মানসিক অবস্থা ছিল হারানো সংগঠন ও শক্তি ফিরে আনার জন্য একটা জেদ প্রতিনিয়ত মনের মধ্যে হাতুড়ির ঘা মারতেছিল। কারণ দেশ ভাগের পর উগ্র ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক জিগির ছেড়ে এবং সরকারী প্রশাসনিক ক্ষমতা ব্যবহার করে আমাদের বহু ত্যাগ তিতিক্ষায় গড়া ট্রেড ইউনিয়নগুলির নেতৃত্ব দখল করে নিয়েছিল প্রথমে মুসলিম লীগের –পরবর্তী কালে আওয়ামী মুসলিম লীগের চট্টগ্রাম জেলা নেতা জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী।

শ্রমিক আন্দোলন সংগঠন গড়া ও ঐ কাজে অনুপ্রবেশের কলা কৌশল আমার গতানুগতিক ধারায় ছিল না। স্থান কাল ও পাত্র ভিন্নতায় অর্থাৎ যেখানের বাস্তব অবস্থায় যা করার নির্দেশ করে, সেই বাস্তবতাকে ভিত্তি করে আমি এগিয়ে যেতাম। কোন একটি কল কারখানার বা অফিসে একজন মাত্র পরিচিত দরদী বা আগ্রহী লোক পেলেই ঐ প্রতিষ্ঠানে আমাদের অনুপ্রবেশ ছয় মাসের মধ্যে সুনিশ্চিত হয়ে দাড়ায়।

ইতিমধ্যে আমাদের নেতৃত্বের থেকে চলে যাওয়া ডক ইউনিয়নের সাথে সংযোগ প্রতিষ্ঠা হয়েছে আবদুর রহমান নামে নোয়াখালী জেলার একজন 'উচ্ ওয়ালার' মাধ্যমে। অল্প কিছু দিন পর আবদুল মতীন নামে সচেতন খিদিরপুর ডক প্রত্যাগত নোয়াখালী জেলার আর একজন শ্রমিকের সাথে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হয়। মতীন ভাই খিদিরপুরের মাক্সবাদী পার্টির সাথে যুক্ত ছিল। এই মতীন ভাই-এর মাধ্যমে চট্টগ্রাম ন্যাশনাল কটন মিলের শ্রমিকদের সাথে পরিচিত হই এবং ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে থাকি।

ন্যাশনাল কটন মিলে—১৯৪৪/৪৫ সালে ঢাকেশ্বরী সুতাকল ধর্মঘটে নেতৃত্ব দান কারী এবং জেলখাটা অভিজ্ঞ প্রাক্তন শ্রমিক নেতা কমঃ সতীশ ভদ্র ও সতীশ করের সাথে পরিচয় হয়।

এই ন্যাশনাল কটন মিলেও আমাদের উদ্দ্যোগ ও নেতৃত্বে ১৯৪৩/৪৫ সালে ইউনিয়ন গঠিত হয়েছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এই ইউনিয়নটি জহর আহমদ এবং ফয়েজ আহমদের নেতৃত্বে চলে যায়

এই সময়ে (৫২/৫৩ সালে) আমার কাজের পরিধি খুব ব্যাপক হয়। গুপ্তাখালী বার্মা অয়েল কোম্পানীর তেলের ডিপু হতে—পাহাড়তলী রেল ওয়ে ওয়ার্কসপ, রেলের হেড কোয়ার্টার (সি আর বি) থেকে কালুর ঘাট এ কে খান প্লাই উড ও ম্যাচ ফ্যাক্টরী পর্যন্ত বিস্তৃত। যোগাযোগ হয়েছে জেমস্‌ফিনলে, টানা মরিশন, ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জি ইত্যাদি সওদাগরী অফিসের ও ন্যাশনাল মারক্যান্টাইল ; লয়েডস ইত্যাদি ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের সাথে।

আরো একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে এই সময় আমার কর্মক্ষেত্রে অনেকগুলি বিচিত্র ঘটনা ঘটে। যে গুলির খুব সংক্ষিপ্ত বর্ণনা না দিলে আমি ইতিহাসের নিকট এবং নিজ বিবেকের নিকট দায়ী থেকে যাব।

প্রথমতঃ যার নাম উল্লেখ করতে হয়—তিনি হচ্ছেন ; বন্ধুবর রুক্মিনী কবিরাজ, বাড়ী হালি শহর, ইনি ছিলেন আমার চাকুরী জীবনের ব্যক্তিগত বন্ধু — হালি শহরে বাসস্থান তথা আশ্রয় স্থল খুজে দেওয়া থেকে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা, অর্থ সাহায্য ইত্যাদি সব বিষয়ে তিনি নীরবে সাহায্য করে গেছেন।

দ্বিতীয়তঃ—উত্তর হালি শহরের সাধুবাবা ও মাইজী। এই সাধুবাবা ছিলেন পাটি দরদী হোমিও ডাঃ নদীয়া বাসী নাথ এর পিতা। নদীয়া বাসী তখন সপরিবারে পাঠান টুলিতে থাকতেন। তার সাথে আমার পরিচয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কালে। সেই সুত্রে তার পিতা সাধুবাবার সাথে পরিচয়। সাধুবাবা এখন একলা বাড়ীতে মাতাজীকে নিয়ে থাকেন। আমি ডকে চাকরী করি এই পরিচয় দিয়ে তাদের সাথে থাকি ও খাই। একটা পৃথক কামরায় আমি থাকার সুযোগ পাই। বিনিময়ে দিতাম দৈনিক একটাকা খানা খরচ, আট আনা ঘর ভাড়া, আট আনা বাবা মাইজীর সিদ্ধি খরচ (গাজার দাম)

এই আশ্রয় স্থলটি আমার দুই তিন বৎসর কাল যাবৎ অতীব নিরাপদ ছিল। আজ লিখতে গিয়ে দুঃখ ও বেদনায় হৃদয় মুসরে যাচ্ছে-

১৯৫৩ সালের দিকে এক সাম্প্রদায়িক গোলযোগের সুযোগে সাধু বাবাকে হত্যা করা হয় তারই বাড়ীর আঙ্গিনায়।

তৃতীয় স্তরে যাদের নাম উল্লেখ করতে হয়- এল, এম, ডি নামে এক সওদাগরী ফার্মে চাকুরীরত শান্তি ও টগর নামে দুই ভ্রাতা। যাদের রহমতগঞ্জ বাসায় ১৯৩০ সালে আমি তাদেরই দেখা শুনার কাজে মাসিক এক টাকা বেতনে চাকুরী করেছি।

সেই শান্তি ও টগরের নেতৃত্বে এই অফিসে ইউনিয়ন গঠিত হয়েছে এবং তারা তখন তাদেরই শৈশবের চাকরের নেতৃত্বে রাজনীতিতে হাতে খড়ি গ্রহন করছে অত্যন্ত সহজ সরল মনে।

জেমজ ফিন্‌লেতে যার মাধ্যমে প্রবেশ করি তিনি হলেন আমার বাল্য জীবনের ঐ অফিসে কর্মরত সাথী বন্ধুবর জাফর ও এখলাস। ১৯৩০-৩১ সালে আমার সাথে তারাও ঐ অফিসে পাঙ্খাবয় এর চাকুরী করতেন। দ্বিতীয় স্তরে যার নাম স্মরণ যোগ্য তিনি হলেন বন্ধুবর মনোরঞ্জন সেন। প্রথম জীবনে রাঙ্গুনিয়ায় স্কুল মাষ্টার, পরবর্তী কালে এই অফিসের কেরানী। তারই মাধ্যমে বাবু নরেন্দ্র শীল তার মাধ্যমে কমঃ আবদুল মালেক এর সাথে সংযোগ। পরবর্ত্তী কালে খোরসেদ আলম। টানা মরিশনে ছিলেন কমঃ মলিন ঘোষ। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করতেন কমঃ কালি কিঙ্কর দে, সাইফুদ্দীন খান, কমঃ জাকের আহমদ, মিঃ কাজমী, কমঃ মোজাফফর, হামিদ ভাই ও কমঃ আজীম। এদের প্রত্যেকের ত্যাগ ও অবদান এবং শ্রম ভাষায় প্রকাশ করা সধ্যাতীত।

শুরু হল এই পরিবেশে ন্যাশান্যাল কটন মিলে ইউনিয়নের মধ্যে নিজেদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার আপ্রাণ প্রচেষ্টা। এখানের বর্ত্তমান ইউনিয়নের নেতা হল কেন্দ্রীয় সভাপতি মিঃ ফয়েজ আহমদ, স্থানীয় শাখার সভাপতি জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী।

কমরেড সতীশ ভদ্র দেখতে অনেকটা লিলিপুট ধরণের। স্বাভাবিক গতরের চেয়েও বেটে খাটো মানুষ। দেহের উপরি ভাগ হ্যাংলা পাতলা, হাটার ধরণ ঠিক পায়ে ভর করে নয়, যেন ঘোড়া চড়ে চলছে। গলার স্বর বেশ মোটা ও গম্ভীর। বুদ্ধি দীপ্ত চেহারা, সাহসী মন ও মেজাজ,

স্পষ্টভাষী অথচ বিনয়ী, পরিশ্রমী শ্রমিক। বলা চলে শ্রমিক শ্রেণী যোগ্য অগ্রবাহিনীর অগ্রদূত। ১৯৪৪/৪৫ সালের ঢাকেশ্বরী সুতাকল ধর্মঘটে চাকুরী হারায় ও জেল খাটে। স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে ৬ জনের পরিবার। এক মাত্র সম্বল চাকুরী। জেল খাটা অবস্থায় ও পরবর্ত্তী কালে বেকার জীবনে ভীষণ কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। কাজেই এখন "ঘর পোড়া গরুর ন্যায় সিন্দুরে মেঘের আভাস পেলে ভয় পায়"। তাই এখন হিসেব নিকেশ করে কথা বলে—কাজ করে।

পরবর্তীকালে অনেক তদবীর করে, তৎকালীন ঢাকেশ্বরী মিলে যারা সতীশ ভদ্রের জুনিয়ার ছিল তারা এখানে (২/১ জন) পদস্থ কর্মচারী; তাদেরই সাহায্যে এখানের ফিনিসিং বিভাগে সতীশ ভদ্রের চাকুরী হয়। এই শর্তে যে এখানে তিনি দুই/এক বছর শ্রমিক আন্দোলনের সাথে জড়িত হবেন না। বর্তমানে সেই সময় কাল প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তারপর পূরাতন অভিজ্ঞতা থেকে কথা এসে যায়—আন্দোলন সংগঠন করা হয় সমষ্ঠির স্বার্থে ও প্রয়োজনে। অথচ মামলায় জড়ালে, জেলে যেতে হলে সব দায়িত্ব বর্তায় নিজের ও নিজ পরিবারের উপর। "শ্রমিকদের চেতনার মান উন্নত না হলে, আমার পক্ষে শ্রমিক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়া বর্তমান অবস্থায় সম্ভব নয়।" কথাগুলি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বললেন কমঃ সতীশ ভদ্র।

এ সময়ে আমাদের পার্টির চট্টগ্রাম জেলা কমিটির অবস্থা মোটামোটি ভাল। ১২/১৪ জন সর্বক্ষণের ভাতাধারী কর্মী আনুসাঙ্গিক অন্যান্য খরচ নির্বাহ করে উৎবৃত্ত না থাকলেও স্বয়ংসম্পূর্ণ বলা চলে।

সব দিক হিসাব নিকাশ করে দেখলাম কমঃ সতীশ ভদ্রের ন্যায় শ্রমিক আন্দোলনে অভিজ্ঞ লোক না হলে ফয়েজ আহমদ ও জহুর আহমদ এর ন্যায় জাঁদরেল দালাল শ্রমিক নেতাদের সাথে পাল্লা দিয়ে প্রতিযোগিতায় নামা যায় না।

আমি ডকে উচওয়ালার * চাকুরী করি। কলকাতার খিদিরপুর ডকের পুরাতন শ্রমিক এই পরিচয় দিয়ে ন্যাশান্যাল কটন মিলে নিয়মিত যাতায়াত করছি।

---

* উচ্ হচ্ছে জাহাজে স্থাপিত ক্রেনের নাম। ইহা স্থানীয় প্রচলিত শব্দ।

কমঃ সতীশ ভদ্রের সাথে অন্তরঙ্গ পরিবেশে আলাপ হল। পার্টি জেলা কমিটির তহবিল আগামী ২/৪ বছরের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রতিশ্রুতি দিলাম চাকরী চলে গেলে বা জেলে যেতে হলে আপনার পারিবারিক দায়িত্ব পার্টির উপরে রইল। এর পর তিনি আশ্বস্থ হয়ে নিশ্চিন্ত মনে কাজে নামলেন।

এ'সময় আমি বাসা নিয়ে ছিলাম হালিশহর গ্রামে। মাসিক তিন টাকা ভাড়ায় ছোট একটি কাঁচা ঘর। ন্যাশানাল কটন মিল থেকে মাইল খানেক দূরে। প্রায় প্রতিদিন কর্মী সভা অনষ্ঠিত হত—সুতাকলের। বেশীর ভাগ শ্রমিক ঢাকেশ্বরী সুতাকলের অভিজ্ঞ শ্রমিক। নতুন শ্রমিকেরা কার্যরত ওয়ার্কসপ, বিদ্যুৎ ও সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্টে। এরা বেশীর ভাগ স্থানীয়। শ্রমিক আন্দোলনের কোন অভিজ্ঞতা এদের নেই। এদের সচেতন করা ও পক্ষে পাওয়ার জন্য ৫/৬ জনের উপর বিশেষ দায়িত্ব অর্পন করা হল। কেননা যে কোন ইউনিয়নের নেতৃত্বে স্থানীয় শ্রমিকদেয় পাওয়া না গেলে শ্রমিক আন্দোলন সংগঠন দুর্বল থেকে যায়। তখন তাদের এক অংশ হয়ে দাড়ায় দালাল, সুবিধাবাদী।

প্রথমে ইউনিয়নের স্থানীয় শাখার নির্বাচন দিয়ে সর্ব সম্মতভাবে সভাপতির পদ থেকে জহুর আহমদকে অপসারণ করা হল। তার পরিবর্তে স্থানীয় একজন মিস্ত্রীকে সভাপতির পদে এবং সতীশ ভদ্রকে সম্পাদক পদে নির্বাচিত করা হল। এর ফলে শ্রমিকদের মাঝে সংগ্রামী মনোবল বাড়তে লাগল।

এই ঘটনার পর থেকে গোয়েন্দাদের তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। সামনে সতীশ ভদ্রসহ নতুন কর্মীরা রয়েছে। মাঝে মধ্যে গিয়ে কাজগুলি তদারক করলেই চলে। ফলে গোয়েন্দা পুলিশের দল তেমন কোন সঠিক সূত্র খুঁজে পেলনা।

তৎসত্তেও সমগ্র চট্টগ্রামের শ্রমিক আন্দোলন সংগঠনের মূল সূত্র যে দিবেন সিকদার এই কথা তারা ভাল করেই জানত।

দাবীনামা দেওয়ার সপ্তাখানেক পর হটাৎ করে নারায়নগঞ্জ থেকে জনাব ফয়েজ আহমদ (তিনি সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান সুতাকল ইউনিয়নের সভাপতি) টেলিগ্রাম পাঠালেন মিলের ম্যানাজারের মাধ্যমে– সম্পাদক

ও সভাপতিকে নারায়ণগঞ্জে প্যঠানোর জন্য। উপলক্ষ ত্রিপক্ষীয় আলোচনার (লেবার ডিপার্ট, মালিক ও শ্রমিক পক্ষ) জন্য। টেলিগ্রাম পেয়ে ইউনিয়নের সভা ডেকে তাদের পাঠানো হল। তখন কেহ ধারণাই করতে পারেনি যে এর মধ্যে রয়েছে গভীর চক্রান্ত। মিল কর্তৃপক্ষও তাদের সবেতন ছুটি মঞ্জুর করলেন।

ত্রিপক্ষীয় বৈঠকে যাবার পর সকলে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। তৃতীয় দিনের দিন সকাল বেলা সভাপতি সাহেব একা ফিরে এসে জানালেন কমঃ সতীশ ভদ্র গ্রেপ্তার হয়েছেন।

আসলে ত্রিপক্ষীয় সভা ছিলনা। সম্পূর্ণ ষড়যন্ত্র করে, গোয়েন্দা বিভাগের সাথে যোগসাজশে মিথ্যা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে সতীশ ভদ্রকে ডেকে নিয়ে গ্রেফতার করা হয়। কারণ এখানে (চট্টগ্রামে) গ্রেফতার করার সাহস তাদের ছিলনা।

খবরের সাথে সাথে বারুদের স্তূপে আগুন লাগার ন্যায় ঘটনা ঘঠে গেল। স্বতস্ফূর্ত ভাবে মিল বন্ধ হয়ে গেল। রাতে সংগ্রাম কমিটির বৈঠক ডাকা হল। তহবিল সংগ্রহের ডাক দেওয়া হল। এক দিনের বেতন। অভিজ্ঞ শ্রমিকেরা কমিটিতে না থেকেও বুদ্ধি পরামর্শ দিতে লাগলেন। সেচ্ছা সেবকগণ মিলের পূর্ণ কতৃত্ব গ্রহন করলেন। এমন কি মিলের ম্যানাজার-অফিসার পর্যন্ত মিলে প্রবেশ করতে হলে সেচ্ছা সেবকদের নিকট থেকে গেইট পাশ নিতে হবে।

গ্রেপ্তারের ২য় দিন সতীশ ভদ্রকে চট্টগ্রামে নিয়ে এসে ৩য় দিন কোর্টে হাজির করা হল। তার জন্য জামিনের দরখাস্ত করা হল। তখন জানা গেল সতীশ ভদ্রকে রাজনৈতিক কারণে বিনা বিচারে আটক রাখা হয়েছে। ঐ দিন ১৩/১৪ শত শ্রমিক ৮ মাইল পায়ে হেটে মিছিল ও বিক্ষোভ সহকারে চট্টগ্রাম কোর্টে হাজির হয়েছিল সতীশ ভদ্রের মুক্তির দাবীতে।

পরের দিন মিল ম্যানাজার এক ইস্তাহার দিয়ে জানিয়ে দিল যে সতীশ ভদ্রের গ্রেপ্তারের জন্য তারা আন্তরিক ভাবে দুঃখিত এবং তার মুক্তির বিষয়ে মিল কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের সাথে সর্ব বিষয়ে সহযোগীতায়

প্রস্তুত। অতএব শ্রমিকগন যাতে অযথা ভাবে মিল কর্তৃপক্ষকে এর সাথে জড়িত না করে, সকলে যেন অবিলম্বে কাজে যোগদান করে।

এই ইস্তাহার বের হওয়ার পর এবং বিনা বিচারে আটক করে রাজবন্দী হিসেব ঘোষণা শুনে সতীশ ভদ্রের মুক্তির জন্য অনির্দিষ্ট কালের ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়া চলে না। কারণ একটি কারখানার শ্রমিকেরা দীর্ঘস্থায়ী ধর্মঘট করে পাক সরকারের ঐ বে-আইনী আইন রদ করতে পারে না। বর্তমানে এই ধর্মঘটের চরিত্র হচ্ছে রাজনৈতিক, রাজনৈতিক ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়ার মত রাজনৈতিক চেতনা অধিকাংশ শ্রমিকের এখনও আসেনি।

পার্টির নিকট আমি জরুরী বৈঠক দাবী করলাম এই বিষয়ে অলোচনার জন্য। এই ধর্মঘট এখনই প্রত্যাহার করে অক্ষত অবস্থায় শক্তি সামর্থ নিয়ে পশ্চাদপসরণ করা উচিত। পার্টির জেলা কমিটি এ বিষয়ে ঐক্য মত পোষণ করলেন।

ধর্মঘটে যাওয়া যত সহজ কাজ তার চেয়ে হাজার গুন বেশী কঠিন কাজ হল অক্ষত অবস্থায় পেছনে সরে আসা।

এই জন্যে সর্বাগ্রে ইউনিয়নের নেতা ও সংগ্রাম কমিটিকে বুঝানো উচিত। এই উদ্দেশ্যে মিলের বাইরে মাইল খানেক দুরে গলি রাস্তার ধারে এক শ্রমিকের বাসায় নেতৃস্থানীয়দের নিয়ে এক আলোচনা সভায় বসলাম। চারি দিকে গোয়েন্দা পুলিশের লোকজন সাদা পোষাকে কিল বিল করে ঘুরছে। ঘন্টা দুই মিটিং চলার পর দুইজন সন্দেহ জনক লোক আমাদের সামনের গলি দিয়ে কিছু দূর গিয়ে পুণঃ দ্রুত কারণ পেছনের দিকে ফিরে গেল। কেবল মাত্র আমিই তাদের দেখতে পেয়েছি, বাকীদের বসানো হয়েছে রাস্তাকে পেছন করে।

এর পর দুই তিনজনকে ইঙ্গিত দিয়ে বললাম আর সভা-চালানো যায় না। এই রইল দিদ্ধান্ত-২/১ দিনের মধ্যে সবাইকে 'বুঝিয়ে শুনিয়ে' ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নিতে হবে।

বৈঠক শেষ করে আমি দ্রুতপায়ে নদীর দিকে এগিয়ে গেলাম। নদীর তীর ৫/৭ মিনিটের রাস্তা। বাসার মালিককে বলে গেলাম, তোমাকে

যদি কেহ কিছু জিজ্ঞেস করে—তাহলে বলে দিও যারা এসেছিল তারা তোমার ডিপার্টমেন্টের লোক। ধর্মঘট চলছে বলে কোন কাজ কর্ম নেই ; তাই তারা বেড়াতে এসেছিল। এই স্থানের অবস্থা বুঝা ও জানার জন্য আমাদের এক জন সচেতন শ্রমিকের উপর দায়িত্ব দিয়ে এসেছিলাম।

ঘন্টা খানেক পর খবর পাওয়া গেল। আমরা চলে আসার ৫/৭ মিনিট পর জীপেকরে ১০/১২ জন লোক হাজীর হয়। ওরা সাদা পোষাক হলেও রিভলবার পিস্তল সহ সশস্ত্র ছিল। ঘটনা স্থলে আমাকে ও অন্য কাহাকেও না পেয়ে এদিক ওদিক ছুটা ছুটি করে দেখতে লাগল। শেষ পর্য্যন্ত তারা যখন নদীর তীরে খুজতে আসে তখন আমি একটি সাম্পান (নৌকা) ভাড়া করে নদীর মাঝখানে পৌঁছে আরও দশটি নৌকার যাত্রীদের সাথে মিশে একাকার হয়ে আছি।

শেষ পরিনতি ঃ

এই ধর্মঘট কিছুতেই প্রত্যাহার করা গেল না। সাধারণ শ্রমিকেরা কোন অবস্থাতেই রাজি হল না কমঃ সতীশ ভদ্রকে ছাড়া কাজে যোগদান করতে। একে তারা সতীশ ভদ্রের সাথে বেঈমানী করা হবে বলে মনে করল। চাকরী যাবে যাক, ধর্মঘট প্রত্যাহারের বিষয়ে প্রকাশ্যে জনসভা করে শমিকদের বুঝিয়ে রাজী করাবার জন্য চট্টগ্রামের যুবলীগে নেতা কমঃ চোধুরী হারুনর রশীদ, শামসুদ্দীন আহমদ, মাহাবুবুল আলম চোধুরী, গোপাল বিশ্বাস, আবদুল হাই ইত্যাদিকে পাঠিয়ে চেষ্টা করা হয়, উল্টা শ্রমিকেরা তাঁদেরে জহুর আহমদ চৌধুরীর দালাল বলে আখ্যায়িত করে খেদিয়ে দেয়। ১৩ দিন ধর্মঘটের পর—ধর্মঘট ভেঙ্গে গেল সমস্ত জঙ্গী কর্মীরা হারাল চাকুরী। পার্টির জেলা কমিটি অবশ্যই পুর্বের প্রতিশ্রুতি মোতাবেক কমঃ সতীশ ভদ্র যতদিন জেলে ছিল (দুইবছর) ততোদিন প্রতিমাসে মানি অর্ডারযোগে মাসোহারা পাঠিয়ে এসেছে তার স্ত্রীর নামে, ঐ মিলেরই সতীশ ভদ্রের বন্ধু সতীশ করের মাধ্যমে। তাঁর বাড়ীও ছিল ঢাকা জেলায়।

এ ভাবেই পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তানে প্রথম সূতাকল ধর্মঘটের পরিসমাপ্তি ঘটে। এই ইতিহাসের নায়ক শ্রমিক শ্রেণী। এখান থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ।

কমঃ মাও-সে-তুং বলেন জনগণ বার বার সংগঠিত হয়ে, শত্রুর উপর আঘাত হানবে, পাল্টা আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হয়ে ফিরে আসবে, আবার প্রস্তুতি নেবে। এইভাবে যতদিন তারা চুড়ান্ত বিজয় অর্জন না করবে ততোদিন সংগ্রাম করে যাবে। এ লড়াই এর সাময়িক বিরতি আছে, স্থায়ী বিরতি নেই। এ সংগ্রাম যুগে যুগে কালে কালে চলবে। যত দিন সমাজের মধ্যে শ্রেণী বিভেদ শোষণ থাকবে।

জনসন-এর কুশ পুত্তলিকা দাহ

১৯৫০ এর দশকে আমরা যখন চট্টগ্রামে শ্রমিক আন্দোলন সংগঠনকে অনেকটা নতুন ভাবে ঢালাই করে গড়ে তুলছি তখন পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নাকের ডগায় বসে, এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের এক অংশ সহ পার্টির ঢাকা জেলা কমিটি সিদ্ধান্ত করে যে আপাততঃ অনির্দিষ্ট কালের জন্য শ্রমিক আন্দোলন সংগঠনের কাজ স্থগিত রাখা হল।" [*১] এর থেকে সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয় যে তৎকালীন পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সহ ঢাকা জেলা কমিটি সঠিক কমিউনিষ্ট ধ্যান ধারণায় ছিলনা। কেন না কমিউনিষ্ট পার্টি হল শ্রমিক শ্রেণীর (অগ্রণী অংশের) পার্টি। যে পার্টি নিজ শ্রেণীর মধ্যে কাজ করে না বা সংযোগ রাখতে চায় না-সেই পার্টি নামে কমিউনিষ্ট পার্টি হলেও কার্য্যতঃ সে পার্টি শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি ছিলনা।

ফলে ৫০ এর দশকে চট্টগ্রাম ছাড়া দেশের বাকী সর্বত্র শ্রমিক আন্দোলনে (প্রগতিশীলদের অবস্থান) শূন্যতা বিরাজ করতেছিল। তবে, যেহেতু রেলের হেড্ অফিস ছিল চট্টগ্রামে , তাই রেলের সংগঠনের মাধ্যমে দেশের অন্যত্র বিশেষ করে সৈয়দপুর-পার্বতীপুর-লালমনির হাট ; শান্তাহার, ঈশ্বরদী, আখাউরা এবং ঢাকা ইত্যাদি শাখায় আন্দোলন সংগঠনের কাজ হচ্ছিল।

রেলে তখন একটি মাত্র ইউনিয়ন "পূর্ব পাক রেল-কর্মচারী লীগ'॥ যার সভাপতি জনাব মাহবুবুল হক, সম্পাদক মাহবুব আলী। প্রথমোক্ত

[*১] ঢাকা জেলার কমিউনিষ্ট পার্টির ইতিহাস পৃষ্ঠা.........

জন রেলের খাস দালাল ও হামিদুল হক চৌধুরীর রাজনীতি ঘেষা। দ্বিতীয় জন জমায়েত পন্থী তস্য দালাল। সারা রেলে এদের কিছু চেলা চামুণ্ডা রয়েছে। সারা রেল কর্মচারীদের মধ্যে সুবিধাবাদী অংশ। মালবাবু, টিটি, গার্ড ষ্টেশণ মাষ্টার ইত্যাদি।

পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে এবং গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার কারণেও বটে একই ইউনিয়নে দালালদের নেতৃত্বে গলদ ঘর্ম হয়ে কর্মীদের কাজ করতে হচ্ছে। পার্টি নেতৃত্বের মতে জনাব মাহবুবুল হক-দালাল নয় সংস্কারবাদী। তারা আরও মনে করে "মাহবুবুল হক বা অন্য কেহ তখনই দালাল হবে যখন তিনি নগদ টাকা ঘুষ খাচ্ছেন বা সুবিধা পাচ্ছেন-নিচ্ছেন তা প্রমাণিত হবে।" এই যুক্তি যে অমার্ক্সীয় তা বুঝার জ্ঞান তখনকার পার্টি নেতৃত্বের ছিল না। এই ইউনিয়নে কাজ করার সময় আমাদের দো-মুখি আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছে। প্রথমে আন্দোলনের কর্মসূচী ও দাবী নামা রচনা করতে গিয়ে লড়তে হয় দালাল নেতাদের সাথে, তার পর রেল কর্তৃপক্ষের সাথে। প্রতিটি কর্মীর এ বিষয়ে তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে।

১৯৫২ থেকে ১৯৬৯ সাল, এই সুদীর্ঘ ১৬/১৭ বছর রেলের মধ্যে বহুবার বহুমুখি আন্দোলন সংগ্রাম হয়েছে। হয়েছে, ছোট বড় মাঝারী ধরণের সংগ্রাম। কোন কোন সংগ্রামে বীরের ন্যায় রেল শ্রমিকদের জীবন পর্য্যন্ত আত্মাহুতি দিতে হয়। ছোবহান ও শাহজাহান সহীদ হয়। এই সমস্ত ছোট বড় আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে তৎকালীন রেল শ্রমিকদের শ্রেণী চেতনা ও রাজনৈতিক চেতনা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায়, তারই একটি জলন্ত নজীর হল যুদ্ধবাজ মাকিন (আমেরিকা) প্রেসিডেন্ট জনসণের কুশ পুত্তলিকা দাহ অনুষ্ঠান।

উপলক্ষটা কি বিষয়ে ঘটেছিল এখন ঠিক মনে নেই। তবে ঘটনা মনে আছে। এক দিন পার্টির সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্থানীয় লাল দীঘির ময়দানে বিশ্ব শান্তি দিবস কিংবা অনুরূপ কোন বিষয় উপলক্ষে এক বিরাট শ্রমিক জনসভার আয়োজন করা হয়। কালুর ঘাট, আমীন-নাসিরাবাদ, ডক ও বন্দর-শিল্প অঞ্চল এবং পাহাড়তলী রেল ওয়ার্কসপ থেকে চারটি বড় ধরণের মিছিলের আয়োজন করা হয়। তৎকালে

এই চারটি অঞ্চলের মিছিল নিয়ে পার্টি ও শ্রমিক আন্দোলনের কর্মীদের মধ্যে সংগ্রামী প্রতিযোগিতা হত। কোন মিছিল সব চেয়ে বড় ও সুসংগঠিত এবং জঙ্গী। কোন সময় কালুর ঘাট, কোন সময় রেল, আমীন-নাসিরাবাদ বা ডক-বন্দর প্রথম স্তরের যোগ্যতা অর্জন করে পুরস্কার পেত। এবার বিশ্ব শান্তি বা যুদ্ধ বিরোধী সভার মিছিলে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন পাহাড়তলীর রেল ওয়ার্কসপের শ্রমিকেরা। তারা বিরাটাকৃতির (প্রায় ১০/১২ ফুট উচু) জনসন এর এক কুশ পুত্তলিকা রেল ওয়ার্কসপ থেকে বানিয়ে মিছিলের পুরোভাগে রেখে বিরাট মিছিল নিয়ে ব্যাণ্ড-বাদ্য সহকারে লাল দীঘির সভায় যোগ দান করেছিল।

মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন মধ্যবিত্ত সুলভ সব লাজ-লজ্জা ত্যাগ করে কমঃ এম, এস হক ও জনাব রহমত উল্লাহ চৌধুরী (প্রথমোক্ত জন বর্তমানের ট্রেড্ ইউনিয়ন কেন্দ্রের নেতা, শেষোক্ত জন আওয়ামী লীগ নেতৃত্বে রেল শ্রমিক কর্মচারী লীগের সভাপতি)। পেছনের সারিতে কুশ পুত্তলিকা বহন করছিলেন কমঃ জাফর আহমদ মিস্ত্রী ও কমঃ আবদুর রউফ সর্দার। পাকিস্তানী ও রক্ত পতাকা বহন করছিলেন যথাক্রমে জনাব মাহবুব আলী ও কমঃ এম আর ভুইয়া। বর্তমানে তারা রেলের মধ্যে পৃথক পৃথক সংগঠনে অবস্থান করছেন।

সে দিনের এই শাহী কুশ পুত্তলিকা নির্মান করে পাহাড়তলীর রেল ওয়ার্কসপের শ্রমিক নেতৃবৃন্দ যে উন্নত মানের রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচয় দিয়েছিলেন তারই প্রভাব পরিবেশে পরে সভায় উপস্থিত অর্দ্ধ লক্ষাধীক জনতাকে তীব্র যুদ্ধ বিরোধী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে সহায়তা করে।

সভা চলাকালীন সময়ে সভার ভিতর থেকে ঘন ঘন আওয়াজ উঠে—

০ যুদ্ধবাজ জনসন মুর্দাবাদ
ধ্বংশ হউক নিপাত যাক্
০ মাকিন সাম্রাজ্যবাদ—
ধ্বংশ হউক-নিপাত যাক্
০ যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই।

কিন্তু পরবর্তীকালের ইতিহাস প্রমান করেছে, সাধারণ শ্রমিক জনতাকে বিভিন্ন বিষয়ে খণ্ড খণ্ড ভাবে রাজনৈতিক চেতনায় সচেতন করার কাজটির ধারাবাহিকতা রাখতে না পারলে এবং তারই সাথে মার্ক্সীয় তত্ত্বজ্ঞাণ দিয়ে জনতা ও কর্মী বাহিনীকে সুসজ্জিত করার কাজটি (শিক্ষাদানের) করা না হলে, শ্রমিক শ্রেণীর ভিতর থেকে উন্নতমানের কর্মী (অগ্র বাহিনী) বিকশিত হয় না, হতে পারে না। আর ঐ ধরনের কর্মী বাহিনী ছাড়া সমাজ বিপ্লবের পথে এক কদম অগ্রসর হওয়া যায় না। এমন কি রেলের মত বিরাট বপুধারী শিল্পে অর্থনৈতিক আন্দোলনও এগুতে পারে না। ইহাই আসল ইতিহাস। আগামী দিনে এর থেকে শিক্ষা নিয়ে এগুতে হবে।

একটি আদর্শ শ্রমিক সংগঠন

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্ত ফ্রন্ট জয়যুক্ত হওয়ার পর, দ্বিতীয় মন্ত্রী সভা গঠন করেছেন আওয়ামী লীগ নেতা জনাব আতাউর রহমান খান। (প্রথম মূখ্য মন্ত্রী ছিলেন জনাব এ, কে, ফজলুল হক) এমন সময় চট্টগ্রামের কালুর ঘাট শিল্প এলাকায় ইস্পাহানী জুট মিলে জনাব জহুর আহমদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে আওয়ামী লীগের একটি শ্রমিক সংগঠন ছিল। এ সময়ে বর্তমানের প্রসিদ্ধ শ্রমিক নেতা—জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি কমঃ আবুল বাশার ঐ মিলের ওয়ার্কসপে চাকুরী করতেন। তিনি ছিলেন ঐ শ্রমিক সংগঠনের সাংগঠনিক সম্পাদক। জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশনের বর্তমানের সাধারণ সম্পাদক কমঃ শফীকুর রহমান মজুমদার ছিলেন ঐ মিলের তাঁত বিভাগের শ্রমিক ও ঐ ইউনিয়নের কমিটির সদস্য।

জনাব আতাউর রহমান খান মূখ্য মন্ত্রী থাকা কালে এখানে একবার শ্রমিকদের বিক্ষোভ মিছিলের উপর গুলি চালনা করা হয়, তাতে করে এক জন শ্রমিক মৃত্যু বরণ করে, কয়েক জন আহত হয়, এবং বেশ কয়েক জন মামলায় জড়িত হয়ে—জেলে আবদ্ধ হয়। এই ঘটনায় শ্রমিকদের মধ্যে বেশ অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী

বেশ বেকায়দায় পড়লেন। উপরে আওয়ামী লীগ মন্ত্রী সভা, নিচে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বে শ্রমিক সংগঠন। অথচ উল্টা বিচারে—যারা গুলি চালিয়ে নিরীহ শ্রমিককে হত্যা করল, সেই অপরাধীরা শ্রমিকদের আসামী করে মামলা দায়ের করল এবং জেলে পুরল। অথচ যুক্ত ফ্রন্টের জনপ্রিয় ২১ দফা দাবীর মধ্যে ছিল ন্যূনতম ভাত কাপড়ের নিশ্চয়তা। শ্রমিক আন্দোলন ও গণতান্ত্রিক অধিকারের স্বীকৃতি।

এই অসন্তোষ প্রশমনের জন্য আওয়ামী লীগ নেতৃত্বে স্থানীয় লাল দিঘীর ময়দানে এক জনসভার আয়োজন করে। সেই জনসভায় মুখ্য মন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খান—পুলিশদের বাঁচানোর জন্য ঘোষণা করলেন "শ্রমিকদের উপর গুলি চালনার জন্য জেলা প্রাশসক তথা পুলিশরা মোটেই দায়ী নহে, গুলি চালাবার পূর্বে তারা-মন্ত্রী সভার পারমিশন চেয়েছিল, শিল্পে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে আমি নিজেই গুলির হুকুম দিয়েছি। অতএব, এর জন্য প্রশাসকরা দোষী নহে। দোষ যদি হয়ে থাকে তা আমার। আপনারা আমার অপসারণ বা বিচার দাবী করতে পারেন।"

জনাব খান সাহেবের এই দ্ব্যর্থহীন ঘোষণার পর শ্রমিকদের মধ্যে আওয়ামী লীগ সম্পর্কে মোহ ভাঙ্গতে শুরু হয়, প্রথমে ইউনিয়নের নেতাদের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

এই মিলের শ্রমিকদের মধ্যে বেশীর ভাগ হল নোয়াখালী ও কুমিল্লার অধিবাসী। তারা শ্রমিক আন্দোলনেরও পুরোভাগে আছে। চট্টগ্রামের শ্রমিক একেতঃ সংখ্যায় কম, দ্বিতীয়তঃ আন্দোলন-সংগ্রামে তারা থাকে পেছনে। ছুটির পর তারা দৌড় মারে বাড়ী ঘরের দিকে।

অবস্থার চাপে পরে বাধ্য হয়ে ইউনিয়নের কয়েক জন কর্মকর্তা যথা সুনীল দত্ত, আবুল বাশার, আবদুর রশিদ, শফিকুর রহমান মজুমদার ইত্যাদিরা গোপনে কমিউনিষ্ট পার্টি ও নেতৃত্বের সাথে সংযোগ প্রতিষ্ঠার জন্য চারিদিকে খোজ খবর নিতে থাকেন।

এদের মধ্যে বাবু সুনীল দত্তের বাড়ী ছিল বোয়ালখালি থানার শাকপুরা গ্রাম। ঐ গ্রামে ছিল কমিউনিষ্ট পার্টির শাখা। তিনি গ্রামের পার্টিকর্মী কমঃ বাদল দত্তের মাধ্যমে জেলা কেন্দ্রে খবর পাঠালেনঃ—কালুর ঘাটের কয়েকজন শ্রমিক নেতা পার্টির সাথে দেখা

করতে ইচ্ছুক। খবর পেয়ে এক শনিবার রাতে ঐ গ্রামেই কমঃ সুনীল দত্তের বাড়ীতে গোপনে সাক্ষাৎ এর ব্যবস্থা করা হল। উপরে উল্লেখিত চার শ্রমিক নেতা সেখানে যথাসময়ে এলেন।

এই কারখানায় ইউনিয়ন গড়ার জন্য পার্টির শ্রমিক বিভাগ পূর্ব হতেই খোজ খবর নিতেছিলেন। চার নেতার সাথে সারা রাত ধরে বিস্তারিত আলাপ হল। তাদের নিকট থেকে সব কিছু বিস্তারিত শুনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল। এখানে পার্টি নেতৃত্বে ইউনিয়ন গঠনের প্রাথমিক পরিবেশ রয়েছে। পরের সপ্তাহের রবিবার পুনঃ বৈঠকের কর্মসূচী নেওয়া হল। এই বৈঠকে অংশ নেবে জহর আহমদ চৌধুরীর ইউনিয়ন কমিটির আরও কতিপয় সদস্য। এবার বৈঠক বসবে মিলের পাশে রেল লাইনের উত্তর দিকের মোহরা গ্রামে। এক মধ্যবিত্ত হিন্দু পরিবারের বাড়ীতে। বিরাট বাড়ী। অনেকগুলি কামরা। ভদ্র লোকের নাম আজ স্মরণ করতে পারছিনা বলে দুঃখিত। (পাকিস্তান আমলের ডাইরীগুলি ৭১ এর যুদ্ধের সময় নষ্ট হয়ে গেছে।)

এবার যারা মিটিং এর গোপনীয়তা রক্ষা করতে পারবেন, কেবল মাত্র তাদেরে ডাকা হল। ২৯ জন কমিটি সদস্যের মধ্য হতে পরের বৈঠকে এলেন ১৩ জন।

দীর্ঘক্ষণ আলোচনার পর তাদেরে বুঝিয়ে দেওয়া হলঃ—এখানে বিপ্লবীদের নেতৃত্বে শ্রমিক ইউনিয়ন করতে হলে—এক দিকে প্রয়োজন হবে খুবই বিশ্বস্ত কর্মী, দ্বিতীয়তঃ তাদের খুব বেশী করে খাটতে হবে দিনে-রাতে। আওয়ামী লীগের-পাল্টা ইউনিয়ন না করে ঐ ইউনিয়নটি ভিতর থেকে দুর্গ দখলের ন্যায় দখল করে নেওয়া সহজ হবে। তাতে করে শ্রমিকদের মধ্যে অনৈক্যের সৃষ্টি না হয়ে একতা জোরদার হবে।

দীর্ঘ স্থায়ী পরিকল্পনা নিয়ে কাজে নামতে হবে। প্রথমে ইউনিয়ন কমিটির বেশীর ভাগকে পক্ষে নিয়ে আসা, দ্বিতীয় স্তরে স্থানীয় শ্রমিকদের পক্ষে আনার প্রচেষ্টা চালানো। তৃতীয় স্তরে সমস্ত দোকানদারকে স্বপক্ষে আনা, চতুর্থতেঃ—বাড়ীওয়ালাদের, পঞ্চমে স্থানীয় ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্য ও চেয়ারম্যানদের, ষষ্ঠতঃ স্থানীয় শ্রমিকদের মধ্যে যারা গুণ্ডা-ষণ্ডা মার্কা তাদেরে নিরপেক্ষ করা। সপ্তমতঃ সব শ্রমিক-

দের মাঝে রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি করা, অষ্টম পর্য্যায়ে—চট্টগ্রামী শ্রমিকদের সকল নেতৃস্থানীয়দের স্বপক্ষে আনা। যাতে করে আওয়ামী লীগ আঞ্চলিকতার বীজ বপন করতে না পারে।

ইহা ছাড়া আরও কতেক করণীয় কাজ ছিল। খোজ নিয়ে দেখা গেল যে সেগুলির প্রাইমারী পরিবেশ ইতি মধ্যেই গড়া হয়েছে যেমন মিলের সব ডিপার্টমেণ্টে শ্রেণী সচেতন কর্মীদের নিয়ে বিভাগীয় কমিটি গঠনের জন্য কর্মী বাছাই করা। এখন করণীয় হচ্ছে—বিভাগীয় কমিটি গঠন বাস্তবায়িত করা, ৫/৭ জন নিয়ে। উপস্থিত কর্মীদের যিনি যেই বিভাগে কাজ করেন তাকে সেই বিভাগের দায়িত্ব অর্পন করা হল।

উপরোক্ত কাজগুলি ধাপে ধাপে করার পর শক্তির ভারসাম্য শতকরা ৮৫/৯০ ভাগ আমাদের স্বপক্ষে আনার পর তবেইপ্রকাশ্যে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে কর্মসূচী নিতে হবে।

প্রতি সপ্তাহে পর্যালোচনা সভায় বসতে হবে। প্রতিটি বৈঠকে জাতীয় ও বিশ্বরাজনীতির উপর এবং স্থানীয় অবস্থার উপর আলোচনা হবে। এই ভাবে ২/৩ মাস কাজ করার পর—যে মজবুত সংগঠন গড়ে উঠবে সেই সংগঠনকে কোন বিরোধী শক্তি আঘাত দিয়ে—সহজে দুর্বল করতে পারবে না।

আমার উপরোক্ত পরিকল্পনা সকলে গ্রহণ করল। সকলের মধ্যে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হল। মনের জোর বৃদ্ধি পেল। ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে সকলে কাজে ঝাপিয়ে পড়ল। দ্রুত কাজের বিস্তার ঘটতে দেখা গেল।

এই প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিক তিন মাস কাজ করার পর চূড়ান্ত পর্য্যালোচনায় দেখা গেল স্থানীয় শ্রমিক, দোকান মালিক, বাড়ীওয়ালা, ইউনিয়ন কাউন্সিল সদস্য ও চেয়ারম্যান, এমন কি গুণ্ডা প্রকৃতির লোকদের শতকরা ৯০/৯৫ ভাগকে পক্ষে আনা সম্ভব হয়েছে। বাকী গুলিকে করা হয়েছে নিরপেক্ষ।

এই পর্য্যায়ে এসে পার্টির জেলা স্তরের ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের নিয়ে এক বৈঠকে সিদ্ধান্ত করা হল-বর্তমানে কালুর ঘাট ইস্পাহানি জুট মিলে সার্বিক যে পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে, তাতে করে প্রকাশ্যে শ্রমিক জনসভা ডেকে আওয়ামী লীগের শ্রমিক নেতা জহর আহমদ চৌধুরীর

বিরুদ্ধে তাকে সভাপতি পদ থেকে সরিয়ে তার জায়গায় কমঃ নুরুর জামান চৌধুরীকে নির্বাচিত করা হউক, এবং সম্পাদক পদে বহাল করা হউক কমঃ চৌধুরী হারুনর রশীদকে। প্রথমোক্ত জন ছিলেন রেলের হিসাব রক্ষণ বিভাগের কর্মচারী ও রেল ইউনিয়নের একজন জনপ্রিয় নেতা। দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন ১৯৬২ সালের ভাষা আন্দোলনের প্রভাবে মুসলীম লীগ ত্যাগী, এবং রেলের হিসাব রক্ষণ বিভাগের কর্মচারী লীগের সভাপতি। উভয়েই চট্টগ্রামের অধিবাসী। পার্টির সদস্য। এরা দুই জনকে এই গুরুত্ব পূর্ণ পদে বসানোর মূল উদ্দেশ্য হল-শ্রমিকদের মধ্যে যাতে শত্রুপক্ষ আঞ্চলিকতার জিগীর তুলে বিভেদ সৃষ্টি করতে না পারে। নতুবা পাঠকগণ লক্ষ্য করে থাকবেন-এই ইউনিয়ন গড়ার কোন কর্মকাণ্ডে উক্ত দুই ব্যক্তির বিন্দু মাত্র ও অবদান ছিল না। অবশ্য পরবর্তী কালের ইতিহাস প্রমাণ করেছে কমঃ নূর জামান চৌধুরী এই পদ মর্য্যাদা প্রাপ্তিকে যথাযথভাবে হজম করতে পেরেছিল। তার মধ্যে দাম্ভিকতা সৃষ্টির পরিবর্তে বিনয় প্রকাশ পেয়েছিল, কিন্তু চৌধুরী হারুণর রশিদ একে যথাযথ ভাবে হজম করতে পারেনি।

পরিশেষে দেখা গেল আওয়ামী লীগের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। আমাদের পক্ষের কোন মহলকেই তারা তাদের দিকে নিয়ে যেতে পারল না; তবে একটা ক্ষুদ্র অংশকে তারা—নিরপেক্ষ করতে সক্ষম হয়েছিল।

আমার দীর্ঘ দিনের শ্রমিক আন্দোলনের বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় যে শ্রমিক সংগঠন গড়া হয়, করা হয় তার ভিত্তি স্থাপন সেই সংগঠনের ভীত হয় জমাট পাথরের ন্যায় মজবুত। এইভাবে কালুর ঘাট ইস্পাহানী জুট মিলের শ্রমিক ইউনিয়ন গঠিত হয় বিধায় পরবর্তী কালে শত প্রকার আঘাত হেনেও তার মূল উৎপাটন করা কোন শক্তির পক্ষে সম্ভব হয়নি।

তবে দীর্ঘ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে পরবর্তী কালে ধরা পড়েছে একটা মারাত্মক ধরণের ভুলের বীজ এই কর্মকাণ্ডে থেকে যায়, তাহচ্ছে নবাগত কর্মীদেরে মার্কসবাদী তত্বজ্ঞানে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য নিয়মিত ও ধারাবাহিক পাঠচক্র তথা অধ্যয়ন-অনুশীলন ইত্যাদি চালাবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিৎ ছিল। যার অভাবে ঐ কর্মকাণ্ড থেকে

উন্নত মানের মার্ক্সবাদী কর্মী ও নেতা বিকশিত হতে পারেনি। কিন্তু তখন পার্টির জেলা ও কেন্দ্রীয় পর্য্যায়ে এমন একজনও ন্যূনতম অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ নেতা ছিলেন না, যারা এই কাজে অবদান রাখতে পারতেন। একটি ঘটনা থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে একেবারে নবীশ কমঃ মোহাম্মদ তোয়াহা ছিলেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় কমিটিতে-ট্রেড ইউনিয়ন বিভাগের ইন্‌চার্জ তথা দায়িত্বে। আমি নিজেও ছিলাম নবাগত। তাই আমার পুঁজি হল শ্রমিকদের নিকট থেকে শিখে তাদের শিখানো। যাকে বলে হাতুড়ে ডাক্তারী।

টঙ্গির শফী মজুমদার

সে আজ অনেক দিনের কথা, প্রায় তিন যুগের কাছাকাছি। হঠাৎ করে কালুর ঘাট শ্রমিক আন্দোলন থেকে একটি মানুষ হারিয়ে গেল অনেক দিন তার আর কোন খোজ খবর নেই। মাঝে মাঝে দিলটার মধ্যে আনচান করে স্মরণে জাগে। ভারি ফুর্তিবাজ ছেলে। ভীষণ চট-পটে স্বভাব, চলাফিরায় ফিট ফাট। চলনে বলনে-ঘটা ঘঠ্-লেপ্ট রাইট; যেন উড়ন্ত সসার। কারো হুকুম মানতে, হুকুমে চলতে অভ্যস্ত নয়। এ যেন জন্ম লগ্নে স্বাধীন। আজীবন স্বাধীন ভাবে চলার জন্য দুনিয়াতে তার আগমন। তার এই ঘোড় দৌড়ি স্বভাবের জন্য অনেকে তাকে পছন্দ করেনা, আবার অনেকের নিকট প্রিয়। আমার কিন্তু ভারি ভাল লাগে, তাকে সাথে পেলে দেহ মনে শক্তি বৃদ্ধি পায়, মনে হয়—দুটি শক্তিশালী ঘোড়ায় সোয়ার হয়ে দুটি যোদ্ধা পাশা পাশি-যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে চলন্ত অবস্থায় আলাপরত।

এ হেন শফীকুর রহমান মজুমদারের সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ গোপনে বোয়ালখালি থানার শাকপুরা গ্রামে কমরেড সুনীল দত্তের বাড়ীতে। সেদিন কালুর ঘাট ইস্পাহানী জুট মিলে কর্মরত যে কয়জন প্রথম সারির শ্রমিক নেতা উপস্থিত ছিলেন তাদের ৪ জনের মধ্যে শফী মজুমদার অন্যতম।

অনেক মার-ধর, জেল জুলুম, মামলা মোকদ্দমায় জড়িয়ে বহুবিধ হয়রানী সহ্য করে-এই ইউনিয়নের গোড়া পত্তন হয়। তার পর-ধারা-বাহিক ভাবে চলতে থাকে গুণ্ডার আক্রমণ, পুলিশের হামলা, এরই

এক পর্য্যায়ে হঠাৎ করে শফী মজুমদার গায়েব হয়ে গেলেন, প্রায় বছর খানেক যাবৎ কোন খোজ খবর নেই।

তার পর হঠাৎ করে খবর ছড়িয়ে পড়ল। খুলনার খালিস পুরে প্লাটিনাম জুট মিলের নির্বাচিত শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি শফীকুর রহমান মজুমদার গ্রেপ্তার, কারাবরণ এবং অবশেষে খুলনা থেকে বহিষ্কার। এরপর বেশ কিছুদিন কোন সারা শব্দ নেই। ভাবছি ছেলেটি কোথায় হারিয়ে গেল। যেখানেই সে যায় সেখানে শ্রমিক মেহনতী মানুষকে সংগঠিত করে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করার ক্ষমতা তার মধ্যে সাংঘাতিক ভাবে বিরাজমান। মনে মনে আত্মবিশ্বাস আছে, ও যেখানেই যাক না কেন, থাকবে শ্রমজিবী মানুষের মাঝে, অন্য কোন শ্রেণীর মধ্যে কাজ করার পরিবেশ ও সামর্থ তার নেই। আমাদের দেশের সকল শ্রেণীর মানুষের একটা দুর্বল দিক হল, তারা জ্ঞানী ও কর্মঠ লোকের চেয়ে বিদ্দান ব্যক্তিকে বেশী–সন্মান করে, কদর দেয়, করে সমাদর। কমঃ শফীকের মধ্যে সেই বিদ্যার সনদ নেই। যদি কোন সময় ব্যক্তিক্রম ভাবে কোন অবিদ্যান লোকের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি স্থাপিত হয়, তাহলে সেই ব্যক্তিকে দীর্ঘ বছর ধরে ত্যাগ তিতিক্ষার পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। হতে হবে গৃহ ত্যাগী সন্যাসী। কমঃ শফী তাও নয়।

তবে বহু ঘাটের পানি খেয়ে, বহু জেল জুলুম অত্যাচার সহ্য করে কমঃ শফীক ধীরে ধীরে ইস্পাত দৃঢ় হয়ে গড়ে উঠেছে।

এর পর হঠাৎ করে একদিন সে চট্টগ্রামে এসে হাজীর হল। তখন হাজারী লেইনে ফেডারেশনের অফিস। অফিস তখন জম জমাট। প্রায় ৬০/৭০ টি শিল্প–কারখানায় ও অফিস আদালতে পার্টি নিয়ন্ত্রিত শ্রমিক সংগঠন। মজবুত করে গড়ে উঠছে পার্টি নেতৃত্ব। পোক্ত ও কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলা। পার্টি নেতৃত্বে সব গুলি শ্রমিক আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে। পার্টিই প্রধান (মাতৃ সংগঠন)। শ্রমিক ও অন্যান্য সংগঠন সন্তান তুল্য। কোন একটি সংগঠনের সাময়িক অবক্ষয় আসতে পারে, এসেও থাকে। কিন্তু মাতৃ তুল্য সংগঠন সুস্থ অবস্থায় বেঁচে থাকলে ঐ সব সন্তানবৎ সংগঠন অচিরেই পুণঃ জীবিত বা জন্মলাভ করতে পারে।

কমঃ শফীক এসে গোপনে আমার সাথে সাক্ষাৎ করলেন। এবং আদ্যপান্ত সব রিপোর্ট করে আমায় ওয়াকী বহাল করলেন দীর্ঘ তিন চার

বছরের ইতিবৃত্ত। সব শেষে জানলাম তার টঙ্গিতে অবস্থান। জনাব আফতাব আলীর সাথে সারা পাকিস্তান সুতাকল শ্রমিক ফেডারেশনের সাথে তার সম্পর্ক। তিনি তখন পাকিস্তান সুতা কল শ্রমিক ফেডারেশনের সাংগঠনিক সম্পাদক।

পরিশেষে কমরেড শফী ঢাকা ও টঙ্গির শিল্পাঞ্চলে পার্টি সংগঠন গড়ার জন্য আমার পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রার্থনা করলেন এবং সংগ্রামী ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে সংযোগ প্রতিষ্ঠার বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনার সূত্রপাত ঘটালেন।

আমি তার সাথে আলোচনা সংক্ষিপ্ত না করে পরিকল্পিতভাবে একটু দীর্ঘায়িত করলাম এবং চট্টগ্রামের শিল্পাঞ্চলের সংগঠন গুলোর বাস্তব অবস্থা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ দিয়ে বললাম, কমরেড একটি কাজ করলে ভাল হয়, কয়েক দিন আমার একটা জরুরী কাজ রয়েছে, তুমি ২/৩ দিন চট্টগ্রামে থেকে যাও। সবগুলি শিল্পাঞ্চল ঘুরে ঘুরে দেখ। চার দিন পর বিস্তারিত আলাপ করা যাবে।

সেই প্রস্তবানুসারে কমরেড শফী তিন দিন থেকে গেলেন এবং কালুর ঘাট-আমীন থেকে পতেঙ্গা বার্মা ইণ্টারেণ ডক বন্দর থেকে ভিক্‌টরী জুট মিল পর্য্যন্ত সবত্র ঘুরে দেখলেন। শফী ছিল অত্যন্ত প্রখর বুদ্ধিমান ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠক। সে শুধু নিজে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে নিলনা, আমাকেও বহু বিষয় নজরে এনে সাহায্য করল।

পরিশেষে তাকে তিন মাসের একটি কর্মসূচী দিলাম। এই কর্মসূচী বাস্তবায়নের উপর নির্ভর করবে তার পার্টি সদস্য পদ প্রাপ্তি, টঙ্গীর শিল্পাঞ্চলে বৈপ্লবীক শ্রমিক আন্দোলনের বীজ বপন, ঢাকার পোস্তগোলা, নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলে পার্টি সংগঠনের জন্য যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা, সর্ব শেষে পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক আন্দোলনের কেন্দ্র (ঢাকাতে) গড়ে তোলার প্রস্তুতি পর্বের সূচনা করা।

তিন মাস পর নির্দিষ্ট তারিখে লিয়াকত এভেনিউতে—কমরেড শফীর সাথে গিয়ে গোপনে দেখা করলাম। অফিসটি ছিল জনাব আফতাব আলী সাহেবের, তারই একটি ক্ষুদ্র কক্ষে কমঃ শফী থাকতেন ঐ অফিসেরই ২/৩ জনের সাথে মেছ করে।

সকলের সাথে পরিচয় করে দিলেন ইনি আমার মায়ের চাচা, সম্পর্কে আমার নানা। কলকাতা-খিদিরপুরে শ্রমিক আন্দোলনের নেতা। ওখানে দুই তিন দিন থেকে—বেশ কয়জন জঙ্গী শ্রমিক কর্মীর সাথে যোগাযোগ হল। যোগাযোগ হল কিছু কৃষি-জীবির সাথে।

কাজের রিপোর্টগুলি কিছু কিছু সরেজমিনে তদারক করে দেখা গেল, মূল্যায়নে কিছু অতি রঞ্জন থাকলেও সংখ্যা ও পরিমাণগত তথ্য নির্ভুল।

আফতাব আলী সম্পর্কে আমার মূল্যায়ন ছিল তিনি সহ ফয়েজ আহমদ চেরাগ আলী খান, মাহাবুবুল হক,—ইত্যাদিরা সচেতন দেশী, বিদেশী-দালাল ধনী ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দালাল। একমাত্র ব্যতিক্রম হল-জনাব কাজী মহিউদ্দিন আহমদ (বরিশাল) যিনি শ্রেণীগত ভাবে উদার নৈতিক বুর্জোয়া। শ্রমিক আন্দোলনে সংস্কারবাদী। যিনি কাজী জাফর সাহেবের আপন মামা। যার থেকে কাজী জাফর সাহেব পেয়েছেন রাজনীতিতে হাতে খড়ি। শিখেছেন মার্কসবাদের অ, আ ক, খ, এখানে একটা বিষয় স্মরণযোগ্য যে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টির পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক ঢাকা নারায়ণগঞ্জ, পোস্তাগোলা কোথাও কোন শ্রমিক সংগঠন গড়ার কাজে কর্মী নিয়োগ করা হয়নি। ব্যতিক্রম ভাবে নোয়াখালী নিবাসী বলে ঢাকার রেল ইউনিয়ন শাখার সভাপতি ছিলেন কমঃ মোহাম্মদ তোয়াহা। পার্টির ঢাকা জেলা কমিটি তখন প্রস্তাব করে যে, "শ্রমিক আন্দোলন অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখা হল।" যে জেলা কমিটির শ্রমিক ফ্রন্টের দায়িত্বে কেন্দ্র থেকে ভারপ্রাপ্ত ছিলেন মোহামদ তোয়াহা।

এক কথায় ঢাকা নারায়ণগঞ্জ ও টঙ্গীতে প্রগতিশীল শ্রমিক আন্দোলনের প্রবক্তা বা বীজ বপন কারী সংগঠক হল কমঃ শফিকুর রহমান মজুমদার।

গোপন জীবনে-প্রকাশ্য কাজ

অনেকের মধ্যে ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে যে-যারা আত্মগোপন থাকে তারা কোন দিন দিনের আলো দেখতে পায় না। এই ধারণাটা সন্ত্রাসবাদী যুগের। কারণ সন্ত্রাসবাদী যুগে উৎপাদনের সাথে সম্পর্কীত গণ মানুষের সাথে বিপ্লবীদের কোন সম্পর্ক ছিল না।

কমিউনিষ্ট আন্দোলন সংগঠনের প্রয়োজনে যারা গ্রেপ্তার এড়িয়ে আত্মগোপনে থাকে তাদের মূল লক্ষ্য আত্মরক্ষা নয়, আন্দোলন সংগঠনের বিস্তার ঘটানো। কেবলমাত্র আত্মরক্ষার জন্য যারা গোপনে থাকতে চায়-তারা মার্ক্সবাদী নয়। সেই ধরনের আত্ম-গোপন জীবন বৃথা, সময়ের অপচয় মাত্র।

এ কারণে আমার আত্ম-গোপন জীবন ছিল ভিন্ন প্রকৃতির। যেখানে আমাকে শত্রু পক্ষ এবং সাধারণ মানুষ চিনে না সেই স্থানে আত্ম-গোপনের কৌশল হবে ভিন্ন। যেমন-১৯৬০ এর দশকে আমি কয়েকটি গল্প ও প্রবন্ধ রচনা করে তা ছাপাবার জন্য সাপ্তাহিক জনতা পত্রিকার কর্মকর্তা জনাব আনোয়ার জাহিদ, নূরুল হুদা কাদের বক্স এবং ছালাউদ্দীন মাহমুদের সাথে দেখা করার প্রয়োজন মনে করি। একাজটি অন্য কারো মাধ্যমে সুচারুরূপে হতে পারে না। তাই ঢাকায় এসে একদিন অফিস টাইমে তখনকার প্রেস ট্রাষ্ট অব ইষ্ট পাকিস্তান ব্যুরোর অফিসে গিয়ে তাদের সাথে দেখা করে লেখাগুলি নিয়ে আলোচনা করলাম, তাদের কিছু কিছু মূল্যবান পরামর্শ গ্রহণ করে কয়েকটি লিখায় কিছু পরিবর্ত্তন করার অধিকারসহ লেখাগুলি ছাপতে দিয়ে এলাম। সে লেখাগুলি কয়েকটি সংখ্যায় পর পর ছাপা হয়েছিল যার শিরনাম ছিল—"খালাশী ও উচওয়ালা" এই দুইটি ছিল গল্প। আর একটা ছিল প্রবন্ধ "চীন-ভারত যুদ্ধের অন্তরালে।" স্মরণযোগ্য যে এ লেখাগুলি ছাপা হয়—আমার অন্য একটি ছদ্মনামে। একটি জনপ্রিয় সাপ্তাহিকের মাধ্যমে আমার লেখা জনসমক্ষে আত্মপ্রকাশ এই প্রথম।

গোপন জীবনে আমার দ্বিতীয় প্রচার কার্য্য শুরু হয় 'সাপ্তাহিক প্রভাতী' নামে একটি পত্রিকার প্রকাশনার মাধ্যমে। সেটার সময়কাল ১৯৬৪ সালের দিকে। সে সময় চট্টগ্রামে এমন কোন দিন বা সপ্তাহ ছিল না যেখানে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটছে না। বিশেষ করে শ্রমিক এলাকায়। অথচ তা কোন বড় লোকের কাগজে গুরুত্বপূর্ণ খবর হিসাবে স্থান পেতনা।

'সাপ্তাহিক প্রভাতী' নামে অনুমতি নিয়ে কাগজটি বের করার ক্ষেত্রে যাদের অবদান ছিল সমধিক তারা হচ্ছেন কমঃ জালাল আহ্মদ ও আবদুল মতিন। প্রথমোক্ত জন পত্রিকার ঘোষিত সম্পাদক, দ্বিতীয়জন

ম্যানেজার। প্রথম ব্যক্তি চাকুরী করতেন-পাকিস্তান টোবাকো কোম্পানীতে, ২য় জন সি এণ্ড বি বিভাগের নক্সাবিদ হিসেবে। পার্টির আহবানে দুইজনই উচ্চ বেতনের চাকুরী ছেড়ে দিয়ে—স্বল্প ভাতা গ্রহণ করে এ কাছে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। পার্টির জেলা কমিটির আমি সম্পাদক হলেও সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমার দুর্বল দিক বিবেচনা করে সম্পাদকীয় লিখার দায়িত্ব ছিল চৌধুরী হারুন রশীদ সাহেবের উপর। বাস্তবে অধিকাংশ সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় এবং নিউজ ফিচার আমিই লিখতাম এবং কমঃ জালাল ও মতিন বানান ও ব্যাকরণ শুদ্ধ করে দিতেন।

প্রায় বছর দেড় কি দুই কাগজটি চালু ছিল। বাস্তবে খবরের সৃষ্টি ও সংগ্রহ, বিলিবণ্টন, পয়সা আদায় ও যোগাড়, স্থায়ী গ্রাহক সংগ্রহ ইত্যাদি যাবতীয় কাজের বেশীর ভাগ কাজ আমাকেই করতে হত। এই সময় হতেই—আমার লেখার অভ্যাস দ্রুত বাড়তে থাকে। ''বউ কথা কও'' 'এক নজরে চীন ও পাকিস্তান', 'মজুরের ঘড়ি',—ইত্যাদি অনেকগুলি গল্প প্রবন্ধ ও ফিচার প্রভাতীতে প্রকাশিত হয়।

ঠিক ঐ সমসাময়িককালে চট্টগ্রামে জে এম সেন হলে একটি শ্রমিক সম্মেলন উপলক্ষে-"অগ্নি গর্ভ'' নামে একটি সংকলন প্রকাশিত হয়, তাতে কমঃ বদিউল আলম, আবুল বাশার, আবদুল মালেক এবং মকবুল আহমদের নামে আমারই চারটি লিখা সন্নিবেশিত ছিল। তাতে রেল, বন্দর ও ওয়াপদা এবং সাধারণভাবে শ্রমিক আন্দোলনের গতি প্রকৃতি নিয়ে মার্ক্সীয় দৃষ্টিতে বিচার বিশ্লেষন ছিল। এই "অগ্নি গর্ভ'' পুস্তিকাটি আজ কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। যার সমালোচনা করেছিলেন (মুখে) মোহাম্মদ তোয়াহা ও আবদুল হক। বইটি পাওয়া গেলে আজ নতুন করে পুনঃ প্রকাশ করে দেখাতে পারতাম কোথায় তার মধ্যে মার্ক্সীয় গলদ ছিল। তবে আজ মুক্ত মনে স্বীকার করছি যে ঐ লিখাগুলি আমারই অন্য কোন ছদ্মনামে প্রকাশ করা উচিত ছিল। উচিত হয়নি যারা লিখেনি তাদের নামে প্রকাশ করা।

বাইশ বছরের গোপন জীবনে (১৯৪৮—১৯৬৯ এর জুলাই) এবং দুই বছর জেল জীবনে (১৯৬৯ এর ১৭ই জুলাই-১৯৭১-এর ৬ই এপ্রিল)- অনেক ইস্তাহার প্রচার পত্র, দেওয়াল লিপি, সার্কুলার রাজনৈতিক রিপোর্ট

প্রবন্ধ, গল্প, রম্যরচনা এবং চিঠি লিখেছি যার কোন একটিরও আজ অস্তিত্ব খুজে পাওয়া যাচ্ছে না। একজন মানুষের জীবনে এতগুলি ক্ষতি ও অপচয় সত্যিই সীমাহীন অকল্পনীয় ক্ষতি, বিশেষ করে সঞ্চিত ও সংগৃহীত লাইব্রেরী, পুস্তক ও রচনা সম্ভার। আমার জীবনে ইংরেজী বাংলা, বাংলা-ইংরেজী এবং বাংলা-বাংলা, বাংলা সংস্কৃতি অভিধান হারিয়েছি প্রায় ডজন দেড়। পুস্তকের সংখ্যা হাজারের উপর। যে ক্ষতিগুলি অপূরণীয়।

গোপন যুগে কৃষক কর্মী সম্মেলন

স্থান—শিরাজগঞ্জ
জিলা—পাবনা

গোপন যুগে বিভিন্ন স্থানে—ছোট, বড় মাঝারী—শ্রমিক ও কৃষক কর্মী সম্মেলন করতে হয়েছে, তার মধ্যে সর্ব বৃহৎ এবং দীর্ঘ-স্থায়ী একটি কৃষক কর্মী সম্মেলনের আয়োজন হয় ; পাবনা জিলার সিরাজগঞ্জ শহরের দক্ষিণ-পশ্চিমে সাধারণ একটি গ্রামে।

সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন কমঃ আবদুল মতীন (রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলনের প্রধান নায়ক) ও আলাউদ্দিন ; স্থানীয় নেতা কমঃ আবদুছ ছামাদ ও মনিরুজ্জামান তারা মিঞার সহযোগীতায়।

যতদূর মনে পড়ে সময়টা ছিল—১৯৬৮ সাল, পূর্ব বাংলা কমিউনিষ্ট পার্টি গঠনের কিছু আগে পরে।

গোপনে চট্টগ্রাম থেকে ট্রেন যোগে সেই কর্মী সম্মেলনে যোগদান করি। প্রায় হাজার খানেক কর্মীর সমাবেশ। একদিন, এক রাত ধরে সম্মেলন চলেছে গোপনে ; আইয়ুব শাহীর আমলে। কিন্তু কোন খবর গ্রামের বাহিরে ছড়ায় নাই।

উপস্থিত বেশীর ভাগ কর্মী পাবনা জিলার হলেও বগুড়া, রংপুর কুষ্টিয়া, রাজশাহী, দিনাজপুরের নেতৃস্থানীয় সকল পার্টি কর্মীরা সম্মেলনে উপস্থিত ছিল। এখানেই উত্তর বঙ্গের পার্টি কর্মীদের সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ পরিচয় হয়। সকলের নাম মনে রাখা সম্ভব নয়, যাদের নাম স্মরণে আছে-তারা হচ্ছে :—সর্ব কমরেড শহীদ ছমীর মণ্ডল, আবুল

কালাম আজাদ, রাবেয়া আকতার বেলী (বগুড়া), এডভোকেট ওসমান গণি অধ্যক্ষ মীরাতুল ইসলাম (শিবগঞ্জ রাজশাহী) আবদুল ওহাব (রাজশাহী শহর), খায়রুল বাশার (আত্রাই), অধ্যাপক বাদল দত্ত (আত্রাই কলেজ), জাহাঙ্গীর আলম (নাটোর), মোহামদ আলী বিশ্বাস ও মোঃ ইব্রাহীম (আল্লার দরগা, কুষ্টিয়া), অধ্যাপক লুৎফর (ভেড়ামারা), আহমদ উল্লাহ (যশোর), মোহামদ আলী বিশ্বাস, আহাদ আলী ও আতিয়ার রহমান (ঈশ্বরদী), মনিরুজ্জামান তারা মিঞা ও আবদুছ ছামাদ (সিরাজগঞ্জ) এবং জনৈক কমঃ কৃষি ফার্ম শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করতেন- সম্ভবতঃ তার নাম ছিল আবদুর রাজ্জাক এবং উদীয়মান সাহিত্যিক— ইন্দু ভূষন সাহা।

কৃষক বাড়ীর আঙ্গিনায়— সামিয়ানা টানিয়ে দিনের বেলা-হাজার খানেক রাজনৈতিক কর্মীর—প্রকাশ্য সম্মেলন। আইয়ুবের সামরিক শাসনের—দাপটের মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এতে করে প্রমাণিত হয়—এলাকায় রয়েছে সচেতন-শক্তিশালী কৃষক সংগঠন।

সারা দিন আমি শ্রোতা হিসাবে বৈঠকে উপস্থিত থাকি। মধ্যখানে বিরতির সময়—কর্মীদের সাথে একত্রে বসে কলা পাতার পাত্রে খিচুরি খেয়ে পুনঃ রাত ৮টা পর্যন্ত কর্মীদের বক্তব্য শুনলাম। উপস্থিত উৎসুক্য সবার নিকট আমার পরিচয়—আমি একজন সাংবাদিক। তাই বক্তাদের বক্তৃতা নোট করছি। রাত আড়াটার পর আমাকে নিয়ে আর একটি বাড়ীতে বৈঠকে বসা হল। উপরে উল্লেখিত পার্টি কর্মীরা সহ ২০/২৫ জন উপস্থিত ছিল। এখানে আমাকে পরিচয় দেওয়া হল পার্টি নেতা হিসাবে। তবে আসল পরিচয় গোপন রেখে। এই বৈঠক চলে সারা রাত ধরে। আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে ছিল রাশিয়ার পার্টির সংশোধনবাদী নীতি, আমাদের ও চীনের পার্টির মূল্যায়ন, জাতীয় ক্ষেত্রে মনিসিং প্রমূখদের বুর্জোয়া লেজুড় বৃত্তি, এবং পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে কৃষকদের ভূমিকা—ইত্যাদি বিষয়। কি বলেছিলাম এখন ঠিক মনে নেই, তবে তখন আমার মার্ক্সবাদী জ্ঞান পরিপক্ক ছিল না, এতে কোন সন্দেহ নেই। যেমন তখন আমি বলতাম—"পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের উপনিবেশ।" "বিশেষ ধরনের উপনিবেশ কথাটি তখনও উপলব্ধিতে আসেনি।" আর বন্ধু আবদুল মতীন—আলাউদ্দিন তখনও জোড়

দিতেন—জাতীয় মুক্তি প্রশ্নটিকে উহ্য রেখে কৃষি বিপ্লবের উপর। যত দূর মনে হয় তখনও পর্য্যন্ত তারা একটার সাথে অপরটার সম্পর্ক—সম্পর্কে—পরিস্কার ছিল না। একটাকে অপরটার পরিপূরক না ভেবে বিকল্প ভাবতেন। সে যাই হউক পরবর্তী কালে কমঃ ওসমান গনি প্রমুখদের নিকট শুনেছি—আমার সেই গোপন বৈঠকের বক্তব্য শুনে তারা বহু বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। এবং পরবর্তী কালে—পূর্ব বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টির রণনীতি বুঝতে সাহায্য করেছিল।

কমঃ মাহাবুব উল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ হয়, তার দুই দিন পরে—পাবনা জিলার শাহজাদপুরে কোন এক তাতী পরিবারে। তার নিকট আমার পরিচয় দেওয়া হয় আমি একজন ফুটবল খেলোয়াড়। যা তিনি নিজে বিচিত্রায় এক লেখায় উল্লেখ করেছেন। এখান থেকে যাই মতীনদের পুরাতন বাড়ী হয়ে মিজা-আবদুল হালিম ও মির্জা আবদুল আওয়ালের বাড়ীতে। সেখান থেকে পাবনা শহর ও শাপুর হয়ে ঢাকায়। এই আমার পাবনা জিলায় ব্যাপক সফর।

দুঃখ জনক ঘটনা হল—যার বাড়ীতে সেই গোপন কৃষক সম্মেলন হয়, সেই-বিপ্লবী কমিটিকে এবং সেই এলাকার সেরা পার্টি সংগঠক—দুই জনকে হারাতে হয় বাম হঠকারী লাইন তথা চারু মজুমদারের নক্সাল লাইনের—পরিণতিতে। এরা দুই জন হলেন কমঃ মনিরুউজ্জামান তারা, এবং কমঃ আবদুছ ছামাদ। যাদের অকাল মৃত্যুতে এদেশের সমাজ বিপ্লবের কাজ অনেক দূর পিছিয়ে গেছে। এই ধরণের কয়েক হাজার নিবেদিত প্রাণ বিপ্লবী কর্মীকে অকালে হারাতে হয়েছে, যার স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে মাঝে মধ্যে কমঃ আলাউদ্দিন চিন্তার জগতে খেই হারায়।

ডাক্তার মুর্তজা

ডাক্তার মুর্তজা একটি অবিস্মরণীয় নাম। আমার জীবনে যতজন নতুন-পুরাতন (নবীন ও প্রবীন) কমিউনিষ্ট এর সংস্পর্শে আসার সুযোগ হয়েছে তার মধ্যে ডাক্তার মুর্তজা ছিলেন ব্যতিক্রম ধর্মী। নিটোল স্বাস্থ্যের

অধিকারী, নিয়মিত শরীর চর্চায় গঠিত দেহ। উজ্জ্বল মেহগণিবর্ণের বেটে খাটো লোক, অমায়িক হাসি খুশি দিলখোলা ব্যবহার। ছোট্ট পরিকল্পিত পরিবার—স্বামী স্ত্রী, এক কন্যা ও এক পুত্র। থাকতেন নীলক্ষেত ব্যারেকের সরকারী বাসভবনে একটি দালানের নীচের তলায়।

আমার সাথে তাঁর প্রথম পরিচয় ঘটে ১৯৬৭/৬৮ সালে। আমরা তখন চীনা পন্থী কমিউনিস্ট পার্টিতে অবস্থান করছি। সেবার আমার পেটে দেখা দিয়েছিল হুক্ ওয়ার্ম বা বক্র ক্রিমি। আর ছিল সাইটিকার আক্রমণ। তদুপরি হঠাৎ করে দেখা দিল ১০৪/৫ ডিগ্রি জ্বর। তাই কমঃ আব্দুল হক সাহেব কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক থেকে আমাকে সাথে করে নিয়ে উঠালেন ডাক্তার মুর্তুজার নীলক্ষেতের বাসায়। প্রথম যাত্রায় এক নাগারে প্রায় পনর দিন সেখানে ছিলাম।

চিকিৎসা, বিশ্রাম ও পড়াশুনার জন্য বাসাটি ছিল খুবই চমৎকার। দুইটা বেড রুম, একটি বড় হলঘর, দুইটি বাথ রুম, দুইদিকে দুইটি লোহার জালি দিয়ে ঘেরা বারিন্দা, একটি পড়ার ঘর।

সবগুলি ঘর পরিপাটি ও আরম্বরহীনভাবে সাজানো। দামী আসবাব পত্রের মধ্যে—বই পুস্তকের আলমিরা ও পুস্তক।

কমঃ মুর্তুজা ছিলেন অত্যন্ত সুশৃঙ্খল প্রকৃতির লোক। তার মতে এ দুনিয়ার এবং গোটা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড চলিতেছে কঠিন শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে। নিয়ম শৃঙ্খলার বাইরে কিছুই নাই, যেখানেই নিয়ম শৃঙ্খলার অভাব দেখা দিবে সেখানেই উল্কাপাতের ন্যায় পতন অনিবার্য। তাঁর চরিত্রের সবশ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট ছিল—কথা আর কাজের মধ্যকার সমন্বয়। তিনি যা বলতেন তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন। তার এই শৃঙ্খলাবোধটাকে অনেকেই পছন্দ করতেন না, বিপরীতে ঐসব উশৃঙ্খল মানুষগুলোকে ডাক্তার মর্তুজা মনে প্রাণে ঘৃণা করতেন। আর ঘৃণা করতেন স্বার্থপর সুবিধাবাদী লোকদের।

এক দিনের এক ঘটনা এখানে উল্লেখ না করে পারছি না। ডাক্তার মুর্তুজার শ্বশুর বাড়ী ছিলো যশোর-খুলনা কোন জিলায়। শ্বশুরটি ছিলেন বিরাট জোত-জমির মালিক। এবং ঐ জোত জমি রক্ষার প্রয়োজনে তাকে করতে হতো মামলা মোকদ্দমা। তারই প্রয়োজনে প্রায় প্রতি মাসে তাকে

আসতে হত ঢাকায়। একবার আসলে বাধ্য হয়ে থাকতে হত—বেশ কয়েকদিন। আসলে বাধ্যতামূলকভাবে বাড়তি থাকার ঘরটিই তিনি দখল করে বসতেন। এর ফলে মাঝে মধ্যে আমার ন্যায় গোপন কর্মীদের থাকার ভীষণ অসুবিধা হত। উপরন্ত তিনি আসতেন কোন প্রকার পূর্ব ঘোষণা ব্যতিরেকে।

অথচ ডাক্তার মুর্তজার এই বাসাটা তখন পার্টির নানান কাজে ব্যবহার করা হত। কোন সময় ঘরোয়া বৈঠক, নিয়মিত মার্ক্সবাদী ক্লাস, বিভিন্ন দূরের কমরেডদের সাথে সংযোগ কেন্দ্র, বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ কমরেড-দের চিকিৎসা ও বিশ্রাম ইত্যাদি হরেক রকম কাজের কেন্দ্র হয়ে গড়ে উঠেছিল নীল ক্ষেতের ঐ বাসাটি।

এমন অবস্থায় যখন তখন শ্বশুর নামক মানুষটির আগমনকেও ডাক্তার মুর্তজা একটা আপদ মনে করতেন, অথচ কিছু বলাও যায় না, সহ্য করাও সম্ভব নয়। তাছাড়া জোত জমির মালিকেরা সাধারণতঃ হয়ে থাকে রক্ষণশীল, ইলিশের তেল দিয়ে ইলিশ ভেজে খেতে ওস্তাদ। তাই তিনি জামাতার গৌরবে গৌরবান্বিত হওয়ার জন্য প্রায়ই ঢাকাস্থ দেশী আত্মীয় স্বজনকে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে নীল ক্ষেতের বাসায় ডেকে এনে-জামাতার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতেন। কোন সময় দেখা গেল জামাতা একটা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আলোচনায় জড়িত; এমন সময় শ্বশুর মহাশয় জামাতাকে তলব করে বসলেন, আবার একটু দেরী করে হাজীর হলে এই মুরব্বীর-আত্মমর্য্যাদায় আঘাত লাগে, ক্ষুন্ন হয়।

এই সব বিরক্তিকর পরিবেশে পরে একদিন আমার উপস্থিতিতেই তিনি শ্বশুর মহাশয়কে—ডেকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন যে "দেখুন মুরব্বী মহাশয়। আপনার জামাতা বাবাজী ডাক্তারী-মাষ্টারী ছাড়া আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন, তা হচ্ছে রাজনীতি। আপনি ভালো করে জানেন বা বুঝার মত বুদ্ধি শুদ্ধি রাখেন যে সেই রাজনীতি আপনাদের ন্যায় লর্ড কর্ণওয়ালীশদের জারজ সন্তানগুলিকে সমূলে ধ্বংস করার রাজনীতি।

কাজেই ডাক্তার মুর্তজার পরিবারটি ছোট বলে কিছু বাড়তি আয় রোজগার যা আছে—তা সম্পূর্ণটা খরচ করার বরাদ্ধ রয়েছে ঐ সব কাজের

জন্য। আপনাদের ন্যায় শোষকদের পেছনে ঐ পয়সা খরচ করা যায় না।"

"অতএব, আপনার জোত জমি রক্ষার মামলা মোকদ্দমা খরচ ঐ জোত জমির আয়ের থেকেই করা উচিত। নিত্যি যখন আপনার ঢাকাতে আসতে হয়, থাকতে হয়; সেক্ষেত্রে ঢাকাতে একটি বাসা করে নেন। আমি বরঞ্চ লোকজন দিয়ে খোঁজ খবর করে বাসা একটা খুজে দেব। এখনও সম্পর্কটা আমাদের উভয়ের মধ্যে ভাল আছে, এর অধিক তিক্ত করা সমুচিত হবে না। দয়া করে সেই ব্যবস্থাই অবলম্বন করুন। তবে যতদিন বাসা করতে দেরী হবে বা সময় লাগবে--সেই কয়দিন এখানে উঠবেন একটি শর্তে--তাহচ্ছে যে কয়দিন থাকবেন-খাবেন তার মূল্য হিসেব করে ঐ পরিমাণ চালটা বাড়ী হইতে সাথে করে নিয়ে আসবেন। আশা করি আপনি এতক্ষণে বিষয়টা উপলব্ধি করতে পেরেছেন।"

এই হল ডাক্তার মুর্তজা। যিনি বেঁচে থাকলে--এই দেশের আবোল তাবোল কমিউনিষ্ট রাজনীতিকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করার পথে অনেক মুল্যবান অবদান রেখে যেতে পারতেন। কেন আমি এই বিশ্বাস পোষণ করছি -এই নিয়ে অনেকে প্রশ্ন তুলতে পারেন, কেননা ডাক্তার মুর্তজার চেয়ে অনেক অনেক তেজী জ্ঞানী ও বিদ্যান ব্যক্তি এদেশের কমিউনিষ্ট রাজনীতিতে তলিয়ে গেল। সেক্ষেত্রে ডাক্তার মুর্তজা কোন ছাই। ঘটনাটা সেখানে নয়,-ডাক্তার মুর্তজা হলেন একজন দৃঢ় চেতা, কর্মী, অধ্যয়ণ ও অনুশীলনে শ্রদ্ধাশীল, এ কারণে তিনি গোঁড়া নহেন। তত্ত্ব যখন প্রয়োগে যায়, তখন তার ভাল মন্দ যাচাই হয়, পরীক্ষার মাধ্যমে সঠিকতা প্রকাশ পায়। এই কারণেই তিনি ছিলেন ব্যতিক্রম ধর্মী কমিউনিষ্ট।

১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর অন্যান্য বুদ্ধিজীবিদের সাথে তিনি ও পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শক্তির ঘাতক কর্তৃক নিহত হন। হন শহীদ। দেশ জাতি বিশেষ করে মেহনতি জনতা আজ ডাক্তার মুর্তজার ন্যায় কর্মবীরের প্রতীক্ষায় অধীর আগ্রহে--আপেক্ষা করছে।

ডাক্তার মুর্তজা নামটি চিরস্মরণীয় হয়ে
বাঙলার বুকে দীর্ঘজীবি হউক।

গোপন জীবনের সব চেয়ে ঘটনা বহুল জীবন

চট্টগ্রাম জিলার সীতাকুণ্ড থানার অন্তর্গত বড় কুমিরা নামক একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। চট্টগ্রাম ও বাংলাদেশের প্রাকৃতিক লীলাভূমির অন্যতম স্থান। এখান থেকে সমুদ্রতীর মাত্র এক মাইল। এখানে বাংলাদেশ রেলের-যক্ষা হাসপাতাল, একটি উচু পাহাড়ের চুড়ায়। এই পাহাড়ের চুড়ায় দাঁড়িয়ে পশ্চিম দিকে তাকালে সমুদ্রের বুকে নিমজ্জিত সূর্য্যাস্ত পরিদৃশ্য হয়। মাষ্টার দা সূর্য্য সেন এখানের সমুদ্র তীরে লবন সত্যাগ্রহ করার কর্মসূচীর আড়ালে ১৯৩০ সালের ২২ শে এপ্রিল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল করে নিয়েছিলেন।

বৃটিশ আমলে এখানে কংগ্রেস নেতা মহিমদাস ও বেনী মোহন দাস লবন সত্যাগ্রহ তথা আইন অমান্য আন্দোলন করেছিলেন।

এখানে সবচেয়ে প্রাচীন প্রসিদ্ধ বাড়ী হল রায় বাড়ী। প্রাক্তন জমিদার (শ্রীযুত শ্যামা চরণ রায়ের বাড়ী) শ্যাম রায়ের দৌহিত্র শ্রীযুত ধীরেন রায়ের সাথে আমার রাজনৈতিক জীবনের প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত একটা ধারাবাহিক সম্পর্ক ছিল। কারণ শ্রীযুত ধীরেণ রায় শুধু মাত্র আমার জীবনের আবাল্য বন্ধু ছিলেন না, তিনি ছিলেন আমার দুই মাতৃহারা শিশু সন্তান শ্রীমান দুলাল রায় ও মনজু রাণী মিত্রের পালক পিতা। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তিনি সেই গুরুভার বহন করে গিয়াছেন। অথচ তিনি ছিলেন চির কুমার। ১৯৭৮ সালে সত্তর বছর বয়সে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ১৯৫০ সাল থেকে ৭৮ সাল পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘ ২৮ বছরের মধ্যে কম করে হলেও ২৮ লক্ষ টাকা মুল্যের পৌতৃক সম্পত্তি বিক্রি করে তিনি জীবন ও জীবিকা নিবর্বাহ করেছেন। এবং বহু দরিদ্র ও অন্তরঙ্গ বন্ধুকে বসত করার স্থান দান করে গেছেন। দান করেছেন ভবিষ্যতে এ যথোপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য স্থানীয় যুবকদের ক্লাব ঘর করার স্থান। বন্ধুবর ধীরেন রায় ছিলেন বড় কুমিরা হাই স্কুলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। প্রধান উদ্যোক্তা ও

প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শ্রীযুত নিবারণ চন্দ্র দাস (সাধু)। দুঃখ জনক ঘটনা হল ঐ স্কুলেরই একজন ছাত্র কর্তৃক নিবারণ সাধু ১৯৫০ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নিহত হন। ধীরেণ রায়প্রথম দিকে ছিলেন কুমিরা হাই স্কুলের শিক্ষক। তিনিবহু ছাত্রকে নিজ বাড়ীতে রেখে শিক্ষার সুযোগ দিয়েছিলেন।

কুমিরা হাই স্কুলকে মজবুত করে গড়ার প্রয়োজনে সুদূর রাঙ্গুনিয়া নিবাসী ও রাজনৈতিক স্বতীর্থ কমরেড নরেশ চৌধুরীকে স্থায়ীভাবে কুমিরায় এনে নিজ বাড়ীতে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন।

ছাত্র জীবনে ধীরেন রায় ছিলেন সন্ত্রাসবাদী যুগান্তর দলের সদস্য। ১৯৩৩ সালে প্রথমবারের মত সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী দলের কাজে এখানে এসে আমি গেপ্তার হই। মাত্র ১ দিন ১ রাত হাজত বাস করতে হয়েছিল, যেহেতু আমি যে সন্ত্রাসবাদী তার কোন প্রমান পাওয়া যায়নি। সেই হতে আজ ১৯৮২ সাল পর্যন্ত (এই লিখার সময় কাল) এই বাড়ীর সাথে আমার ঘনিষ্ট সম্পর্ক। ১৯৫২ সাল থেকে আমার ছেলে এবং ৫৬ সাল থেকে মেয়ে এখানে অবস্থান করতেছিল। এই বাড়ীতেই প্রথমে মেয়ের পরে ছেলের বিয়ে অনুষ্ঠান উদযাপিত হয়। এই বাড়ীতে থেকে ছেলে-মেয়ে পরবর্ত্তী কালে মেয়ের স্বামী শ্রীমান মন্টু মিত্র লেখা পড়ার পাট শেষ করেন। এখনও আমার ছেলের পুত্র বধু (মীরা রায়) দুই নাতিন (মুনমুন ও মল্লিকা) এবং এক নাতি (বুলবুল) এখানে বসবাস করছে। এই কারণে আমার ছেলের পদবী সিকদার না হয়ে হয়েছে দুলাল কান্তি রায়। আমি ও অবসর সময়ে বিশ্রামের প্রয়োজনে নিজ বাড়ীতে না গিয়ে এখানেই আসি, অবস্থান করি।

বন্ধুবর ধীরেন রায়ের বহু সৎ ও বদগুণ ছিল। উভয় গুণই ছিল চরম ভাবে প্রবল। তাঁহার জন্ম গত রক্তের ধারায় জমিদারী রক্ত ছিল বিধায় বদগুণের এবং স্বদেশী আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী দল এবং সবশেযে সাম্যবাদী আদর্শের সংস্পর্শে থাকায় সৎগুণের সমাবেশ হয়েছিল। এই কারণে তিনি স্থানীয় জনগণের মধ্যে একই সাথে শ্রদ্ধা ও ঘৃণার পাত্র ছিলেন। তবে তাঁহার সাহস ছিল সর্বোচ্চ পর্য্যায়ের। এর জন্য তাঁকে সকলে সমীহ করে চলত, তাঁহার হৃদয়ের কোমল ও দুর্বল দিক যারা জানত ও বুঝত তারা অনেক বৈষয়িক সুবিধা তার নিকট হতে আদায় করে নিয়েছে।

আমার বাইশ বছরের গোপন জীবনে এই বাড়ীর সাথে অত্যন্ত নিবিড় সম্পর্ক ও হৃদয়ের সংযোগ ছিল। মাস দুই মাস পর এখানে নিয়মিত আসতাম। বাড়ীটি বিরাট একক ও বহু কামরা বিশিষ্ট বলে এখানে গুরুত্বপুর্ণ গোপন বৈঠক করা হত। কোন কোন সময় জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে মাসের পর মাস এখানে ছদ্ম নামে অবস্থান করেছি। বন্ধুবর নরেশ চৌধুরী, জনাব ফোরক আহমদ ও হারেছ আহমদ, শ্রীযুত নরেন দাস ও শ্রীযুত রমনী শীল। (ছোট কুমিরার বাসিন্দা) এবং কমরেড যজ্ঞেস্বর ভৌমিক ও তার স্ত্রী সিন্দু ভৌমিক ছাড়া আমার আসল নাম ও পরিচয় আর কেহ জানিত না। পরবর্ত্তীকালে জানতেন ঘোড়া মারার ডাক্তার কাফী, জনাব জাফর চৌধুরী এবং মোস্তফা আনসারী। আমি এখানে প্রথম থেকেই মাষ্টার নরেশ চৌধুরীর বড়ভাই হিসেবে পরিচয় দিয়েছিলাম। চট্টগ্রাম বন্দরে চাকুরী করি। অপর দিকে আমার ছেলে দুলাল ও মেয়ে মনজু হচ্ছে নরেশ বাবুর আর এক ভাই এর সন্তান, অর্থাৎ আমাদের উভয়ের ভাতিজা-ভাতিজী। তারা পিতৃমাতৃ হারা এতিম।

কমঃ নরেশ চৌধুরীর বাড়ী রাঙ্গুনিয়া থানার সৈদবাড়ী গ্রামে। আগেই বলা হয়েছে বড় কুমিরা উচ্চ বিদ্যালয়কে মজবুত করে গড়ে তোলার জন্য তাকে আনা হয়েছে। মাষ্টার নরেশ চৌধুরী এখানে স্থায়ী ভাবে বাস করার জন্য বাড়ী ছেড়ে আসেন। কিন্তু কিছু স্বার্থান্বেষী মহলের চক্রান্তের জন্য তিনি আজ বড় কুমিরা স্কুলে ঠাই না পেলেও ছোট কুমিরা স্কুলে স্থায়ী ভাবে শ্রদ্ধার সহিত অধিষ্ঠিত।

১৯৫৮ সালে দেশে যখন আইয়ুবী শাসনের দাপট বা তাণ্ডব নৃত্য চলছিল তখন আমি সাংঘাতিক ভাবে সায়েটিকা রোগে আক্রান্ত। অন্য দিকে রাজনৈতিক ক্রিয়া কর্ম ও সাময়িকভাবে স্থিমিত হয়ে আছে। এ সময়ে আমি নিরুপায় হয়ে এক নাগাড়ে চার পাঁচ মাস কুমিরার এই বাড়ীতে অবস্থান করতে বাধ্য হয়েছি। "সাবধানের মার নেই" এই কথা স্মরণে রেখে দিনের বেলা রায় বাড়ীতে থাকতাম এবং রাতের বেলা পার্শবর্ত্তী (দুই শত গজ দুরে) গৌরহরি মহাজনের বাড়ীতে গিয়ে ঘুমাতাম। গৌর হরি মহাজন বিপত্নীক ও অপুত্রক ছিলেন। তিনি ছাড়া আর কেহ বাড়ীতে ছিল না। আমাকে পেয়ে বুড়োর কিছুটা সুবিধা হয়। কোন

কোন দিন মসজি্দা গ্রামের শ্রীযুত রমনী শীলের বাড়ীতে গিয়েও ঘুমাইতাম। রমনীদার বাড়ীর দুরত্ব কুমিরার রায় বাড়ী হতে প্রায় এক মাইলের উপর। অবশ্য ঢাকা ট্রাঙ্ক রোডের পীস করা রাস্তা দিয়ে সাইকেলে বা পদব্রজে যেতে ২০/২৫ মিনিটের বেশী সময় নিত না।

রমনী শীল যৌবনে সন্ত্রাশবাদী বিপ্লবী দলের সাথে জড়িত ছিল। তখন তিনি কোন এক সাহেবের প্রাইভেট কারের ড্রাইভার ছিলেন।

এই সাহেবের গাড়ী দিয়ে তিনি মাঝে মধ্যে বিপ্লবীদের আনা নেওয়া করতেন।

সায়েটিকায় অক্রান্ত অবস্থায় নিজ দুই পায়ে ভর করে হাঠতে পারতাম না দশ কদমও। কিন্ত সাইকেলে বসে মাইলের পর মাইল চলতে পারতাম এবং কিছুটা পথ সাইকেলের উপর ভর দিয়ে হাঠা সম্ভব হত।

এই বাড়ী হতে শহরের দূরত্ব ১৫ মাইল। রোজ সকাল দশ/এগারটায় খাওয়া দাওয়া সেরে শহরে রওনা দিতাম। আর কাজ কর্ম সেরে পুনঃ রাত দশ/এগারটায় সাইকেলে চেপে কুমিরায় ফিরতাম। কোন কোন দিন ফিরতে রাত বারটা একটাও হয়ে যেত।

এখানে যে বছর এক নাগাড়ে ৪/৫ মাস ছিলাম সেই বছর পুরাতন বাড়ী হতে ছোট ভাই ফনীন্দ্র সিকদার ও তার স্ত্রী পুত্রকে কুমিরায় এনে, হালের গরু ক্রয় করে ধীরেন রায়ের জমি গুলি নিজেরা চাষাবাদ করেছিলাম। সে বছর প্রচুর ফসল পাওয়া গেল, যা দিয়ে দুই বছরের খাওয়ার সংস্থান হয়েছিল। ঐ বছরই বড় রাস্তার ধারের এক খণ্ড জমিতে প্রদর্শনী প্রতিযোগিতামূলক ধান চাষ করেছিলাম। তাতে করে আমি সীতাকুণ্ড থানার মধ্যে প্রথম এবং চট্টগ্রাম জেলায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে পুরস্কার পেয়েছিলাম।

এই রায় বাড়ীতে গড়া হয় বিরাটাকারের ফুলের বাগান। ফুলের বাগান করা আমার ছোট বেলা থেকে অভ্যাস। ইহা আমার আজীবনের হবি, এখানে লাগিয়েছিলাম ১০/১২ রকমের গোলাপ সহ ৭০/৮০ রকমের ফুল গাছ। ধীরেন বাবুর পুরাতন পড়ো জমিদার বাড়ীকে নতুন করে আধুনিক ঢং-এ সাজানো হয়। এই বাড়ীর ভিতরের আঙ্গিনায় ছিল বেডমিনটন খেলার স্থান।

কাছারী ঘরে প্রায়ই বসত গানের আসর। বর্তমান বাংলাদেশে নাট্য সম্রাট খেতাব পাপ্ত শ্রীযুত অমলেন্দু বিশ্বাস ওরফে ননী বিশ্বাস ছিল আমার ও ধীরেন বাবুর অন্তরঙ্গ বন্ধু। তার বাড়ী ছিল ছোট কুমিরা গ্রামে। বাড়ীতে ছিলেন একমাত্র মা। ননী প্রথম জীবনে চাকুরী করতেন রেলে। সে সময় প্রতি সপ্তাহে বাড়ী আসতেন মাকে দেখার জন্য। সেই উপলক্ষে এই বাড়ীতে এসে গানের আসর জমাতেন। নাটকের উপর ছিল তার অসামান্য দক্ষতা। মাঝে মধ্যে তিনি একা সিরাজদৌল্যা নাটক অভিনয় করে শুনাতেন। এখানে আমি সর্ব সাধারণের নিকট একজন উন্নত মানের কৃষিবিদ হিসেবে পরিচিত ছিলাম। আমার প্রতিটি কাজ এবং চলাফেরা ও ব্যবহার জনগণের মধ্যে দারুণ উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি করে।

এই বাড়ীর সাথে চট্টগ্রামের অনেক বিপ্লবী কর্মীর বিচিত্ররূপে সম্পর্ক ছিল। কমরেড অনঙ্গ সেনের বিয়ে গোপনে এখানে অনুষ্ঠিত হয়।

কমঃ আবদুল মালেক ও তার স্ত্রী বিয়ের আগে এখানে বসে বিয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কমঃ সামশুল আলম ও তার প্রেমিকার সাথে প্রেমের চুড়ান্ত পরিনতি এই বাড়ীতে বসে ঘটিয়েছিলেন। কমঃ বশীরও এই বাড়ীতে এসে তার স্ত্রী শেলীর সাথে মিলিত হতেন। আমার মেয়ের পক্ষের প্রথম নাতি স্নেহাষ্পদ শ্রীমান রকেট মিত্রের জন্মস্থান এই বাড়ী। সেই সময় হতে আমি 'নানা' উপাধি প্রাপ্ত হই।

এই বাড়ীকে আমার পুত্র কন্যা সহ বসবাস উপযোগী করে দেওয়ার জন্য শারিরীক শ্রম দিয়ে (দিনের পর দিন) সাহায্য করেছে পাহাড়তলী কেরেইচ সপের বন্ধুবর জালাল আহমদ[১], জাফর আহমদ, আবদুর রউফ সর্দার, আবদুল লতিফ মিস্ত্রী, কমঃ জোহা ও খান সাহেব সহ রেলের আরও অনেকে।[২]

এক কথায় এ বাড়ীর ইতিহাস বড়ই বিচিত্র এবং ঘটনা বহুল। এই বাড়ীতে বসেই আমার যৌবনের একমাত্র প্রেমিকা সীমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত উভয়ে গ্রহণ করি (১৯৬০ এর দশকে)।

১। যিনি আল বদর রাজাকার কতৃক ধৃত হয়ে পাক বাহিনীর হস্তে শহীদ হয়েছিলেন।

২। ১৯৭১ সালের যুদ্ধের সুচনায় মুক্তি যোদ্ধারা এই অঞ্চলে প্রথম এক পাঞ্জাবী সামরিক অফিসারকে হত্যা করে তার গাড়ীটিএই বাড়ীতে এনে রেখেছিল। প্রধানতঃ ঐ কারণেই এর ২/৩ দিন পর পাঞ্জাবীরা এসে এই বাড়ীতে আগুন লাগায়। তার পর এই বাড়ীর সমস্ত সম্পদ (দালানের ইটসহ) লুট পাট হয়ে যায়। সংক্ষেপে এই হল প্রসিদ্ধ রায় বাড়ীর ইতিকথা যার সাথে বহু বিপ্লবী গাথা জড়িত।

এই সমস্ত কাজ হচ্ছিল আমাকেই মধ্যমণি করে। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় হল—পাকিস্তানের গোয়েন্দা বিভাগ এখানের বিষয়ে ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন অথবা চরম বেকুপ (বোকা) অথবা সচেতন ভাবে এড়িয়ে যাচ্ছিলেন। শহর বা শিল্পাঞ্চালে এবং শোলকাটা গ্রাম থেকে যাকে গেপ্তার করার জন্য গোয়েন্দারা হন্য হয়ে ঘুরছে, এখানে সেই লোকের সাথে এত কিছুর প্রকাশ্য সংযোগ থাকা সত্বেও তারা সেই সুযোগের সৎ ব্যবহার করেনি। আসেনি কোনদিন তল্লাশী বা জিজ্ঞাসাবাদ করতে।

এর প্রধান কারণ ; এখানে আমার গতিবিধি ও অবস্থান ছিল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। বিন্দু মাত্র সন্দেহের সৃষ্টি হতে পারে এমন কোন পথ না রেখেই পরিকল্পিত ভাবে সব কিছু করা হয়েছিল।

এক দিন এক মজার ঘটনা ঘটে। রায় বাড়ীর সামনে প্রায় ৪০ শতক জমিতে আখ খেত করেছি। মাটির প্রায় সাড়ে তিন হাত গভীরে আখের বীজ বপন করা হয়। উদ্দেশ্য প্রদর্শনীতে দেওয়া ও অধীক মূল্য পাওয়া। এই আঁখ অবশ্য বিশেষ ধরণের আখ, যা দিয়ে চিনি করা হয় না। মুখে চিবিয়ে খায়। নরম, কড়া মিষ্টি ও প্রচুর রসে ভরতি।

এক দিন শীত মৌসুমে নতুনপাড়া সেনা নিবাসের এক দল সৈনিক শীত কালীন মহড়ায় বের হয়ে বেলা দুইটার দিকে আমার সেই আখ খেতে এসে লুকায়। আমি সেই দিন বাড়ীতে ছিলাম। পাড়ার লোক জন এসে খবর দিল সৈন্য বাহিনী এসে বাড়ী ঘেরাও করে ফেলেছে। খবর শুনে আমি তারাহুড়া করে বাড়ীর পেছনে আর একটি আখ খেতে লকিয়ে রইলাম। বাড়ীতে বলা হল বাড়ী তল্লাশী শেষ হলে তারা যেন আমায় সংকেত দিয়ে জানায়। সংকেত হল পুঁজার ঘরের কাসা, ঘন্টা ও শাঁক বাজানো।

প্রায় তিন চার ঘন্টা অতিবাহিত হওয়ার পরও কোন সংকেত না পেয়ে অধৈর্য্য হয়ে উঠেছি। অপর দিকে বিষাক্ত "ওড়লী পিঁপড়া"র কামড়ে প্রাণ প্রায় ওষ্ঠাগত। পিঁপড়ার কামড়কে ধৈর্য্য ধরে সহ্য করার জন্য এক পর্য্যায়ে যখন জিবে কামড় দিলাম, সঙ্গে সঙ্গে দৈব শক্তির ন্যায় পিঁপড়ার কামড় বন্ধ হয়ে গেল। বুঝতে কষ্ট হলো না জিবে কামড় দেওয়া একটি প্রকৃতিক ঔষধ বা প্রতিষেধক।

অবশেষে সংকেত এল, আখ খেত থেকে উঠে বাড়ীতে এসে জানতে পারলাম-সৈন্যেরা শীত কালীন মগফাইট বা মহড়ায় বের হয়েছেন। অন্য কোন বদ উদ্দেশ্যে এখানে আসেনি।

সংক্ষেপে এই হল কুমিরার রায় বাড়ীর সাথে গোপন জীবনের ইতিবৃত্ত, এখানে এখনও রয়েছে আমার পাঠ কক্ষ ও বিশ্রামাগার এবং পুস্তকের পাঠাগার, এই লিখা লিখছি এখানে বসেই আজ ২০ই আগষ্ট ১৯৮২ ইং সাল।

গোপন জীবনে সামাজিকতা

আমার বাইশ বছরের গোপন জীবনে-পার্টি সদস্য-সদস্যা ও তাদের পরিবার-পরিজনকে কেন্দ্র করে বেশ কয়েকটি সামাজিক, বৈবাহিক ইত্যাদি দায় দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে, পার্টি সংগঠনের স্বার্থে এই সব দায়িত্ব পালন করতে হয়, অংশ গ্রহণ করতে হয়, অনেক সময় মূল দায়িত্বও পালন করতে হয়। গোপন জীবনের বাইশ বছরের মধ্যে যে কয়টি উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে সেগুলি হচ্ছে ঃ—

ক) রাঙ্গুনিয়া থানার লালা নগর গ্রামের একটি গরীব পরিবারের বাল-বিধবা মেয়েকে পাত্রস্থ করার দায়িত্ব পালন, এই উপলক্ষে ঐ সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক আমি ও কমঃ গৌরাঙ্গ বসাক পাত্রকে বিবাহ বাসরে উপস্থিত করার জন্য পদ ব্রজে ৪০ মাইল হেটে বরকল বাজারে গিয়েছিলাম, এবং তার পর দিন-পুনঃ পায়ে হেটে-রাঙ্গামাটি হয়ে লালা নগরে হাজীর হয়ে ঐ বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেছিলাম।

খ) দ্বিতীয় অনুষ্ঠান ছিল ঃ—কানুনগোপাড়া কলেজের বিজ্ঞানের ডিমোনেষ্টেটার কমঃ জ্যোতির্ময় বিশ্বাসের সাথে উত্তর ভূর্ষি গ্রামের এক পার্টি পরিবারের মেয়ের বিয়ে অনুষ্ঠান, বর কনে দুইজনেই ছিল

অত্যান্ত সরল মনা নিরলস কর্মী। অথচ অত্যন্ত লাজুক প্রকৃতির। এদের লাজুক প্রকৃতি এতই অস্বভাবিক ছিল যে বিয়ের এক বছর পর এক দিন আবিস্কার হল যে এরা তখনও পর্যন্ত দুইজনে স্বতন্ত্র জীবন যাপন করতেছে। পরবর্তিকাল এদের সাথে সাক্ষাৎ হলেই এই ঘটনা নিয়ে হাঁসি ঠাট্টার হৈহল্লুর পরে যেত।

গ) তৃতীয় ঘটনা ঘটতে গিয়ে অঘটন ঘটে গেল। কমঃ নগেণদে ছিল চট্টগ্রাম জেলার এক কালের জেলা কমিটির সদস্য। কাজ করতেন ফটিক ছড়ি থানার চা বাগানে, অত্যধীক সৎ, সরল, সংগ্রামী কমরেড। বাথুয়া ডাকাতী মামলার সন্ত্রাসবাদী-জেল ফেরত রাজবন্দী, উন্নতমানের সংগঠক। তিনি যৌবন ও পৌড়ত্বের সন্ধিক্ষণে এসে বিয়ে করার কথা ভাবছিলেন। দেখে শুনে নোয়াপাড়া গ্রামের কমঃ অদ্ধেন্দু পালিতের বোনের সাথের ঐ মানসিকতা নিয়ে বছর খানেক-মেলা মেশার পর হঠাৎ করে মত পরিবর্তন করে বসলেন। পরিনামে ঐ মেয়েটির মস্তিষ্ক বিকৃতি দেখা দিল এবং বেশ কয়েক বছর পর পাগল থেকে মারা গেল।

ঘ) চতুর্থ ঘটনা ঘটে কমঃ অনঙ্গ সেনকে নিয়ে। যৌবনে তিনি এক ম্যাডিক্যাল স্কুলের ছাত্রীকে ভাল বাসতেন। ছাত্রীটি ডাক্তারী পাশ করে কমঃ সেনকে বৃদ্ধাঅঙ্গুলি দেখিয়ে সরে পরলেন। কমঃ সেন চাপা ক্ষোভে গুমরিয়ে যৌবন পার করে-পৌঢ়ত্বে পা দিলেন। তার পর নিজেই মনোস্থির করলেন এক স্কুল শিক্ষয়র্থীর সাথে বিয়ে করবেন। বিয়ে হতে হবে গোপনে। তাই এই বিয়ের আয়োজন করা হলো আমাদের সেই প্রসিদ্ধ কুমিরার রায় বাড়ীতে। এই বিয়ের পর কমঃ সেনের দাম্পত্য জীবন ভালই চল্ছে। বলা চলে সুখে না হলেও শান্তিতে আছেন।

ঙ) পঞ্চম ঘটনা ঘঠে আনোয়ারা থানার বন্দর গ্রামের কমঃ প্রকৃতি গুপ্তকে কেন্দ্র করে, এই কমঃ অত্যন্ত সরল প্রকৃতির। মা ও এক ছোট বোন নিয়ে তার পরিবার। এক কালের সচ্ছল মধ্য বিত্ত ঘরের সন্তান। লিখা পড়া·মেট্রিক উত্তীর্ণ হতে পারেনি। অথচ শারীরিক শ্রমের প্রতি ঘৃণা না থাকলেও অভ্যাস্থ নয়। গান আর মুরালী বাঁশী তার হবি। তার সাথে বিয়ে দেওয়া হল রোসাঙ্গিরী নামক গ্রামের এক মধ্য বিত্ত পরিবারের মেয়ের সাথে। পরিবারটি চন্দ্র মল্লিকার ন্যায় অনেক গুলি কন্যা

সন্তান নিয়ে লজ্জায় মাথা নত করে আছে। সমাজের সামনে মুখ দেখাতে পারছেনা। বড় সন্তানটি আমাদের পার্টির একজন একনিষ্ঠ কর্মী। নাম সমীরদেব। বিয়ের পর প্রকাশ পেল মেয়েটি অত্যধীক উচ্চাভিলাসী ও সৌখিনতা প্রিয়, তার চাহিদা পূরণ না হওয়ায় দুইটি সন্তানের জননী হয়েও তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে। পরিবারের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি হয়। শেষ পরিণতিতে কমঃ প্রকৃতি গুপ্ত দেশান্তরি হয়ে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে একটা চাকুরী যোগাড় করে কলকাতায়-বসবাস করতে থাকে।

চ) ষষ্ঠ ঘটনাটি ঘটে আমার নিজের কন্যা কল্যানীয়া মন্‌জু রানীর সাথে কমঃ মন্টু মিত্রের বিয়ে। আজম খানের শাসনামালের পূর্বে এই মেয়ে লিখা পড়া করতো সুখেন্দু বড়ুয়া নামে এক কমরেডের পাঠানটুলীর বাসায় থেকে। ৯২ (ক) ধারা জারীর পর সেই বন্ধুটি গেপ্তার হয়ে যাওয়ায় মন্‌জুকে নিয়ে আসা হয় কুমিরায় কমঃ ধীরেন রায়ের বাড়ীতে। অগত্যা তাকে সেই সময় বিয়ে দেওয়ার চিন্তা ভাবনা করা হয়। পাত্র ও একটা সাধারনভাবে মনপুত হয়। সেই অবস্থায় মেয়ের মতামত জানার সময় জানা গেল মন্‌জু ইতি মধ্যেই সিদ্ধান্ত করেছে শ্রীমান মন্টুর সাথে বিয়ে বসবে এবং এই মর্মে তাদের মধ্যে একটি "ভদ্র লোকি" চুক্তিও হয়েছে।

শ্রীমান মন্টু তখন আইএ ক্লাসের ছাত্র। পিতা রক্ষনশীল উকিল। এবং পুত্রের বিনিময়ে ২০/৩০ হাজার টাকা রোজগার করার পরিকল্পনা নিয়ে বসে আছেন। তিনি কিছুতেই আমার ন্যায় চাল চুলাহীন মানুষের কন্যার সাথে পুত্রের বিয়ে দিতে নারাজ। শ্রীমান মন্টুকে জিজ্ঞাসা করাতে এক দিকে জানা গেল তার নিজের সম্মতি অপর দিকে পিতার তরফ থেকে প্রতিবন্ধকতা।"

এই জটিল সমস্যার সমাধান করা হল এই ভাবে, "তোমরা যখন উভয়ে এক মত হয়েছ পরস্পরকে ভালবেসে বিয়ে করবে। তখন বিয়ে অবিলম্বে হয়ে যাক। তারপর ছেলে মেয়ে দুইজনেই আমার বন্ধু ধীরেন রায়ের বাড়ীতে থেকে লিখা পড়া করবে, আত্ম নির্ভরশীল হওয়ার চেষ্টা নেবে, যতদিন আত্মনির্ভরশীল না হবে ততদিনের আর্থিক দায়িত্ব আমাদের।"

শ্রীমান মন্টু এতে রাজী হয়ে তার পিতা-মাতার অমতে মন্‌জুর সাথে বিয়ের সিদ্ধান্ত করে অত্যন্ত বলিষ্ট ভূমিকা পালন করেছে। পরবর্তীকালে

তারা নিজের চেষ্টায় কিছুটা বন্ধু ধীরেন রায়ের সহযোগিতায় শ্রীমান মন্টু বি-এ পাশ করে ভাল শিক্ষক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আর মন্জু ঘর সংসারের যাবতীয় দায় দায়িত্ব পালন করতে করতে অত্যন্ত ধৈর্য্যের সহিত বি, এ, পর্য্যন্ত লিখা পড়া চালিয়ে এসেছে।

এখানে একটি বিষয় স্মরণ যোগ্য যে শ্রীমান মন্টুর পিতা শ্রীযুত বীরেন্দ্র মিত্রের উদ্যোগে গনক ঠাকুর দিয়ে তৈরী ৬৪ হাত লম্বা ঠিকুজী (কুষ্ঠি) দেখিয়ে দৃঢ়ভাবে বলতেন এই বিয়ের ফল শুভ নয়। ঘটনায় প্রমান করেছে এই বিয়ের পরিনাম অত্যন্ত শুভ, কারণ তাদের এখন তিনটি পুত্র সন্তান। একটি ও কন্যা নেই। বড় সন্তান রকেট এখন আইনের ছাত্র, মেজো (লুনা) ম্যাট্রিক পাশ করে কারিগরি বিদ্যালয়ে পড়ছে, সেজো (এ্যাপলো) ক্লাশ সেভেন এর ছাত্র।

ছ) সপ্তম ঘটনার নায়ক-নায়িকা কমরেড মালেক-মালেকা :—

কমরেড আবদুল মালেক চট্রগ্রাম জেমজ ফিন্‌লে কোম্পানীতে কেরানীর কাজ করতেন পরে কমটোমিটার। বেশ মোটা অংকের বেতন পেতেন। বাড়ী পটিয়া থানার উজীরপুর গ্রামে। ফর্সা হৃষ্ট পুষ্ট নাদুস নুদুস দেহের গঠন। স্বাস্থবান সুপুরুষ। এক কথায় বহু নারী মন হরণ কারী দেহ কান্তি পুরুষ জন, বয়ষ তখন সাতাশ আটাশ। সৎ ও সংগ্রামী চরিত্রের লোক বিধায় জড়িয়ে পড়লেন শ্রমিক কর্মচারীদের আন্দোলন সংগ্রামে। আসলেন পার্টির সংস্পর্শে।

অপর দিকে কমরেড সামশুল আলম এর বাড়ী রাউজান থানার রমজান আলী হাটের নিকটে, সাত বোন চম্পকের ন্যায় এক ভাই চম্পর্ক। পিতা অবসর পাপ্ত রেলের ষ্টেশন মাষ্টার। মাতা আধ পাগলী। পরিবারের বড় সন্তান। তিনি আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে গড়িয়ে যুবলীগ সংগঠনের মাধ্যমে পার্টির সাথে সংযুক্ত হলেন। তাহার কনিষ্টা বোন জ্যোৎস্না তখন ও অবিবাহিতা। লেখা পড়া ম্যাট্রিক পাশ করে গলগ্রহ হয়ে আছেন তার পার্টিগত যোগ্যতা পাটির নীতির প্রতি অন্ধ ভক্তি, যা মেয়েদের ক্ষেত্রে বেশীর ভাগ হয়ে থাকে বিবাহ বৈতরনী পার হওয়ার প্রয়োজনে।

যা হউক দুই কমরেডের পারিবারিক সুখ-সুবিধা বিচার করে কমরেড মালেকের সাথে জ্যোৎস্নার বিয়ের সিদ্ধান্ত হলো, বিয়ের আগে বছর খানেক

তারা পরস্পরকে যাচাই করার সুযোগ পেল। অনুরূপ সুযোগ পেল কমরেড সামশুল আলম মীরশ্বরী থানার হাদি ফকিরের হাটের নিকটের কমঃ আবুল কালামের নিকট আত্মিয়ার সাথে বিয়ের করার।

ঐ সময় থেকে আমি জ্যোৎস্নাকে "মালেকা" নামে ডাকতাম। বিয়ের আগে একদিন দুই জনে আমার সামনে শপথ গ্রহণ করলো তারা উভয়ে সাধ্যমত পার্টির কাজ করে যাবে। এই কাজে পরস্পরকে সাহায্য করবে। কোন সময়ে প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়াবে না।'

এক দিন যথারিতি বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের পর-রেলের প্রাইমারী স্কুলে একটি মাষ্টারীও জুটে গেল পোর্ট কলোনীতে। বাহ্যিক ভাবে মনে হত দুইজনে মিলে বেশ সুখে শান্তিতে আছে।

সময়টা ছিল ১৯৬৭/৬৮ সাল। চট্টগ্রামে শ্রমিক ফ্রন্টে কাজের ধুম পড়ে গেছে। নিঃশ্বাষ ফেলার ও সময় কারও নেই। এমন সময় কমরেড মালেককে দেখা গেল ঘড়ির কাটা দেখে রাত ১০ টায় বাসায় ফিরার আয়োজন করছে প্রায় রোজই। অন্যান্য কর্মীরা তখন রাত জেগে কাজ করছে, অথচ এই কাজের চাপের জন্যই কমরেড মালেক মোটা বেতনের চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে পার্টির সর্বক্ষণের কর্মীর খাতায় নাম লিখিয়েছে। "মুখের চেহারা নাকি অন্তরের প্রতিচ্ছবি" মালেকের চেহারাতে সেই বিমর্ষ ভাব লক্ষ্য করে এক দিন জানতে চাইলাম-কি ব্যাপার-? মিসেস মালেকা বুঝি আসল রূপ ধারণ করেছে? মালেক প্রথমে একটু লজ্জিত হয়ে-পরে জানতে চাইলেন, আপনি কি করে জানলেন? বললাম বই পুস্তকে মনস্তত্ব না পড়লেও-মানুষের বাস্তব মন নিয়ে নড়া চড়া করিতঃ বুঝতে কষ্ট হওয়ার কথা নয়। তখন সে মন খুলে প্রকাশ করল, যতই আন্দোলন সংগ্রাম বাড়ছে, ততই জ্যোৎস্না দিন দিন আতঙ্কিত হয়ে উঠ্‌ছে এবং রাতে সকাল সকাল বাসায় ফিরার জন্য পীড়া পিড়ি করছে। রাত ১১টার পর হলে দরজা খুলে দিতে চায় না। কি করি বলুনতঃ? প্রশ্ন করলাম তুমি কি তাকে কোন সময় বুঝিয়েছ? উত্তরে সে জানাল শুধু বুঝানো নয়, বুঝিয়ে তাকে বিরত করতে না পেরে তার সাথে বিয়ের আগে যে 'ভদ্রলোকের চুক্তি' হয়েছিল তাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছি, তাতে ও কোন ফল হয় নি।

এর পর তাকে একটা চরম ঔষধ প্রয়োগ করার পরামর্শ দিলাম। আশা করি এতে তড়িৎ ফল পাওয়া যাবে। আজকে বাসায় গিয়ে তাকে আদর করে পার্শ্বে বসিয়ে বলবে "দেখ রাজনীতি করি বলেই তোমার আমার পরিচয়, পরিচয় থেকে বিয়ে। সেই রাজনীতির পথে যদি তুমি বাধা বা অন্তরায় হয়ে দাড়াও তাহলে আমার শেষ কথা জেনে রাখ-তাহলে পার্টি ছাড়তে পারবনা। ছাড়তে হলে তোমাকেই ছাড়তে হবে। তাছাড়া ইহাও তোমার মনে রাখা উচিত যে ইসলামী আইনে তুমি ছাড়া ও আমার ঘরে বিনা বেতনে কেবল খাওয়া-পড়ার বিনিময়ে, দিনে রাতের জীবন সঙ্গিনী হওয়ার আরও তিনটি পদ খালি পরে রয়েছে। কাজেই এই সব কথা ভেবে চিন্তে চলবে। নতুবা নিজের দুঃখ নিজেই ডেকে আনবে।" এই ঔষধ প্রয়োগে সাময়িক ভাবে প্রতিকার হল বটে, শেষ পরিণতিতে-জ্যোৎস্নার মধ্যে তার মায়ের রোগ সংক্রামিত হয়ে গেল। মেয়েটিবংশ গত বা জন্ম ও পরিবেশ গত হয়তঃ বদরাগী-স্বভাবের কারণে ঐ ঔষধে-ভাল ফল পাওয়া যায়নি। যদি নারী শান্ত চরিত্র ও সংবেদনশীল হৃদয়ের হয়, তাহলে এতে অত্যন্ত চমৎকার-ফল পাওয়া যায়। এই হল মালেক-মালেকার সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য।

অষ্টম কর্মকাণ্ড ঘটে আমার নিজ পরিবারে ঃ

আমার এক মাত্র ছেলে শ্রীমান দুলাল কান্তি রায় এবং আমার রাজনৈতিক স্বতীর্থ-শ্রীযুত শ্যামাচরণ দে মহাশয়ের এক মাত্র কন্যা কল্যানীয়া মীরা রাণীকে কেন্দ্র করে। যে বছর শ্রীমান দুলাল ম্যাট্রিক পাশ করে কমার্স কলেজে ভর্তি হল-সে বছর মীরা রাণীও ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী। বয়সের তেমন ব্যবধান ছিলনা। প্রথমবারে অকৃতকার্য্য হলে ও ২য় বারে উত্তীর্ণ হল। এই সময়ে মেয়ের বিয়ে নিয়ে বন্ধুবর শ্যামদা ভীষণ বিপদে পড়লেন। একেতঃ গরীব ছা পোষা মানুষ। স্বর্ণ কারের কাজ করে দিনের রোজগার দিনে শেষ। নূন্ আনতে পান্তা ফুরায় অবস্থা, কোন প্রকার সঞ্চয় নেই। কিছুতেই পণের দাবী মিটাতে পারেনা। তদুপরি মেয়েটি ঠিকুজীতে লিখাছিল অকালে নিঘাত বৈধব্য। কাজেই পাত্রী পছন্দ হলেও ঐ মেয়ের ঠিকুজী দেখে কেহ অগ্রসর হতে চায় না। আমি আবার বাল্য কাল থেকে এসবে বিশ্বাস করিনা। তাই বন্ধু শ্যামদাকে শর্তাধীনে কথা দিলাম, যদি ছেলে-মেয়েরা পরস্পরকে পছন্দ করে

তাহলে আপনার মেয়েকে পুত্র বধু করে ঘরে নেব। আপনি অযথা দুচিন্তা করবেন না। অবশেষে ছেলে-মেয়ে দুইজনে অঙ্গিকার বদ্ধ হয়, মীরার ম্যাট্রিকের ফল বের হওয়ার পর কোন এক সময়ে বিয়ের দিন ধার্য্য করা হবে। ইতি মধ্যে শ্রীমান দুলাল-সন্দ্বীপ দ্বীপে ফুটবল ম্যাচ খেলতে গিয়ে বাম পায়ে আঘাত নিয়ে ফিরে আসে। দুরারুগ্য সায়টিকা রোগে আক্রান্ত হয়ে ৫/৬ বছর বিছানায় শয্যাশায়ী থাকে। লিখা পড়া বন্ধ হয়ে যায়। বিয়েতঃ দুরের কথা ছেলের জান বাছানো ফরজ হয়ে দাড়ায়। মেয়েটি ও 'নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল' প্রবাদ বাক্যের ন্যায় মনস্থির করে বসে থাকে—প্রয়োজনে শিক্ষকতা করে হলেও এই পঙ্গু স্বামীকে লালন পালন করবে। অবশেষে দীর্ঘ ৬ বছর পর ছেলেটি সুস্থ হয় তৎকালীন যুক্ত পার্টির সাহায্যে (৬৫ সালে)। ডাক্তার ওদুতের (প্যাথোলজিস্ট) সহায়তায় বাংলাদেশ খ্যাত ডাক্তার শ্রদ্ধেয় নূরুল ইসলাম সাহেবের মনোস্তাত্ত্বিক চিকিৎসায় ছেলেটি রোগ মুক্ত হয়ে সংসার জীবনে হাতে খড়ি নেয়। তাদের জেষ্ঠ সন্তান কল্যাণীয়া মুনমুন রায় ১৯৮৩ সালে ম্যাট্রিক ক্লাশের ছাত্রী। মেজো শ্রীমান বুলবুল রায়, তৃতীয় শ্রেণীতে, কনিষ্ঠা কল্যাণীয়া মল্লিকা রায় শিশু শ্রেণীর ছাত্রী। হিন্দু গণকদের ঠিকুজি আমার বিজ্ঞান সম্মত মন ও মানসিকতার নিকট—দুই দুই বার করে পরাজিত হল। প্রমাণিত হল ঐগুলি হল অন্ধ কুসংস্কার। এই ধরনের আরও অনেকগুলি বিয়ের আমি ছিলাম প্রধান হোতা। তার মধ্যে একটি ছিল বুলু ও হিরেন্দ্রের বিয়ে। যা স্থানাভাবে লিখা সম্ভব হল না।

পিতা কন্যা জামাতা

গোপন জীবনের শুরুতে যারা বয়সে ছোট তারা আমাকে দাদা, ভাই ভাইয়া ইত্যাদি সম্বোধনে ডাকতো। কিন্তু যেদিন ১৩৬৪ সালে আমার মেয়ের প্রথম সন্তান শ্রীমান রকেট মিত্র দুনিয়াতে আগমন করল, সেই দিন আমাকে সর্ব প্রথম নানা বলে যিনি সম্বোধন করেছিলেন, তিনি হচ্ছেন স্নেহ-প্রিয় কমরেড আবদুল মালেক। সেদিন হতে তামাম বাংলা দেশে আমি নানা নামে খ্যাতি অর্জন করতে থাকি। সে হতে আজ পর্যন্ত প্রতিদিন সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে--এ যেন লঙ্কার রাবনের বংশের ন্যায় 'সাত লক্ষ পুত্র যার তের লক্ষ নাতি-পতি। এক পুরুষ অতিক্রান্ত হওয়ার পর অগণিত নাতি-নাতনীর সন্তান সন্ততিরা এখন 'নানা মামা' নামে ডাকতে শুরু করেছে। তাদের অর্থাৎ নাতিদের মায়েরা সেই সুবাদে আমায় কেহ কেহ

বাবা বলে সম্বোধন করে, কমঃ মেহেদীর পিতা (জনাব আকবর আলী) ডাকেশশুড় বলে। অনুরূপ একটি কন্যা জামাতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল কমঃ মেহেদীর মা ও বাবার সাথে। যেহেতু তাদের সকল ছেলে মেয়েরা আমাকে আন্তরিক ভাবে নানা বলে ডাকে। তখন মেহেদীর মা ও (আম্বিয়া খাতুন) আমার সামনে না এসে পারলেন না। তাঁহার জীবনে এই প্রথম ঘটনা—কোন অপরিচিত পুরুষের সামনে নিঃসংকোচে আগমন। যে দিন কমরেড্ মেহেদীর মা আমার সামনে এসে দেখা দিয়েছিলেন সে দিন একটি দুর্ঘটনা ঘটতে যাচ্ছিল।

খুব সম্ভবতঃ সালটি ছিল ১৯৬৬ সাল। কমরেড মেহেদীর বাড়ীতে নোয়াখালি জিলা কমিটির বৈঠক হচ্ছে গোপনে। কমঃ বশীরও সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিল। বৈঠকটি গোপনে বিধায় ভিতর বাড়ীর কোন এক কামরায় বসেছি। উপস্থিত ছিলেন সর্ব কমরেড্ নীল মনি কবিরাজ, ডাঃ নিজামুদ্দীন, নানা ছালাহ উদ্দীন, ডাঃ আবুল খায়ের এবং নূরুল হক চৌধুরী (মেহেদী)। বৈঠকের এক স্তরে আমি যখন সংশোধনবাদী মনি সিংহ গোষ্টীর জাতীয় আন্তর্জাতিক দেউলিয়াপনা, বুর্জোয়া লেজুড় বৃত্তি ইত্যাদির ফিরিস্তি বর্ণনা করতে থাকি, তা শুনতে শুনতে ডাক্তার নিজামূদ্দীন মুচ্ছিত হয়ে পড়লেন। গা তার শিউড়ে উঠে ১০৩/৪ ডিগ্রি জ্বর এসে গেল। শরীর গেল অবশ হয়ে। সেই দিন সৌভাগ্য বশত: উপস্থিত একজন ডাক্তার ও একজন অভিজ্ঞ কবিরাজ ছিল। নতুবা ঐ দুর্ঘটনা চরম পর্য্যায়ে যেতে পারত।

এই যে নাতি নাতিনের বদৌলতে নিঃখরচায় মেয়ে জামাই পাওয়া ইহা আমার রাজনৈতিক জীবনে একটি উপরিপাওনা, বাংলার এমন কোন জেলা 'মহকুমা' এলাকা নেই যেখানে আমার দুই চার জন নাতি-নাতীন ও মেয়ে জামাতা নেই, এদের মধ্যে আবার এমন ২/৪টি মেয়ে জামাই পেয়েছি যারা সতিাকারের পিতা ও স্বশুরের ন্যায় শ্রদ্ধা ভক্তি করে। উদাহরন স্বরূপ বলা চলে চট্টগ্রামের কমঃ আবদুল মালেকের পিতা, টাঙ্গাইলের কমঃ আতোয়ার রহমানের মা ও বাবা, নোয়াখালীর কমঃ শফীকুর রহমানের মা, রাজশাহীর গোপালপুরের কমঃ এনামুলের বাবা এবং বগুড়ার শহীদ কমঃ রাবেয়া আকতার বেলীর মা ও বাবা প্রমুখের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য।

এইতঃ গেল দুই দিক, অপর দিক হল গোপন জীবনেই গোপনীয়তা রক্ষার প্রয়োজনে থাকতে হয়েছে রোজা, খেতে হয়েছে সেহ্রি, ইফ্তারী, পড়তে হয়েছে নামাজ, প্রার্থনা করতে হয়েছে মুনাজাত করে। এমন কি দুই একবার জানাজাতেও সামিল হতে হয়েছে। নাম ধারণ করতে

হয়েছে অগনিত। বচনে বলনে সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়েছে প্রতিনিয়ত। এত সাবধানতার পরও দুই একবার যে ধরা পড়ি নাই তা নয়, তবে তা তারা সহজ সরলভাবে হজম করে নিয়েছে। মূল কথা হল উদ্দেশ্য যখন সৎ, তখন মনের দৃঢ়তা থাকে সবল, তার সাথে যুক্ত করে নিতে হয় অতান্ত সহজ সরল স্বাভাবিক–চলন বলনের প্রক্রিয়া। এই কারণেই দীর্ঘ দিন গোপনে থাকা সম্ভবপর হয়েছে।

নোয়াখালী জিলায় সাংগঠনিক তৎপরতা

১৯৫০ এর দশকে যখন চট্টগ্রাম শহরে বিশেষ করে রেলের হেড্ কোয়ার্টারে (সিআরবি) কর্মচারীদের মধ্যে আন্দোলন সংগঠন ব্যাপকতা লাভ করে—তখন এবং যুক্ত ফ্রন্টের নির্বাচনের সময়—ফেনী শহরের দক্ষিণ দিকের ঠাকুর পাড়া অঞ্চলের বাসিন্দা রেল কর্মচারীদের সাথে আমার যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা হয়। খুব সম্ভবতঃ এই যোগা যোগ দুই দিক থেকেই প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম দিক একটু আগেই উল্লেখ করেছি। দ্বিতীয় দিকের সংযোগ কারীরা হলেন কমরেড কুমুদ দত্ত, তিনি যুক্ত ফ্রন্টের সময় ফেনী-চট্টগ্রাম (হিন্দু) আসনে নির্বাচনে কমিউনিষ্ট পার্টির মনোনীত প্রার্থী ছিলেন। পরবর্তী কালে কমঃ ননী গোপাল কর্মকার নামে এক কমরেড নোয়াখালী জিলার পার্টি সংগঠনের দায়ীত্বে ছিলেন।

এই সময় রেলে কর্মরত সর্ব কমরেড যোগেশ দাস, উপেন দাস এবং গোপাল দাস সহ প্রায় ১০/১২ জনে মিলে পাথর ঘাটা জেলে পাড়ার নিকটে এক মেসবাড়ীতে থাকতেন। ঐ মেস বাড়ীটি ছিল আমাদের গোপন কাজ কর্মের-আস্তানা। চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীর সংযোগ কেন্দ্র। এই মেসের প্রতিটি বন্ধুরা ছিল আমাদের দরদী এবং অনেকে ছিল পার্টি কর্মী।

তখন কেন্দ্রীয় কমিটিতে-নোয়াখালী জিলার পার্টি সংগঠনের দায়ীত্ব ছিল কমঃ মোহম্মদ তোয়াহা সাহেবের। তাঁহার কোন কর্ম কাণ্ড ছিলনা জেলায়। তিনি থাকতেন ঢাকায়। আত্ম গোপনে।

এই অবস্থায় চট্টগ্রামের মাধ্যমে যখন নোয়াখালীতে পার্টি সংগঠনের কিছু কাজ কর্ম বিস্তারে সুযোগ সৃষ্টি হয়, তখন কেন্দ্রীয় কমিটি ঐ

জেলার তদারকি দায়িত্বয়টা আমার উপর অপর্ণ করে। বিশেষ করে আয়ুবী সামরিক শাসনের পূর্বে ৯২ (ক) ধারা জারীর সময় হতে।

এই সময়ে নোয়াখালী জিলার মাইজদি অঞ্চলে একটি পার্টির জিলা সেলের অস্থিত্ব ছিল। আমি গিয়ে যাদের সাক্ষাৎ পাই—তারা হলেন সর্ব কমঃ নীল মনি কবিরাজ, গ্রাম বামদত্ত, মাওলানা খালেদ সাইফুল্লা, সোনাপুর এবং নানা ছালাহ উদ্দীন। পরবর্তী কালে আমি যাওয়ার পর এই সেলের সাথে যুক্ত হয়-সর্ব কমঃ ননী গোপাল কর্মকার, ডাক্তার নিজাম কালিকারপুর গ্রাম, নূরুল হক চৌধুরী, কাজীর হাট এলাকা, ডাঃ আবুল খায়ের। এর বছর খানক পর-এই সেল থেকে মাষ্টার ননী কর্মকার বাদ পড়ে, তার সাথে যুক্ত হয় চট্টগ্রাম থেকে নিযুক্ত কমঃ হরিমোহন দাস।

তিনি নোয়াখালীতে কমঃ অভয় দাস নামে পরিচিত। যেহেতু চট্টগ্রামে আমার কাজের পরিধি ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে, অন্য দিকে নোয়াখলীতে ও পার্টি সংগঠন বাড়তে থাকে তখন আমার তদারকীতে কমঃ হরী মোহন কে—সংগঠক হিসেবে-নোয়াখালীতে পাঠানো হয়। এই কমরেড ছিলেন সত্যিকার অর্থে নিবেদিত প্রাণ, নিরলস, নিরঅহঙ্কারী ও অতিব বিনয়ী কর্মী। তার অবদান নোয়াখালী জেলার প্রতিটি কর্মী চিরদিন স্মরণে রাখবে।

অভয় বাবুকে নিযুক্ত করার পর নোয়াখালী জিলার সেলটিকে জেলা সাংগঠনিক কমিটিতে উন্নীত করা হয়। কমঃ অভয় দাস ছিলেন তার সম্পাদক।

এর পর এই সাংগঠনিক কমিটির আওতায় মাইজদি, ভবানীগঞ্জ, চৌমুহানী, কাজীর হাট, মাতু ভূঁইয়া তথা ফজিলা ঘাট, ও ফেনীতে-বেশ কয়েকটি সেল, গ্রুপ ও পাঠ চক্র সংগঠিত হয়। এদের বেশীর ভাগের সাথে অভয় বাবুরই সংযোগ ছিল। মাঝে মধ্যে ২/৪ জনের সাথে আমার যোগাযোগ হত, তার মধ্যে ফাজিলা ঘাটের নিকটে কমঃ রসরাজ, কটু বাবু (কমঃ জুনু দাসের ভাই) এবং একজন দর্জির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। আর ছিলেন কমঃ ছিদ্দিক উল্লাহ। (যাকে আল বদর রাজাকাররা দিনে দুপুরে হত্যা করছে) ইহাছাড়া ছিলেন বেশ কয়েকটি দরদী বাড়ী। তার মধ্যে মাতু ভূঁইয়া বাজারের দক্ষিণ পাশের ভূঁইয়া বাড়ীর কমঃ রুহুল আমীন ও মুনীর আহমদ এর নাম স্মরণীয়, কমঃ আমীনের বেগম সাহেবা ও দুই কন্যার দৌলতে তাদের চট্টগ্রামের বাসা ছিল আমার গোপন আস্তানা।

নোয়াখালী জেলার "জোড় মানিক"

নোয়াখালী জিলার সেনবাগ থানার জমিদার হাটের নিকটে কমরেড নুরুল হক চৌধুরীর (মেহেদী) বাড়ী। পিতা জনাব আলী আকবর চৌধুরী-বনেদী জমিদার পরিবারের সন্তান। বিরাট চক্ মিলানো বাড়ী। সামনে-পিছনে-বিরাট বিরাট পুকুর, পুকুর ভর্ত্তি মাছ? গোঁয়াল ভরা গরু। তখনো গোলাভরা ধান না থাকলেও বর্গা ধানে বছর চলে যায়।

জনাব আলী আকবর সাহেবের বংশ গৌরবের সাথে আরও একটি গর্ব করার বিষয় হল—তাঁহার দলীয় রাজনৈতিক আদর্শ। দেশে শত পরিবর্ত্তনশীল রাজনৈতিক ডামা ডোলের মাঝে তিনি সনাতন মুসলিম লীগের আদর্শ বর্জ্জন করেননি। সমগ্র এলাকায় ক্ষয়িষ্ণু জমিদারীর ন্যায় বিলীয়মান মুসলীম লীগের ভগ্নতরীর তিনিই একমাত্র মাঝিহীন মাল্লা।

বংশ ও রাজনৈতিক গৌরবের সাথে জনাব আলী আকবর চৌধুরীর আরও একটি গৌরব হল তাহার ডজন খানেক সন্তান সন্ততি। ৫ ছেলে ও ৬ কন্যা।

এহেন আলী আকবর চৌধুরীর ঘরে তাঁর মতে "কুলাঙ্গার পুত্র" হিসাবে জন্ম নিয়েছে কমরেড নুরুল হক চৌধুরী (মেহেদী)। পুত্রধনদের মধ্যে তিনিই জ্যেষ্ঠ। রূপে গুনে, চেহারা ছুরুতে মন ও মেজাজে এমন কি ভোজনেও তিনি পিতৃদেবের একান্ত অনুসারী। ব্যতিক্রম হলো, তিনি পিতার বংশ গৌরব, রাজনৈতিক গৌরব এবং সম্পদের লোভ ও সংশ্রব সব এড়িয়ে চলতে শুরু করেন। এই বিপরীতের সংঘাত থেকে তিনি গড়িয়ে পড়েন-মওলানা ভাসানীর ন্যাপ ও কমিউনিস্ট রাজনীতিতে। কমরেড নুরুল হক চৌধুরীর সাথে প্রথম সাক্ষাৎ হয় চট্টগ্রাম রেলের ইউনিয়ন অফিস সংলগ্ন এক বাসায়. তবে যখন থেকে তার সাথে সাক্ষৎ হয় তারপর এক নাগাড়ে দীর্ঘ একযুগের ও অধিককাল রাজনীতি করার সুযোগ হয়।

কমরেড হক চৌধুরী তখন যুবক। বয়স পঁচিশ–ছাব্বিশ। হ্যাংলা ছিপ ছিপে পাতলা লম্বা গড়ন। শ্যাম বর্ণের রং। প্রথম সাক্ষাৎ এ দিল খোলা হাঁসি দিয়ে শত্রু–মিত্র সকলকে বরণ করে নেবার অভ্যাস। হাঁসলে সামনের দুইটি দাত বের হয়ে একটু বেমানান দেখায়। পরিশ্রমী শরীর। বহুদিন রাতের অন্ধকারে চর অঞ্চলে দীর্ঘ হাটা পথে তার সাথে ভ্রমন করেছি সেই তুলনায় ডাক্তার আবুল খায়ের বেশ আরাম-প্রিয়। অল্প শ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়েন। তার চেহাড়াও ছিল ননীর পুতুলের ন্যায় নাদুস নুদুস। উজ্জ্বল গৌর বর্ণের কাত্তিক ঠাকুরের ন্যায় সুন্দর দেহকান্তি। প্রথম দর্শনেই যে কোন যুবতীর দৃষ্টি আকর্ষন করার মত দেহ সৌষ্টবের অধিকারী ছিলেন ডাক্তার আবুল খায়ের।

বেশ কয়েক বছর নোয়াখালী জিলার চৌমুহানী শহরে এরা দুইজন ছিল জোর মানিকের ন্যায়। দুইজনেই নির্দিষ্ট সময়ে নিজ নিজ চেম্বারে একা একা কাজ করতেন। তারপর তাদের দুইজনকে সবত্র জোড় মানিক হিসাবে দেখা যেত রাজনৈতিক অঙ্গনে।

তখন ডাক্তার খায়ের সাহেবের চক্ষু চিকিৎসার চেম্বার ছিল চৌমুহানী বাজারের সর্ব পূর্বপ্রান্তে রাস্তার দক্ষিণ পাশে একটি টিনের ঘরে। বছর ২ ৩ পরে উঠে আসেন বাজারের উত্তর পার্শ্বে। প্রথমে কলেজ রোডে, পরে রেল লাইনের ধারে একটি তেল কলের পার্শ্বে। এখান থেকেই ডাক্তার খায়ের এর সবদিকের উন্নতির স্বর্ণ যুগ শুরু হয়। লোকে বলে ডাক্তার খায়ের স্ত্রী ভাগ্যে ভাগ্যবান। মিসেস তারা বেগমকে বিয়ে করার পর থেকেই তার ভাগ্য লক্ষ্মী ফিরে এসেছে–এর আগের জীবন ছিল ছন্ন ছাড়া ও পরনির্ভরশীল।

এরা দুই জনের মধ্যে জোড় মানিক সৃষ্টির পেছনে অনেকগুলি বিপরীত বৈশিষ্টের মিল বিদ্যমান ছিল। দুইজনই একই সময়ে কমিউনিষ্ট আদর্শে বিশ্বাসী হন। ডাক্তার খায়ের অর্থ-লোলুপ ও বিষয়ী। পদলোভ, যশ ও খ্যাতির পূজারী। তাই তিনি একে একে ঐ সবই অর্জন করেছেন। সপ্তম শ্রেণীতে অধ্যায়নরতা ছাত্রী তারা বেগমকে বিয়ে করে—তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব উচ্চ ডিগ্রী নিতে সাহায্য—সহযোগিতা করেছে। তাই ডাক্তার খায়ের এখন শুধু স্ত্রী ভাগ্যে ভাগ্যবান নয়, স্ত্রীর গৌরবেও গৌরবান্বিত।

সেই ক্ষেত্রে কমরেড নূরুল হক চৌধুরী আজও ব্রহ্মচর্য জীবন অতিবাহিত করে চলেছে। অর্থের প্রতি কোন লোভ তার কোন কালে ছিল না, ছিলনা বলেই বাপের জোত-জমি তাকে ঘরে ধরে রাখতে পারে নি, পারেনি তখনকার দিনে দেড়/দুই হাজার টাকা মাসিক বেতনের ইউনিয়ন ইনসুরেন্স কোম্পানীর চৌমহানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টরের চাকুরী। অর্থলোভ থাকলে আজকে তিনি অনায়াসে কোটিপতি হতে পারতেন।

অতএব, ইহা প্রমাণিত সত্য যে অর্থ লোভ, নারীর লোভ, বংশ লোভ যশ ও খ্যাতি লোভ—কমরেড নূরুল হক চৌধুরীর কোন কালে ছিল না। তিনি এইগুলির উর্দ্ধে। এই কারণে এই দুই জোড় মানিক আজ মানিক ডোর ছিন্ন করে দুই বিপরীত আর্থ-সামাজিক অবস্থায় অবস্থান করছে। একজন ঐশ্বর্য্যের সিড়ি' বেয়ে' ক্রমে উপরের দিকে ধাবিত, অপর জন-ক্রমে গড়িয়ে পতিত হচ্ছে-নিচের দিকে দারিদ্রের শেষ সীমায়।

তবে দুই জনেই এক কালে সমস্বরে আওয়াজ তুলেছিল-কমরেড তোয়াহার স্বার্থপর সুবিধাবাদী রাজনীতির বিরুদ্ধে। যখন প্রত্যক্ষভাবে ধরা পড়েছিল চর কাঁকড়ার কৃষকদের উপর জোতদার মুজিবুল্লার হামলার সময় তিনি সচেতনভাবে কৃষকদের সামনেতঃ দুরের কথা পার্শ্বে-কিংবা পেছনেও এসে দাঁড়াননি।

কিন্তু সেই শপথ-কমরেড মেহেদী আজও রক্ষা করে যাচ্ছে বটে তবে তার রাজনীতিতে এসেছে মৌলিক গুনগত পরিবর্তন। অন্যদিকে ডাক্তার আবুল খায়ের সেই শপথ রক্ষা করতে সক্ষম হননি। তারও নানা রকম যুক্তি আছে। যদিও সে সব যুক্তি মার্ক্সবাদী চাবুকের ধোলাইতে টিকে না

রণ ক্ষেত্র থেকে জোতদারের পৃষ্ঠ প্রদর্শন

ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৬৭ সালের দিকে। তখন সংশোধনবাদী মনি-সিংহদের সুখের আড্ডা থেকে বের হয়ে কমঃ মোহম্মদ হক-তোয়াহা বশীরেরা নতুন করে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টি গঠনের জন্য ৬ জনের একটি সাংগঠনিক কমিটি গঠন করেছে।

নোয়াখালী জিলার দক্ষিণ-পশ্চিমে "চর কাকড়া" নামে একটি নদী পয়োস্থি চর আছে। ঐ চরে জোতদার মুজিবুল্লা নামে এক দুর্দ্দর্শ গুণ্ডা প্রকৃতির লোক ৬৫ সালে বরিশাল থেকে প্রায় দুই হাজার ভূমিহীন কৃষক এনে ঐ চর কাকড়ায় বসায় এবং প্রতি বছর তাদের নিকট হতে অর্দ্ধেক ফসল বর্গা হিসাব আদায় করে নিত।

বছর খানেক আগ থেকে এখানে স্থানীয় পার্টি কর্মী ডাঃ নিজাম, মেজবা উদ্দীন (মিচু) এবং নূরুল হক মাঝি সহ বেশ কয়জন এই কৃষকদের সাথে-যোগাযোগ করে এবং মোহম্মদ তোয়াহাকে নিয়ে কয়েকটি কৃষক জনসভা ও অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সব জনসভায় মোহাম্মদ তোয়াহা সাহেব অত্যন্ত জোর গলায় দাবী করে যে ঐ সব নদী পয়েস্থি জমির মালিক মুজিবুল্লা নহে। তাকে অর্দ্ধেক ফসল দেওয়া নিরর্থক। এর পর তিনি বলেন এই অগ্রহায়ণে ধান পাকলে-ধান কেটে নিজের ঘরে তোলার জন্য-কর্মীদের নির্দেশ দেন এবং ধান. কাটার সময় হলে তাকে টেলিগ্রামে খবর দিতে বলেন। সেই অনুসারে কর্মীরা "সাহেবের"° হুকুম পেয়ে কাজ শুরু করেন। লাল ঝাণ্ডা মাঠের মধ্য খানে পুতে মহা আনন্দ উৎসাহে ধান কেটে ঘরে তোলেন। পার্টি কর্মীদের কৃষকেরা হাঁস, মুরগী, ছাগল জবাই করে খানা খাওয়ায়। এই সময় জোতদার মুজিবুল্লার কোন সাড়া শব্দ নেই। ছয় সাত দিন পর এক দিন ভোর বেলায় হঠাৎ করে শত দেড় গুণ্ডা অতর্কিতে চর কাকড়ার কৃষকদের উপর হামলা চালায়। নারী পুরুষ শিশু নির্বিশেষে ৪/৫ শত জনকে আহত করে। গরু, বাছুর, হাস, মুরগী, প্রচুর লুট করে নিয়ে যায়।

° সাহেব অর্থ—মোহাম্মদ তোয়াহা সাহেবকে ঐ এলাকায় ঐ নামে সম্মান প্রদর্শন করে থাকেন।

নিয়ে যায়—ধান চাল—কাথা-কম্বল। এক কথায় মুহূর্তের মধ্যে পিটিয়ে ঘর দুয়ার ভেঙ্গে দিয়ে তারা পুনঃ নৌকা যোগে বরিশালে পাড়ি জমায়।

প্রায় ১২/১৩ শত তাড়িত হয়ে এসে ভবানীগঞ্জ নামে এক স্থানে এসে জড়ো হয়। স্থানীয় কর্মীরা যতদূর সম্ভব প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। তারপর তারা কিং কর্তব্য বিমূঢ় হয়ে বসে। সাহেব এখনও ঢাকা থেকে এসে পৌছালো না। সাহেব অর্থ তোয়াহা সাহেব। তাহাকে সম্মান দিখিয়ে কেহ নাম ধরে না। বেলা ১২ টার দিকে মটর সাইকেল যোগে সাহেব হাজির হলেন। ঘটনার বিভৎসতা দেখে সাহেব স্তম্ভিত হয়ে বললেন—তোমরা এদের নিয়ে পায়ে হেটে মাইজদী—শহরে যাও। আমি যথাসময়ে আসতেছি।

সাহেবের কথা মত সেই ১২/১৩ শত আহত ক্ষুধার্ত নিগৃহীত কৃষক জনতা—২০/৩০ মাইল রাস্তা পায়ে হেটে মাইজদি শহরে এসে হাজির হল। খবর পেয়ে নূরুল হক চৌধুরী ও ডাঃ আবুল খায়ের মাইজদী পৌছালেন। সমস্ত কিছু শুনে কৃষকদের নিয়ে মিছিল করে সমস্ত শহর কাঁপিয়ে তুললেন। চাঁদা তুলে চিড়া-মুড়ি-গুড় কলা খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। বেলা প্রায় শেষ হতে চললে। তখন সাহেবের দেখা নেই। এই সময়ে সরকারী মহল থেকে প্রস্তাব এল সরকারী ব্যবস্থায় ট্রাকযোগে কৃষকদের বাড়ীতে পাঠানো হউক। পরে এস পি, ডি এস পি ইত্যাদি হোমড়া চোম্ড়ারা স্বয়ং উপস্থিত থেকে তদন্ত করে ক্ষতিপুরণের ব্যবস্থা করা হবে। ডাঃ খায়ের ও নূরুল হক চৌধুরী তখন জ্ঞানের দিক থেকে তত উন্নত হয়নি। তারা-আমলাদের ফাঁদে পড়ে রাজী হয়ে গেলেন। কৃষকরা গ্রামে ফেরৎ গেল।

পরের দিন সেই কাকড়া চড়ে S. P. D, C ইত্যাদি হাজির হলেন। হাজীর হলেন ৩০/৩৫ মাইল দূর থেকে নুরুল হক চৌধুরী ও অন্যান্য কর্মীরা। কিন্তু ৫/৭ মাইল দূরে অবস্থিত হাজীর হাট থেকে হাজির হলেন না মোহাম্মদ তোয়াহা। তদন্তে ক্ষতির একটি তালিকা তৈরী হল। পরের দিন পুনঃ কোর্টে এসে মামলা দায়ের করার কথা বলে আমলারা ফেরত আসলেন।

খবর নিয়ে জানা গেল কৃষক নেতা জোতদার মোহম্মদ তোয়াহা তখন আগুার চড়ে গিয়ে নিজের বর্গাজমির ধানি খাজনা আদায় করতে ব্যস্ত হয়ে

পড়ছিলেন। বলাত যায় না, যদি কাকড়ার চরের খবর চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে "কৃষকেরা ধান কেটে নিজের গোলায় তুলেছে" তাহলেত আণ্ডার চরের কৃষকেরা সেই পথ অনুসরণ করতে পারে ?

ঘটনার চতুর্থ দিনে পান চিবাতে চিবাতে 'রামকৃষক' নেতা মাইজদী কোর্টে হাজির হলেন। হাজির হয়ে প্রথমে নিজ ভগ্নিপতি জনাব তাজু মোক্তারের বাসায় কিছুক্ষণ আড্ডা দিলেন, পরে বার-লাইব্রেরীতে এসে কিছু ক্ষণ গল্প করে সময় নষ্ট করলেন—কিন্তু নেতা উপস্থিত বলে কর্মীরা একক উদ্যোগে কিছু করতেও পারছেন না। এই ভাবে সেদিন কোর্টে মামলা দায়ের করার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেল। মামলা আর দায়ের হলনা। শেষ পর্য্যন্ত ঐ মামলা আর দায়ের হয়নি বলে ডাঃ খায়ের আর নুরুল হক চৌধুরী-পার্টির জেলা ও কেন্দ্রীয় কমিটির নিকট অভিযোগ করেছিল। এই হল পাকিস্তান আমলে জোতদার-কৃষক নেতা কর্তৃক কৃষক আন্দোলনে নেতৃত্বদানের নমুনা। শ্রেণী স্বার্থ এমনই জিনিষ। কাঁঠাল গাছে কোন দিন ফজলি আম ফলে না। ফলাইতে হলে চাই—মার্কস এঙ্গেলস, লেনিন মাও সে তুং এর ন্যায় শ্রেণীচ্যুত হওয়ার নিরলস সংগ্রাম ও সাধনা। যা এদেশের বেশীর ভাগ নেতৃত্ব অর্জন করতে পারেনি।

মওলানা ভাসানীর নিকট গোপন চিঠি

আমাদের মত অনুন্নত দেশে কমিউনিষ্টদের রাজনীতি করতে হলে কারাবরণ বা মামলায় জড়িয়ে পড়া বা বিনা বিচারে আটক থাকা অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা। কিংবা পার্টি যখন সময়-সময় বে-আইনী ঘোষিত হয় অথবা সাময়িকভাবে দেশে রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় (সামরিক শাসনের বা গভর্ণার শাসনের আমলে) তখন কমিউনিষ্টদের গোপনে থেকে কাজ করতে হয়। এই ধরণের গোপন কাজে আমি দীর্ঘ বছর যাবৎ অভ্যস্থ হয়ে উঠেছি। সুতরাং জেলের বাইরে থাকা অবস্থায় বা ভিতরে থাকা কালে বে-আইনি চিঠি পত্র আদান-প্রদান প্রায় সকল কমিউনিষ্টের একটি নিত্য করণীয় কাজ হয়ে দাঁড়ায়। এমন কি কমিউনিষ্ট

পার্টি যখন আইনী অবস্থায় প্রকাশ্যে অবস্থান করে তখনও আইনী ও বে-আইনী কাজে প্রকাশ্যে ও গোপন কাজে সমন্বয় সাধন করে কাজ করতে হয়।

যে সব কমিউনিষ্ট পার্টি ও নেতারা এ না করে কেবল মাত্র হয় প্রকাশ্য না হয় গোপন ভাবে কাজ করে থাকে—তারা ডান বিচ্যুতি বা বাম বিচ্যুতির ভূলের পঙ্কে নিমজ্জিত হতে বাধ্য।

এ সব বিষয়ে বহু তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে আমি সব সময় সচেতন থাকার চেষ্টা করেছি। তার পরও ভূলের কবল থেকে সব সময় রেহাই পাওয়া যায় নি। কাজ করলেই ভূল হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। এক মাত্র নিষ্কর্মার ভূল হয় না।

আমি যখন বাইশ বছর (১৯৪৮-১৯৬৯) ধরা না পড়ে গোপনে ছিলাম তখন ও জেলে আবদ্ধ রাজবন্দীদের নিকট গোপনে নিয়মিত চিঠি আদান প্রদান করেছি, পাঠিয়েছি পার্টি দলিল ও রাজনৈতিক বই পুস্তক। আবার নিজে যখন জেলে আবদ্ধ হয়েছি তখন ও বাইরের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করেছি।

আজকে এখানে যে গোপন চিঠির বিষয়ে উল্লেখ করছি, এই চিঠিখানি ছিল একটি ঐতিহাসিক দলিল বিশেষ। চিঠি খানি লিখেছিলাম ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বসে। আইয়ুব আমলের রাজবন্দীরা দৈনিক দুইটি (বাংলা ও ইংরেজী) খবরের কাগজ বিনা পয়সা বা সরকারী খরচে পড়তে পেত। একদিন কাগজে দেখলাম পাবনা জিলার শাপুর গ্রামে শ্রদ্ধেয় মওলানা ভাসানী প্রথম "লাল টুপি" সম্মেলন আহবান করেছেন। তখন পর্যন্ত মওলানা ভাসানীর সাথে আমার প্রত্যক্ষ সাক্ষাত হয়নি। তবে তিনি ভালভাবে আমায় জানতেন। আমি কে এবং কি ধরণের রাজনীতিতে বিশ্বাস করি। আমি ও তাকে পরোক্ষভাবে জানতাম। কয়েকবার দেখেছি তাকে জনসভার মঞ্চে, শুনেছি তার অনল বর্ষী ভাষন; সংবাদপত্রে পাঠ করেছি তার অনেক বক্তৃতা ও বক্তব্য। আর লোক মুখে শুনেছি—তার স্বভাব চরিত্র ও চিন্তাধারা এবং চলন বলনের অনেক কল্প কাহিনী ও বাস্তব গল্প।

আমার বিশ্লেষণ মতে শ্রদ্ধেয় মওলানা ভাসানী-

১। ঘোরতর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী।

২। দুস্থ মানুষ সহ শ্রমিক কৃষকের কল্যাণকামী।

৩। উন্নতমানের শক্তিমান অথচ ব্যর্থ সমাজ সংস্কারক।

উপরোক্ত তিন উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য তিনি কৌশলগতভাবে কমিউনিষ্টদের সাথে একত্রে কাজ করতে আগ্রহী।

শ্রেণী চরিত্রের দিক থেকে তিনি আদর্শগত জাতীয় বূর্জোয়া[0]। কায়িক ভাবে পাতি বুর্জোয়া।

মহাত্মা গান্ধীর তিন কৌশলের ১। ছয় পয়সার খাদ্য গ্রহণ ২। হাটুর উপর কাপড় পড়া, ৩। রেলের তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ এর ন্যায় মওলানা ভাসানীরও কৌশল ছিল—১) মার্কিন কাপড়ের জামা লুঙ্গি, ২) তালের আশের টুপি, ৩) পায়ে চটি জুতা ও সাদাসিদে চাল চলন। মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় মওলানা ভাসানীও ছিলেন ক্ষমতারোহনের বিরোধীতার আড়ালে—বুর্জোয়া শ্রেণীকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করা। কোন কোন সময় করেছেন বুর্জোয়াদের লেজুড় বৃত্তি (ইয়াহিয়ার আগমনের সময়) ও শেখ মুজিবের ক্ষমতারোহনের পর কোন কোন সময় বুর্জোয়াদের পথ প্রদর্শক। (বাঙ্গালী বুর্জোয়াদের) এবং তার চরিত্রের মধ্যে দোদুল্যমানতা ছিল অতীব প্রকটাকারে। তৎ সত্বেও তাকে সাথে করে আন্দোলন সংগ্রামে অনেকদূর এগিয়ে যাওয়া যায় বলে আমি তখন মনে করতাম।

যেহেতু তিনি সচেতন ভাবে কমিউনিষ্টদের বগলদাবা করে ব্যবহার করেছেন, কমিউনিষ্টদের ও উচিত ছিল কৌশলগত ভাবে তাকে ব্যবহার করা। তিনি কখনও চাননি কমিউণ্টরা রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্টিত হউক, এবং মওলানাকে ডিঙ্গিয়ে কমিউনিষ্টরা জাতীয় রাজনীতিতে জনগণের সামনে এসে অধিষ্ঠিত হউক। এ সম্পর্কে পরবর্তী কালে মওলানা সাহেবের বক্তব্য আমার সকর্ণে শুনার সুযোগ হয়েছিল।

---

[0] বূর্জোয়া তিন ধরণের যথা ঃ ১) কায়িক বুর্জোয়া ২) আদর্শগত বুর্জোয়া (গান্ধী, ইন্দিরা গান্ধী, নেহেরু, শাস্ত্রী, সোহরাওয়ার্দ্দী) ৩) বিত্তহীন মধ্যবিত্ত-পাতি বুর্জোয়া।

উপরোক্ত মুল্যায়ন সত্বেও তাঁর মধ্যকার সৎ গুণাবলী গুলির বিকাশ ঘটিয়ে জাতীয় রাজনীতিতে তাঁকে ব্যবহার করে, পাকিস্তানী উপনিবেশ থেকে মুক্তি সংগ্রামে কমিউনিষ্টদের উদ্দেশ্য হাসিল করার মানসে--তাঁর প্রতি সহযোগিতার আহবান জানিয়ে এক দীর্ঘ পত্র লিখার সিদ্ধান্ত নিলাম এবং এই মর্মে এক দীর্ঘ পত্র লিখে তা গোপনে জেলের বাইরে পাঠালাম।

চিঠিটি পাঠিয়েছিলাম আমার মামলার—আমার পক্ষের-প্রখ্যাত আইনজীবী বন্ধুবর বারিষ্টার আবদুল হক সাহেবের মাধ্যমে। কি কৌশলে চিঠিখানি জেলের বাইরে পাচার করেছিলাম তা এখানে লেখা উচিত হবে না বিধায় লিপিবদ্ধ করা থেকে বিরত রইলাম।

ঐ চিঠি খানিতে আমি শ্রদ্ধেয় মওলানা ভাসানীকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে চীনের জাতীয় নেতা ডাঃ সান ইয়াৎ সেনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্য আকুল আহবান জানিয়েছিলাম। ডাঃ সান ইয়াৎ সেন ছিলেন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, সামন্তবাদ বিরোধী ও সমাজতন্ত্রের স্বপক্ষে প্রকৃত দেশপ্রেমিক জাতীয় বুর্জোয়া।

এই চিঠি পেয়ে ও পাঠ করে শ্রদ্ধেয় মওলানা ভাসানী যে অতীব আনন্দিত হয়েছিলেন তারই নিদর্শন পাওয়া যায় উপরে উল্লেখিত শাপুরের 'লাল টুপি' সমাবেশে (উপস্থিতি ছিল প্রায় দেড় লক্ষ) চিঠিখানি পড়ে শুনাবার জন্য তিনি কমঃ আলাউদ্দীনকে আদেশ করেছিলেন। কমঃ আলাউদ্দীন তা সমাবেশে পাঠ করে শুনান।

স্মরণ যোগ্য যে উক্ত 'লাল টুপি' সমাবেশকে ভণ্ডুল করার জন্য কমঃ হক-তোয়াহা, জাফর-মেনন-রণো ইত্যাদিরা আদা নুন খেয়ে লেগেছিল এবং উক্ত সম্মেলনে কিছু সাঙ্গ পাঙ্গ নিয়ে উপস্থিত হয়ে গোল বাঁধাবার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছিলেন।

শুনেছি আমার লেখা উক্ত চিঠি পাঠ করার পর সম্মেলনে আগত কর্মীদের অনেকের তাদের প্রতি (হক-তোয়াহা) যে মোহ ছিল তা কেটে যায় এবং সুষ্ঠু ভাবে প্রথম ঐতিহাসিক লাল টুপি সমাবেশ সমাপ্ত হয়।

ঐ প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণ যোগ্য যে এই বে-আইনী সমাবেশকে পণ্ড করার জন্য জনাব ইয়াহিয়া খান ও কম চেষ্টা করেনি। তিনি পাঠিয়েছিলেন-

আকাশ পথে জঙ্গী বিমান ও হেলিকপ্টার এবং কয়েক হাজার পুলিশ ও সেনাবাহিনী।

এই ঐতিহাসিক প্রথম লাল টুপি সমাবেশ অতীব সাফল্যের সহিত সমাপ্ত করতে পারায় মওলানা ভাসানী পরবর্তীকালে আরও তিনটি লাল টুপি সমাবেশ সুশৃঙ্খলভাবে সংগঠিত করেছিলেন। দ্বিতীয় লালটুপি সমাবেশ হয়েছিল বগুড়া জেলার মহিপুরে, তৃতীয় সমাবেশ হয় টাঙ্গাইল জেলার সন্তোষে এবং চতুর্থ সমাবেশ হয়েছিল ঢাকার রেস কোর্স ময়দানে।

সমগ্র পাকিস্তান আমলে কৃষকদের মধ্যে যত সভা-সমাবেশ হয়েছিল তার মধ্যে এইসব লালটুপি সমাবেশগুলি হল সবচেয়ে জঙ্গী। এইগুলি সংগঠিত করার পেছনে ছিল পূর্ব বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টির কিছুটা সচেতন অবদান। পরিপূর্ণ ভাবে যদি এইগুলির ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারার মত রাজনৈতিক দূরদর্শিতা থাকতো। থাকতো মার্কসবাদের উপর তাত্ত্বিক জ্ঞান। দঃখজনক ভাবে সে জ্ঞানটুকু ততকালে আমাদের কারো মধ্যে বিদ্যমান ছিল না।

'চীন পন্থী মার্শাল ল'

১৯৬৮-৬৯ সালে বিশ্বের বুকে নজীর বিহীন গণ-আন্দোলন ও গণ-অভ্যুত্থানের মুখে লৌহমানব আইয়ুব খানের হয় পতন, ইয়াহিয়া খানের হয় আগমণ। তারিখ ছিল ২৪শে মার্চ ১৯৬৯ ইং। এর সপ্তাহ খানেক পূর্বে চীনাপন্থী নামে খ্যাত এবং ভাসানী ন্যাপের দুই নেতা জনাব মোঃ তোয়াহা ও আনোয়ার জাহিদ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্রত্যাবর্তন করে ঢাকাতে নেমেই শ্রদ্ধেয় মওলানা ভাসানীর নাম করে প্রচার করতে লাগলেন যে এই মার্শাল ল' হচ্ছে মওলানা ভাসানীর সমর্থন পুষ্ট "চীনাপন্থী মার্শাল ল"। তখনও মওলানা ভাসানী পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ঢাকায় ফিরেননি। ২২শে মার্চ তারিখে মওলানা ঢাকা বিমান বন্দর থেকে সোজা সন্তোষে চলে গেলেন। দুই নেতা আরও প্রচার করেছিলেন যে জনাব ইয়াহিয়া গোপনে মওলানা ভাসানীর সাথে দেখা করেছেন এবং সামরিক শাসন জারীর বিষয়ে মওলানার অনু-

মতি প্রার্থনা করেছেন। মওলানা ভাসানীও তাকে দোয়া জানিয়েছে। এই সব ঘটনা আমরা চট্টগ্রামে বসে কিছুই জানতে পারিনি। বরঞ্চ মওলানা ভাসানীর সাথে ইতিপূর্বে আলোচনা মতে আমাদের মধ্যে ধারণা ছিল যে মওলানা নতুন কোন সামরিক শাসনকে স্বাগত জানাতে পারে না।

২৩শে মার্চ সন্ধ্যায় আমি উত্তর কাট্টলী নামক এক গ্রামে গোপন আস্তানায় আছি। এমন সময় বাংলা খবরে ঘোষিত হল ইয়াহিয়া খানের সামরিক শাসনের খবর। খবরটি শেষ হওয়ার আগেই আমি আমার বেহাই ও বন্ধু শ্যামাচরণ দে মহাশয়কে সাইকেল যোগে শহরে পাঠিয়ে পার্টির নেতৃস্থানীয় জেলা নেতাদের ডেকে আনতে পাঠিয়ে দিলাম। এই গ্রাম থেকে শহরের দূরত্ব ৪ মাইল।

এক ঘন্টার মধ্যে বাহক ও পার্টি নেতারা গোপনে এসে হাজীর হলেন। যারা এসেছিলেন তারা হল; আব্দুল মালেক, আবুল বাশার, মনীন্দ্র মহাজন, বদিউল আলম, ইছাক ভূইয়া, মকবুল আহমদ, জামাল উদ্দীন, লুৎফল হক মজুমদার প্রমুখ।

দ্রুত বসে আলোচনা করা হল, এই অবস্থায় কি করণীয়? সময়টা ৬৮/৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানের জোয়ারের সময় কাল। সারাদেশে বিজয় উল্লাসের ঢেউ বইতেছে। বিশেষ করে শিল্প এলাকা হিসাবে চট্টগ্রামের অবস্থা আরও ভাল। এখানে আমরা কমিউনিষ্টরা একক ভাবে সব চেয়ে বড় শক্তি। এবং আমাদের একক শক্তিতে বহুবার হরতাল পালন করে সফল হয়েছি। এসব বিষয়ে কমরেডগণ অভিজ্ঞ। এক ঘন্টার মধ্যে বৈঠক সর্ব সম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্তে এলেন যে গত দেড়/দুই বছর ধরে সারা দেশে যে গণ আন্দোলনের জোয়ার বয়ে গেছে এবং ব্যাপক জনগণের যে সংগ্রামী রূপ দেখা গেছে। তাতে করে—এই "মার্শাল ল" কে কেহ বিনা প্রতিবাদে মেনে নেবে না। এমন কি মওলানা ভাসানীত মানতেই পারেন না। অতএব, সারা দেশে এর প্রতিবাদে হরতাল অবশ্যই হবে। আমাদেরও উচিত আগামীকাল ও পরের দিন হরতাল ঘোষণা করা। দুইদিনের প্রোগ্রাম এই কারণে নেওয়া উচিত। যদি ব্যতিক্রম ধর্মী কোন কারণে আগামীকাল কোথাও প্রতিবাদ না হয়ে থাকে, সেই ক্ষেত্রে চট্টগ্রামের হরতাল হবে

এই বিষয়ে নেতৃত্ব দানকারী। এরপর সারা দেশের সাথে যোগাযোগ করে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কমরেড্‌রা বিদায় নিয়ে সারা রাত ধরে কাজ করলেন। রাতের মধ্যে সর্বত্র খবর পেঁছালেন, ৬৮/৬৯ সালের গণ-আন্দোলন পরিচালনার জন্য সমস্ত শিল্প এলাকায় পূর্ব হতেই মজবুত পার্টি সংগঠন গড়ে উঠেছিল। খবর পেৌছার সাথে সাথে সর্ব্বত্র সাধারণ প্রস্তুতির মধ্যে দিয়ে সর্বাত্বক ধর্মঘট ও হরতাল পালিত হল। তেমন কোন বাধা কোথাও পাওয়া গেল না। কেবল মাত্র কালুর ঘাট ইস্পাহানী ও আমীন জুট মিল এলাকা থেকে শ্রমিক নেতা বজল মাষ্টার সহ কয়েক জন গ্রেপ্তার হল। গ্রেপ্তার করে তাদের নিয়ে গেল নতুন পাড়া সেনানিবাসে।

স্মরণ যোগ্য যে এক দশক পূর্বে ১৯৫৮ সালে আইয়ুবী সামরিক শাসনের মূল লক্ষ্য ছিল সমগ্র পাকিস্তানে পূর্ব ঘোষিত সাধারণ নির্বাচনকে ঠেকাবার নিমিত্ত, কারণ তখন নির্বাচনকে না ঠেকালে পাকিস্তানের উভয় খণ্ডে মুসলিম লীগের ভরাডুবি হত, জয়মুক্ত হত সেই স্থলে ন্যাশান্যাল আওয়ামী পার্টি। তখন ন্যাপ বিভক্ত হয়নি। পাকিস্তানের পশ্চিম ভূ-খণ্ডে তখন ন্যাপ প্রধান শক্তি হিসেবে রাজনৈতিক মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই কারণে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়াশীলদের যোগ-সাজশে বিশেষ করে মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্তে আইয়ুব খাঁনের আগমন হয়।

আর এবারের ইয়াহিয়া খানের সামরিক শাসনের মূল লক্ষ্য ছিল নির্বাচন দানের মাধ্যমে বিক্ষুব্দ জনমতকে শান্ত করা। যা পরবর্তী কালের ঘটনায় প্রমাণিত হয়েছে।

ফলে পূর্ব পাকিস্তানের তদানিন্তন কোন রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ, ভাসানী ন্যাপ, পি, ডি, পি, এবং মনি সিংহের কমিউনিষ্ট পার্টি কেহই ইয়াহিয়া খানের সামরিক শাসনকে প্রতিবাদ করল না, বাধা দিল না। কেবল মাত্র শিল্পাঞ্চল সহ চট্টগ্রাম শহর এবং জামালপুর মহকুমা শহরে প্রতিবাদ মুখর ছিল।

এক কথায় ইয়াহিয়ার আগমনকে তৎকালীন পাকিস্তানের দুই অংশের সকল বুর্জোয়া পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রীরা স্বাগত জানায়, কিন্তু মওলানা

ভাসানী ও তার ন্যাপ এবং পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টির তৎকালীন নেতা কমঃ হক, মোঃ তোয়াহা দস্তিদার, জাহিদ-হুদা ইত্যাদিরা কেন যে হাত গুটিয়ে রইল এবং "চীনাপন্থী" "মার্শাল ল" বলে প্রচার করে বেড়াল তা আজও রহস্যাবৃত থেকে গেছে। কেননা এরা কেহই এ বিষয়ে পরবর্তীকালে কোন আত্ম-সমালোচনা করেনি।

১৯৬৯ সালের আগেই ইয়াহিয়ার আগমনের পর পরই পূর্ব বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টির সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয়। শুরুতে সেই কমিটিতে ছিল দেবেন সিকদার, আবুল বাশার, আব্দুল মতিন, আলাউদ্দীন এবং নূরুল হক চৌধুরী। পরবর্তীকালে যখন মতিন ও আলাউদ্দীনকে জিজ্ঞেস করা হয়—আপনারা কেন আপনাদের এলাকায় ইয়াহিয়ার সামরিক শাসনের প্রতিবাদ করলেন না ? উত্তরে তারা সহজ সরল ভাবে জানায়—গণ-আন্দোলনের প্রধান নেতা মওলানা যখন চুপ রইলেন তখন আমরা এককভাবে কিছু করার ভরসা পেলাম না।

সে যাহা হউক,—চারিদিকের অবস্থা অবলোকন করে, খবরাখবর নিয়ে যখন দেখা গেল কেবলমাত্র আমরাই এই সামরিক শাসনকে রুখে দাঁড়িয়েছি। আমাদের সাথে আর কেহ নাই, সেই অবস্থায় আমরা চট্টগ্রামের পূর্ব বাংলা কমিউনিষ্ট পার্টির সমর্থকরা পূণঃ বৈঠকে মিলিত হয়ে—দুই দিন সফল হরতাল পালনের পর সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলাম, এরপর একক ভাবে ধর্মঘট সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া হবে বাম হঠকারীতা। তাই পূর্ণ শক্তি নিয়ে পশ্চাৎ অপসারণ করা হবে বুদ্ধিমানের কাজ। সঠিক পথ। কিন্তু এই ঘটনা থেকে আমাদের শিক্ষা হল যে অন্যান্য বুর্জোয়া সামন্ত পার্টির ন্যায় মওলানা ভাসানী এবং হক, মোঃ তোয়াহা-জাহিদ প্রমুখরা—মাঝে মধ্যে মুখেবিপ্লবী আওয়াজ তুললেও মুলতঃ তারাও দোদুল্যমান, আপোষ কামী—পাতি বুর্জোয়া শ্রেণী। বাঙ্গালী জাতির জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে এরা নেতৃত্ব দিতে পারে না। অথচ তৎকালীন পূর্ব বাংলার বাস্তব অবস্থা ছিল সমাজ বিপ্লব সংগঠিত করার সম্পূর্ণ পক্ষে। প্রথমত পাকিস্তানী উপ-নিবেশিক শোষনের বিরুদ্ধে জনগণ ছিল সোচ্চার। শ্রমিক, কৃষক ছাত্ররা ছিল সংগ্রাম মুখর। ছিল না-কমিউনিষ্ট নেতাদের মধ্যে মওলানা ভাসানীর ন্যায় প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব এবং সর্বোপরি—সারাদেশ ব্যাপী বিপ্লবী সংগঠন। তখন সবেমাত্র

মনি সিংহ ও হক-তোয়াহাদের সংশোধনবাদী ও পাকিস্তানের প্রতি মোহগ্রস্থ নয়া সংশোধন বাদীদের খপ্পর থেকে বের হয়ে সদ্য গঠিত হয়েছে পূর্ব বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টি। তখনও পর্য্যন্ত খসড়া রণনীতিগত দলিল- "পিণ্ডি ও ওয়াশিংটনের আওতামুক্ত স্বাধীন সার্বভৌম পূর্ব বাংলা রাষ্ট্র কায়েম করাই পূর্ব বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টির আশু লক্ষ্য।" প্রস্তুতি পর্বে রয়েছে।

নেতৃত্ব ও পরিপূর্ণ যোগ্য হয়ে বিকশিত হয়নি। একটি দেশের জাতীয় তথা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতৃত্ব দানের মত অনেক বিষয়ে আমাদের মধ্যে যোগ্যতার অভাব ছিল।

ফলে পাকিস্তান আমলে পূর্ব বাংলায় সমাজ বিপ্লবের বাস্তব অবস্থা বার বার আসা সত্ত্বেও সমাজ বিপ্লব সংগঠিত হয়নি। বিপ্লবী পরিস্থিতি কোন কোন সময় ইঙ্গিত *[১] দিয়ে ফিরে গেছে, (১৯৫৪-৫৮', কোন বার দরজায় ধর্ণা *[২] দিয়ে ফিরে গেছে (১৯৬৮—৬৯) এবং শেষবার বিপ্লব "আধা-খেচড়া" *[৩] ভাবে শেষ হয়েছে।

রাজশাহী জেল বিদ্রোহ

১৯৬৯ সালে ১৭ই জুলাই সুদীর্ঘ বাইশ বছর আত্ম-গোপনে থাকার পর গেপ্তার হই। তারপর পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠনের প্রচেষ্টার অপরাধে সামরিক আদালতে বিচার হয়। বিচারে "পিণ্ডি ও ওয়াশিংটনের আওতা-মুক্ত স্বাধীন স্বার্বভৌম জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা

---

* ১ঃ ইঙ্গিত অর্থ—১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পূর্ব বাংলার সাবিক জনগণ ৩০০ আসনের মধ্যে ২৯৩ আসনে মুসলিম লীগকে কবর দিয়ে ইঙ্গিত দিয়েছিল তারা আর পাকিস্তান চায় না।

* ২ঃ দরজায় ধর্ণা অর্থ এই যে ১৯৫৮/৫৯ সালের গণ আন্দোলনের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলার বুর্জোয়া সামন্তরা ছিল না। —ছিল মওলানা ভাসানী। সেই সময় কমিউনিষ্টরা যথোপযুক্ত অবস্থায় না থাকায়-সমাজ বিপ্লব দরজায় করাঘাত করে ফিরে গেছে।

* ৩ঃ "আধা-খেচরা" শব্দটা কমরেড লেনিনের। রুশ দেশের ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের পর— বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রী নেতা কেরেনস্কি যখন ক্ষমতায় যায়। সেই বিপ্লবকে তিনি আধা-খেচরা বলেছিলেন। যা বাংলাদেশে ১৯৭১ সালে ১৬ই ডিসেম্বর হয়েছিল।

রাষ্ট্র গঠনের প্রবক্তা হিসাবে একবছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়-১৯৭০ সালের জানুয়ারীতে। মামলার রায় প্রকাশের দুইমাস পর ঢাকা জেলে বিদ্রোহ ঘটানোর চেষ্টা চালাচ্ছি এই অজুহাতে ১৯৭০ সালে মার্চ্চ মাসে রাজশাহী জেলে বদলী করা হয়। ঘটনা হিসাবে জেল কর্তৃপক্ষ শ্রদ্ধেয় মওলানা ভাসানীর নিকট গোপনে প্রেরিত একটি চিঠির কথা উল্লেখ করেন। যে চিঠি ১৯৬৯ সালের পাবনা জিলার শাপুরের প্রথম "লালটুপি" সমাবেশে মওলানা সাহেবের নির্দ্দেশে কমঃ আলাউদ্দীন বিশাল জনসমক্ষে পাঠ করেছিলেন।

রাজশাহী জেলে যেদিন প্রথম পৌছলাম সেইদিন প্রথমে আমাকে নিয়ে উঠালেন ৬নং সেলে। সেখানে সাধারণতঃ জাদরেল জাদরেল আসামীদের রাখা হত। আমি পৌছার আগেই সেখানে আরও ৫জন কয়েদী অবস্থান করছিলেন। তাদের মধ্যে একজনের নামই স্মরণে আছে। তার নাম (পাবনা জেলার চাটমোহর থানার) সাবান মল্লিক। শুনেছি তিনি ছিলেন "সৌখিন ডাকাত"। জীবিকার জন্য ডাকাতি করতেন না, করতেন ধনীদের বিরুদ্ধে ঘৃনা থেকে। ডাকাতির টাকা গরীব জনগণের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। ২৭/২৮ বছরের যুবক। প্রচুর প্রাণ চাঞ্চল্য তারমধ্যে বিরাজ করছিল। তাকে পেয়ে আমার মনের কোণের সুপ্ত বাসনা জেগে উঠল। প্রথম রাতেই তাঁর নিকট কামনাটি খুলে প্রকাশ করলাম এবং তার সহযোগিতা চাইলাম। তিনিও আমার ন্যায় একজন রাজনীতিবিদের সংস্পর্শে আসার সুযোগ ও একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব পেয়ে অত্যন্ত আনন্দের সহিত প্রস্তাবটি গ্রহন করলেন।

পরিকল্পনাটি ছিল এই, সুদীর্ঘ বাইশ বছর আত্ম গোপনে থাকার পর যখন প্রথম বারের মত জেলে প্রবেশ করলাম; তখন থেকেই আমার মধ্যে একটি ধারণা বদ্ধমুল হয়েছিল যে-যতদিন দেশে "আমলা মুৎসুদ্দী" সরকার রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকবে, (সেই সরকার পাকিস্তান বা বাংলাদেশ যে নামেই অবস্থান করুক না কেন?) ততদিন আমাকে জেলে থাকতে হবে। কোন সরকারই আমাকে মুক্তি দিতে পারে না। কাজেই আমার মুক্তি আমাকেই অর্জ্জন করতে হবে, এবং সেই মুক্তির একমাত্র উপায় হল জেল-বিদ্রোহ বা জেল থেকে পলায়ন। আমি যে এই প্রচেষ্টা

ধারাবাহিক ভাবে চালিয়ে যাব, ইহা পাকিস্তানের বুদ্ধিমত্বা বিভাগ ভাল করে আঁচ করতে পেরেছিল, তাই তারা রাজশাহী জেলের ডাক্তার এবং রাজশাহী হাসপাতালের সিভিল সার্জেন্টের নিকট এক গোপন সার্কুলারে নির্দ্দেশ দিয়েছিল "দেবেন সিকদারকে কোন অবস্থাতেই জেলের বাহিরে চিকিৎসার সুযোগ দে'য়া হবেনা।" এই কথা ঐ মেডিক্যাল অফিসারই একদিন প্রকাশ করেছিলেন।

রাজশাহী জেলে প্রবেশ করার ঘন্টা খানেক পর যখন জানতে পারলাম বন্ধু সাবান মল্লিক "জাঁদরেল কয়েদী, তখনই বুঝে নিয়েছিলাম এর সাথে অবস্থান নেহায়েৎ সাময়িক। ২/৩ দিনের মধ্যে হয় আমাকে নতুবা সাবান মল্লিককে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাবে। হয়তো বা আগামী কালের মধ্যেই তা হয়ে যেতে পারে।

তাই, সেই প্রথম দিনের রাতের মধ্যেই দুইজনের মধ্যকার যাবতীয় কথাবার্তা সংক্ষেপে সেরে নিলাম। প্রথমে প্রতিষ্ঠা করলাম দুইজনের মধ্যকার যোগাযোগের ব্যবস্থা। তারপরে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা। এবং তারই প্রেক্ষিতে জেল বিদ্রোহের প্রস্তুতি নিতে হবে যথা সম্ভব সহসা। বন্ধু সাবান মল্লিক ইতিমধ্যে বেশ কিছু কাজ এগিয়ে রেখেছেন যেমন বাইরের সাথে যোগাযোগ। মেট্ পাহাড়া সিপাহী, জমাদারদের মধ্যে কিছু গোপন সম্পর্ক স্থাপন।

পরের দিন বেলা ১0টায় আমাকে সরিয়ে নিলেন ২০নং ওয়ার্ডে। যেখানে পূর্ব হ'তেই বেশ কয়জন রাজবন্দী অবস্থান করছিলেন। যেমন আবু নাসের খান ভাসানী, ডাক্তার দ্রাক্ষী (পাবনার প্রসিদ্ধ দন্ত চিকিৎসক, '৭১এ পাক সেনা কর্তৃক নিহত হন), তোতা মিয়া, (পাবনার রফিক হত্যার এক নম্বর আসামী। যাকে হত্যা করে টিপু বিশ্বাস গলাকাটা রাজনীতিতে হাতেখড়ি নিয়েছিলেন এবং বিপ্লবী নেতা হিসাবে স্বনাম ধন্য হয়েছিলেন। যাকে হত্যার নির্দেশ দিয়ে গোপনে ব্যক্তি হত্যার সন্ত্রাসী রাজনীতির সূচনা করেছিলেন মতিন আলাউদ্দীন সাহেব। সেইনিহত রফিক সাহেব ছিলেন আওয়ামী লীগ পন্থী এম, পি।) অধ্যক্ষ মীরাতুল ইসলাম, নেছার উদ্দিন, (এদের বাড়ী রাজশাহী জেলার শিবগঞ্জ থানায়); কাজী মেজবাউদ্দনি (ফেণী), আবুল কালাম আজাদ (জয়পুর হাট, বগুড়া) দুর্গাদাশ ভট্টাচার্য (বগুড়া) বেলায়েত হোসেন (ছাত্রনেতা, চট্টগ্রাম)

দুদু মিঞা (গাইবাঁন্ধা) ইত্যাদি প্রায় ৪০/৪৫জন। এখানে এসে একটা নতুন পরিবেশ পাওয়া গেল। এতদিন ঢাকা জেলে কেটেছে একেবারে একা একা। যাকে জেলের ভাষায় বলা হয় "সেগ্রিগেইট"। এই নতুন পরিবেশে গান, বাজনা, খেলাধুলা, বিভিন্ন ধরণের খবরের কাগজ এবং আন্দোলন করার শক্তি-সুযোগ পাওয়া গেল।

কমঃ সাবান মল্লিক যদিও প্রত্যক্ষভাবে কোন রাজনৈতিক দলের সাথে জড়িত ছিলেন না, তৎসত্বেও তিনি ছিলেন উন্নত মানের সংগঠক। প্রতিদিনের কাজের মধ্য দিয়ে তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। জেলের নিয়মানুসারে রাজবন্দীরা যদি কোন বড় রকমের হল ঘরে থাকার সুযোগ পায়, তাহলে সেই হল ঘরে রাতের বেলায় রাজবন্দীদের উপর নজর রাখার জন্য ৪/৫ জন মেট-পাহাড়া পাঠাতেন। ইহারই সুযোগ নিয়ে বন্ধু সাবান মল্লিক প্রায় রাতেই আমাদের রাজনৈতিক লাইনের সাথে এক মত আছেন এমন লোক জনদের রাতের ডিউটিতে পাঠাতেন। সারা রাত ধরে তাদের সাথে রাজনৈতিক আলোচনা চালিয়ে যেতাম, এবং তাদের মাধ্যমেই সাবান মল্লিকের নিকট রোজই চিঠি পাঠাতাম।

কয়েদীদের মধ্যে-বেশীর ভাগ ছিল অরাজনৈতিক, তার পর একটা অংশ ছিল মওলানা ভাসানী ভক্ত এবং আর একটি অংশ আওয়ামী লীগপন্থী। একটা ক্ষুদ্র অংশ ছিল কমিউনিস্ট। কমিউনিস্ট যারা ছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন-রাজশাহী জিলার আত্রাই কলেজের অধ্যাপক কমঃ বাদল দত্ত যিনি পরবর্তী কালে ১৯৭২ সালে তানোর পুলিশ ফাঁড়ী দখলের সংগ্রামে নিহত হন (হয়েছিলেন ওহিদুর, মতীন-আলাউদ্দীনের বাম হঠকারী লাইনের শিকার)।

জেল বিদ্রোহের প্রস্তুতি পুরা দমে চলছে, জেলের বাইরে ধুমায়িত হচ্ছে-পাকিস্তান বিরোধী মন-মানসিকতা। বিশেষ করে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির স্বাধীন স্বার্বভৌম পূর্ব বাংলা রাষ্ট্র কায়েম করার আওয়াজ। ঠিক যে ভাবে সাবান মল্লিককে নির্দ্দেশ পাঠাতাম কমঃ তার থেকে আরও উন্নত মানের কাজ করে রিপোর্ট পাঠাতেন। যে কাজের জন্য সময়ের প্রয়োজন দশ দিন, তিনি তা ৪/৫ দিনের মধ্যে শেষ করতেন।

প্রথম দিকে ২০ নং ওয়ার্ডের আমার পাশের সেলে ছিল একজন বিচারাধীন কয়েদী। তার বাহ্যিক পরিচয় ছিল তিনি ভারতীয় গুপ্ত চর, এবং জামায়েত ইসলাম পন্থী। বাস্তবে সে ছিল পাকিস্তান বুদ্ধি মত্তা বিভাগের গুপ্ত চর। আমরা রাজবন্দীরা বিশেষ করে নেতৃস্থানীয়রা যখন কোন আলোচনা করতাম, তখন ঐ লোকটি পার্শ্বে এসে বসতেন এবং সব কথা শুনতেন। এই অবস্থায় আমরা খুবই বিব্রত বোধ করতাম। তাকে নিষেধ করার পরও সে বেহায়ার ন্যায় আচরণ করতো। তাই তাকে এই ওয়ার্ড থেকে সরানোর জন্য সকলে মিলে পরামর্শ করে—ঠিক করলাম, তাকে এক দিন পিটুনী দিতে হবে এবং তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হবে সে ঝগড়াটে। তার সাথে আমরা এক ওয়ার্ডে থাকবো না।

কয়েক দিন পর সুযোগ বুঝে তাকে পিটুনী দেওয়া হল, এই কজে অগ্রণী ভূমিকা নেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হল পাবনার সাতারু ও জিমনাষ্টিক তোতা মিঞাকে। তিনি যেমন লম্বা-চওড়া, তেমনি রিষ্ট পুষ্ট। আমরা সবাই তার জন্য একটা করে রুটি সেক্রিফাইজ করতাম। কারণ ২০/২৫ খানা রুটি না হলে তার পেট ভরতো না।

তোতা সহ কয়েকজনে মিলে সেই গোয়েন্দা লোকটিকে জবর করে পিটুনী দিলাম, যাতে পাগলা ঘন্টি বাজাতে না পারে আমি জমাদারের হুইসেলটি ধরে রাখলাম। পিটুনীর পর জমাদার তাকে সাথে করে অফিসে চলে গেলেন এবং হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে জেলার, সুবাদার সহ ফিরে এলেন। আমরা জেলারকে পরিষ্কার জানিয়ে দিলাম, তার সাথে আমরা এক ওয়ার্ডে থাকব না, দাবী না মানলে কাল থেকে অনশন শুরু হবে।

অগত্যা পরের দিন আমাদের খাপরা ওয়ার্ডে বদলী করে দিলেন। এখানে বদলী হওয়াতে জেল বিদ্রোহের প্রস্তুতির কাজে সহায়ক হল।

দিনে রাতে রাজনৈতিক ক্লাশ হতে লাগল। দিনের বেলায় রাজবন্দীদের নিয়ে, রাতের বেলায় কমঃ সাবান মল্লিকের প্রেরিত পাহাড়াদারদের নিয়ে।

এই ভাবে ৬ মাস কাজ চালাবার পর দেখা গেল ৩৭ জনের মত-মেট পাহাড়া নাইট গার্ড, সিপাহী, জমাদার, পার্টি সদস্য হওয়ার উপযোগী

হয়েছে। তাদের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ্য ও পরোক্ষ ভাবে শত দেড়েক কয়েদীকে ঘনিষ্ট করা হয়েছে।

সব কিছু পর্যালোচনা করে লক্ষ্য মাত্রা ঠিক করলাম—অন্ততঃ ৫০ জনকে পূর্ণ বিশ্বাস ভাজন করে গড়ে নিতে হবে, অর্থাৎ রাজনৈতিক সচেতন করে তুলতে হবে। এবং প্রত্যেককে এক একটি ৪/৫ জনের গ্রুপ পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত করতে হবে।

কয়েদীদের আকর্ষন করার ক্ষেত্রে আমার একটি বক্তব্য খুবই হৃদয় গ্রাহী হয়েছিল। কোন অপইাধীই জন্ম লগ্নে, মাতৃ গর্ভ থেকে ঐ অপরাধ গুলি সাথে করে জন্ম গ্রহন করেনি। প্রতিটি অপরাধ প্রচলিত সমাজেরই রোগ। সমাজ থেকেই এই দোষগুলি তাদের মধ্যে সংক্রামিত হয়েছে। সমাজই এই গুলির জন্মদাতা। এই সমাজ পরিবর্তিত হয়ে সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা হলে এই বদগুন গুলি থাকবে না। কাজেই প্রতিটি কয়েদী নির্দোষ ও পবিত্র মানুষ। যাকে ইসলাম বলে "আশরাফুল মুকলুকাত।"

এরপর ১৯৭১ সালের মার্চ্চ মাসে শেষ বারের মত পর্যালোচনা করে দেখা গেল মোটামুটি প্রস্তুতি পূর্ণ হয়ে গেছে। বাকী রয়েছে কিছু টেক্‌নিক্যাল প্রস্তুতি। অর্থাৎ টেলিফোন লাইন বিকল করার কাজটি। এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল আমাদের পূর্ব বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টির বিশিষ্ট সদস্য কমঃ আবদুল ওয়াহাবকে, তিনি চাকরী করতেন রাজশাহী P.W.D. অফিসে। তার শাশুড় মহাশয় ছিলেন রাজশাহী জেলের অন্যতম জমাদার। ইনি আমাদের নানা কাজে সাহায্য করতেন, বিশেষ করে তার জামাতার সাথে প্রত্যহ যোগাযোগ স্থাপন। চিঠি পত্র আনা নেওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজটি তিনি এক বছর ধরে করে আসছেন।

ওয়াহাব ভাই খবর দিলেন টেলিফোন লাইন বিকল করার কাজটি করা-যাবে তবে আরও ৪/৫ দিন সময় লাগবে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাতে।

সমস্ত প্রস্তুতি সেরে আমরা সেই শুভ খবরটির জন্য অপেক্ষা করছি। ইতিমধ্যে কমঃ মনিসিংহ যশোর থেকে বদলী হয়ে রাজশাহীতে এসেছেন। এখানে তিনি আছেন হাসপাতালে। চিঠিপত্র মাধ্যমে তাঁর সাথেও

নিয়োমিত যোগাযোগ ছিল। বাইরে যখন অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়েছে, তখন জেল বিদ্রোহের বিষয়ে তার মতামত চাওয়া হল। তার জবাবে তিনি এক লম্বা চিঠি লিখলেন আমার কাছে, তাতে তিনি পরিস্কার ভাষায় নিষেধ করলেন আমি যেন ঐ চিন্তা মাথায় না রাখি। তিনি আরও জানালেন, আওয়ামী লীগ ও শেখ মুজিবর রহমান শিঘ্রই ক্ষমতায় অধিষ্টিত হবেন, তখন রাজবন্দীদের মুক্তি অবধারিত।[০]

তিনি যে আওয়ামী লীগ ও শেখ মুজিবের প্রতি আস্থাশীল ইহা আমার জানা ছিল। কারণ তাঁহাদের সাথে পার্টি ভাগ হওয়ার অন্যতম মূল কারণ ছিল তাদের "বুর্জোয়া লেজুড়ে বৃত্তি।"

সে যা হউক উত্তরে সংক্ষেপে জানিয়েছিলাম—আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসলে আপনার মুক্তি আসবে এতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার ন্যায় রাজবন্দীর বিশেষ করে আমার মুক্তি তারা দিতে পারে না। শ্রেণী চরিত্রের কারণে।

ইতিমধ্যে অনেক রাজবন্দীর মুক্তি হয়ে গেছে। বাকী আছি আমরা তিন চারজন। দেবেন সিকদার, মীরাতুল ইসলাম, আবুল কালাম আজাদ, আর একজন ছিলেন গাইবান্ধার মৎস্যজীবি সমিতির সভাপতি। ভদ্রলোক ছিলেন খুবই সরল ও দুর্বল প্রকৃতির। বেশ মজার মজার গল্প বলে জেলের পরিবেশকে হাল্কা রাখার ক্ষমতা রাখতেন। সব প্রস্তুতি পর্ব প্রায় শেষ। সমস্ত বাঙ্গালী সিপাহী, জমাদার, ও সুবাদার সমস্থ কয়েদী, জেল অফিসের সমস্ত বাঙ্গালী ষ্টাপ, ডাক্তার খানার সকল ষ্টাপ, আমাদের পক্ষে।

তামাম জেলখানায় আমি এখন অঘোষিত জেলার। সকলেই আমাকে সমীহ করে চলে। দিন-রাত এখন একটি ভাবনা সুনির্দিষ্ট দিন তারিখ ও সময় নির্দ্ধারণ করা। সেই শুভ মূহুর্ত্তটির অপেক্ষায় সকলে অধীর আগ্রহে রয়েছে।

ইতিমধ্যে ২৬শে মার্চ (১৯৭১) সারাদিন জেলের বাইরে গোলা-গুলির আওয়াজ পাওয়া গেল, বিমান থেকে বোমা ও রকেট নিক্ষেপ হচ্ছে

---

[০] ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছিলেন এই খবরটি শুনে ভদ্রলোক খুশীতে উৎফুল্ল হয়ে ১২৫.০০ টাকা খরচ করে জনাব শেখ মুজিবর র-মানকে অভিনন্দন বানী পাঠিয়েছিলেন। টেলিগ্রাম করে।

হালকা মেশিনগানের গুলির আওয়াজ শুনা যাচ্ছে। রাত দশটার দিকে রাজশাহী পুলিশ লাইনে বিদ্রোহ শুরু হয়েছে। সারা রাত যুদ্ধ চললো। জয় পরাজয় কিছুই জানা যাচ্ছে না। পরের দিন ২৭ তাং একদল কয়েদী অধৈর্য্য হয়ে বিদ্রোহ করে বসলো। তারা জেলের বাবুর্চি খানার পানির বড় টেংকের উপর দাঁড়িয়ে হাসপাতালের লোহাড় স্পিরিং এর খাট দেওয়ালের সাথে পর পর সাজিয়ে একটি সিড়ি (মই) বানিয়ে নিয়ে ঐ সিড়ি দিয়ে দেওয়ালে উটে ১৪শত কয়েদীর মধ্য থেকে ২২৭ জন পালিয়ে গেল—৩০ থেকে ৪০ মিনিটের মধ্যে। (এই পালিয়ে যাওয়া কয়েদীর মধ্যে একজন হল এক পা ওয়ালা। তার ডান পা হাটুর উপর পর্যন্ত কাটা ছিল) তার মধ্যে জেল শিপাহীর গুলিতে ১১ জন মারা গেল, ১৩ জন আহত হল। বাকী ২০৩ জন নিরাপদে পালিয়ে যেতে সক্ষম হল।

এর পরের দিন অর্থাৎ ২৮শে মার্চ হতে জেলে কড়াকড়ি বেড়ে গেল। সমস্ত বন্দীদেরে লকআপে রাখা হল।

এই অবস্থায় আমাদের পরিকল্পনা কার্যকরী করা কঠিন হ:য় দাঁড়াল, বলা চলে ভেস্তে যাওয়ার উপক্রম হল।

বাইর থেকে ওয়াহাব ভাই জানালেন "ওকে" অর্থাৎ কাজ শুরু করা যায়। কিন্তু সমস্ত বন্দী লকআপে থাকা অবস্থায় জেল বিদ্রোহ সম্ভব নয়। মূল শক্তি হল তারা।

অবশেষে বন্দীদের লকআপ থেকে মুক্ত করার জন্য অনশন ধর্মঘট করার সিদ্ধান্ত নিলাম। এবং এই কাজে কমঃ মনিসিংহের সমমতি পাওয়া গেল। ২রা মার্চ ৪ জন রাজবন্দী অনশন ধর্মঘট ঘোষণা করল। একটি মাত্র দাবী সকল বন্দীকে লকআপ মুক্ত রাখতে হবে। কারণ যারা অপরাধী তারা পালিয়ে গেছে। যার আছে তারা নির্দোষ। দেড়দিন অনশনের পর দাবী মেনে নিল। সকল বন্দী লকআপ মুক্ত হল।

৫ই মার্চ পুনঃ জেলের বাইরে গোলাগুলির ও বিমান থেকে বোমা বর্ষণের আওয়াজ পাওয়া গেল। ইহারই সুযোগে সাবান মল্লিককে জানিয়ে দিলাম সব বন্দীরা যেন আজ জেল অফিসের সামনে (ভিতরে দিকে) জড়ো হয়ে আওয়াজ তোলে, "বাংলাদেশ জিন্দাবাদ" সব বন্দীর মুক্তি চাই। সময়

বিকাল ৩ ঘটিকা। যেই নির্দেশ সেই অনুসারে কাজ। প্রায় হাজার বার শত বন্দী জড়ো হয়ে শ্লোগান দিতে লাগল। জেল কর্তৃপক্ষ এসে জিজ্ঞেস করল কি ব্যাপার? এসব কি হচ্ছে? উত্তরে তার বললো—আমাদের কথা সিকদার বাবু বলবেন। তাঁর সাথে কথা বলুন।"

কিছুক্ষণের মধ্যে আমাকে জেল অফিসে ডেকে পাঠালো, আমি যাবার সময় মনিসিংহকে সাথে করে নিয়ে গেলাম।

মনিসিংহের জন্য যখন লোক পাঠাইলাম, তখন এক মজার ঘটনা ঘটেছিল। সিপাহী গিয়ে যখন মনি সিংহকে বললেন—আপনাকে সিকদার বাবু জেল অফিসে ডাকছেন, তখন তিনি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, সিকদারের আহবানে কি করে জেল অফিসে যাব? উত্তরে সিপাহীটি একটু রগর করে জানালেন, কেন! জানেন না? আজকেত সিকদার বাবুই জেলার। তার হুকুমেই জেল চলছে।'

শেষ পর্যন্ত তিনি এলেন, তাকে সাথে করে জেলার ও সুপারেনটেনডেন্টের সাথে দেখা করতে গেলাম।

"প্রায় দুই ঘণ্টা তর্ক-বিতর্ক হল। কর্তৃপক্ষ জেলের দরজা খুলে দিতে নারাজ, আর আমাদের কথা একটি, জেলে বন্দী অবস্থায় বোমার আঘাতে মরতে রাজী নই, মরতে হলে লড়াই করে মরব।" এক পর্যায়ে সুপারের সাথে কথাবার্তা এমন স্তরে গিয়ে পৌছাল আমি বলেছিলাম "যদি জেল ভেঙ্গে যেতে হয় তবে সর্বপ্রথমে তোমাকে শেষ করে যাবো। ঐ বেটা বাঙ্গালী হলেও মূলতঃ ছিল পাকিস্তানী গোলাম। বাড়ী ছিল ফেনী মহকুমায়, তিনি ছিলেন খোড়া। উত্তরে সেও বলেছিল "তার আগে আমি জেলখানা পাঞ্জাবী মিলেটারীর হাতে তুলে দিব। তখন শেষ মেষ কর্তৃপক্ষ ২৪ ঘণ্টার সময় চাইলেন, আমি সময় দিতে রাজী নই, মনিসিংহ রাজী হয়ে গেলেন। অগত্যা তাদেরে বুঝতে না দেওয়ার জন্য আমিও মৌন সম্মতি জানালাম।

জেলারের রুম থেকে বের হয়ে ওয়াহাব ভাই এর শ্বশুরকে ইঙ্গিত দিলাম, ফোনের লাইন কেটে দেওয়ার জন্য।

বাইরে অপেক্ষামান কয়েদীদের উদ্দেশ্যে করে মনিসিং ভাষণ দিলেন ভাইসব আমি হচ্ছি সেই মনি মহারাজ। হাজং বিদ্রোহের নেতা। আপনারা

অধৈর্য হবে না, কোন প্রকার হটকারিতা করবেন না। জেলার সাহেব ২৪ ঘন্টা সময় নিয়েছেন। আগামী কাল এমন সময় আমাদের জানাবেন–ছেড়ে দেবেন কিনা ?

মনি সিংহকে—স্বস্থানে পাঠিয়ে দিয়ে আমি কয়েদীদের উদ্দেশ্য করে বললাম বন্ধুগন, আপনারা যার যার ওয়ার্ডে চলে যান, সেখানে গিয়ে জানতে পারবেন পরবর্ত্তী করণীয়। বন্ধুরা বুঝে নিলেন নির্দেশ তাদের কামনা–বাসনার পক্ষে হবে। তাই কেহ প্রশ্ন না তুলে নিরবে যার যার জায়গায় চলে গেলেন।

পরিকল্পনা অনুসারে প্রথম নির্দেশ পাঠালাম "আজকে কেহ লক্ আপে যাবে না। লক্ আপে না যাওয়া সফল করতে পারলেই বিদ্রোহ ৯০% ভাগ সফল হয়েছে বুঝি নিতে হবে।

ঘন্টা খানেকের মধ্যে সিপাহী জমাদার এসে আমায় জানালেন কেহ লকআপএ যাচ্ছে না, সকলেই আপনার দোহাই দিচ্ছে। আমি তখন বলিষ্ট কন্ঠে বললাম ঠিকইতঃ আজ কেবল গুন্তি হবে, লক্আপ হবে না। এই মর্মে জেল কর্তৃপক্ষের সাথে কথা হয়েছে। সচেতন ভাবেই এই মিথ্যাটুকু বললাম। ইতিমধ্যে আমি আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সেরে নিলাম। তাহচ্ছে আমাদের ওয়ার্ডের পাহাড়া রত অবাঙ্গালী জমাদারকে ডেকে চুপি সারে বললাম জমাদার সাহেব কিছু খবর জানেন ? জমাদার বললেন না বাবু সাহেব, কোন খবরত জানতে পাইনি, আমি বললাম কেন পাবনা জেলে বাঙ্গালী অবাঙ্গালী সিপাহীদের মারা মারির খবর জানেন না ? জমাদার বিমর্ষ চেহারায় মাথা নাড়লেন। তারপর আমি বললেম 'শুনুন জমাদার, বড় দুঃখ জনক খবর। গত রাতে এখানের বাঙ্গালী সিপাহীরা মিটিং করে ঠিক করেছে, আজ রাত ১০টার পর সমস্ত অবাঙ্গালীদের বাল বাচ্চা সহ কেটে ফেলবে। তাই তোমাকে পেয়ার করি বলে বল্ছি আগে বাল বাচ্চাসহ নিজের জান বাচাও, তারপর নকড়ী রক্ষা কর। জানে বাঁচালেত নকড়ী মিলবে।' কথাটি বলার সাথে সাথে জমাদার সাহেব আর কোন উত্তর না করে দ্রুত বেগে চলে গেলেন। যাবার সময় জেলের ভিতরের সমস্ত অবাঙ্গালী সিপাহী–জমাদারদের ডেকে নিয়ে গেলেন।

খবর নিয়ে জানলাম, এখন জেলে আর একজন ও অবাঙ্গালী পাহাড়াদার নেই। ফলে জেল খানা হয়ে দাড়াল সম্পূর্ণ বিপদ মুক্ত। কারণ বাঙ্গালী পাহারাদাররা প্রায় সকলেই আমাদের পক্ষে। উপরন্ত ২/১ জন বিপক্ষে থাকলেও তারা ডিউটিতে নাই। জেলার ও সুপার রাতের বেলায় ভয়ে জেলে আসে না। উপরন্ত টেলিফোন লাইন বিকল।

সুপারের ইচ্ছেছিল -আমাদের সাথে আলোচনার পর পরই-মিলেটারীর সাথে যোগাযোগ করে জেলখানা তাদের হস্তে সমর্পন করবেন। আমরা চলে আসার পর তিনি টেলিফোন তুলে কয়েক বার চেষ্টাও নিয়েছিলেন কিন্তু লাইন না পেয়ে পরের দিন যোগাযাগ করার আশা নিয়ে বাংলোতে ফিরে গেছেন। জেল থেকে যখন খবর তার কাছে গেল, তখন তিনি একবার অফিসে এসে ফোন করার চেষ্টা করছিলেন, কিন্ত ফোন খারাপের খবর শুনে অফি:স এলেন না। অতপর পরবর্তী ঘটনার খবর তিনি বুঝে নিয়েছেন বিদ্রোহ শুরু হয়ে গেছে। বাইরে তখন কারফিউ। সন্ধ্যার পর কেহ ঘরের বের হতে পারছে না। আমরা আরও খবর পেলাম রাজশাহী শহরের সব মিলেটারী 'সরদা কেডেট কলেজে' চলে গেছে। শহর এখন শত্রু মুক্ত। শেষ পর্যন্ত লক আপে না যাওয়া কর্তৃপক্ষ মেনে নিলেন। এই সুযোগে আমরা বিদ্রোহের মুল সংগঠকরা প্রথমে এক জায়গায় একত্র হয়ে দ্রুত পরামর্শ করে নিলাম।

প্রথমে জেলের গুদাম ভেঙ্গে বাঁশ রশি, কুড়াল ও দুরমুছ বের করার হুকুম দিলাম। ৫ মিনিটের মধ্যে খোলাহল, ভাঙ্গতে হল না চাবি পাওয়া গেল।

২০/২৫ জন লেগে গেল সিড়ি তৈয়ারীর কাজে। দুইটা বড় ধরণের সিড়ি বানানো হল। একটা দিয়ে জেলের দেওয়ালে উঠবে; অপরটা দিয়ে নামবে।

অবশ্য এই সিড়ি দিয়ে বিদ্রোহীরা চলে যাবে না, কেবল কয়েকজন বাইরে যাবার জন্য। কেননা জেল খানার দুইটা দরজা থাকে, একটা হল সদর, অপরটা হল অন্দর, লাল গাড়ীর দরজা, অর্থাৎ সেখান দিয়ে জেলের ময়লা পার করা হয়, দুই তিন ফুট চওড়া, তিন ফুট ওঁচু একটি

সুরঙ্গ পথ। ঐ লাল গাড়ীর দুই দিকে ৮টি করে ১৬টি বড় বড় তালা লাগানো থাকে। আমরা ঐ লাল গাড়ীর দরজা ভাঙ্গার সিদ্ধান্ত নিলাম ৮ জন করে ১৬ জন বলিষ্ঠ কয়েদীকে এই কাজে লাগানো হল। তারা সিড়ি দিয়ে বাইরে গিয়ে ভিতরে বাইরে এক যোগে তালা ভাঙ্গার কাজে লেগে গেল।

তালার উপর ভারী কুড়াল বসিয়ে কুড়ালের উপর দুরমুজের ঘা দিয়ে তালা কাটতে লাগল। ১৫/২০ জনকে লাগিয়ে দিলাম আমাদের ওয়ার্ডে পরোটা, মাংস রান্নার কাজে। যেহেতু আমাদের ছিল কিছু মজুত মুরগী ও ঘি-আটা। ঐ গুলিকে খেয়ে যেতে চাই।

সবশেষে আমরা বিদ্রোহের নেতারা বিভিন্ন ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে গিয়ে সারারাত ধরে মিটিং করে বেড়ালাম। সংক্ষিপ্ত সভা, সকলে কোরান গীতা ছুইয়ে শপথ নিল, বাইরে গিয়ে মুক্তি যুদ্ধে যোগদান করবেন। এদের মধ্যে বরিশালের প্রসিদ্ধ ডাকাত কুদ্দুছমোল্লাও ছিল। এরপর ভোর চারটায়—যাত্রা শুরু হল। হুরা হুড়ি যাতে শুরু না হয়, কোন ওয়ার্ড কখন যাবে তার জন্য জেলের ঘন্টি ব্যবহার করা হল, প্রতি দশ মিনিট পরে, ঘন্টিতে বাড়ী পরবে এক দুই তিন করে, সেই অনুসারে বিভিন্ন ওয়ার্ডের বন্দীরা বের হবে। রাজবন্দীরা বের হবে সকলের শেষে।

সিপাহীদের নির্দ্দেশ দেওয়া হল, একমাত্র মনি সিংহ ও জামাতপন্থী গোয়েন্দা এই দুইজন এবং মেয়ে কয়েদী ছাড়া বাকী সকলে চলে যাবে। পরের দিন, দিনের বেলায় মেয়ে বন্দীদের ছেড়ে দেয়া হবে। মেয়েদের মুক্ত না করার প্রধান কারণ হল সাধারণ কয়েদীদের সাথে তাদের ছাড়া হলে, মেয়েরা লুটপাটের খোরাক হবে।

ভোর ৫টায় আমি, মীরাতুল, আজাদ এবং সাবান মল্লিক লাল গাড়ীর দরজার সামনে এসে দাঁড়ালাম। শেষ বারের মত মনি সিংহকে জানাবার কর্তব্য বোধ করলাম। একজন সিপাহী ও সাবান মল্লিককে মনিরসিংহের নিকট পাঠালাম।

তিনি সব খবর শুনে চলে আসতে রাজী হলেন, সব শেষে তাকে মুক্ত করে আনা হল। শেষ বারের মত মোলাকাত হল মনিদার সাথে পদ্মা নদীর বালু চরে; কারণ সেই হতে আজ পর্যন্ত তাঁর সাথে আর সাক্ষাৎ হয়নি।

এক সাথে বের হয়ে তিনি পদ্মা ওপারে গিয়ে মুর্শিদাবাদ হয়ে কলকাতায় চলে এসেছিলেন। আমি রাজশাহীতে ৪/৫ দিন থেকে গেলাম। পার্টির সাথে যোগাযোগ করার আশায়।

মনিদা অবশ্য কলকাতায় গিয়ে একটি সাংবাদিক বৈঠক ডেকে এক বিবৃতি দিয়েছিলেন। বিপ্লবী মনিসিংহের নেতৃত্বে "রাজশাহী জেল বিদ্রোহ"। এই মর্মে খবরটি ছাপা হয়েছিল কলকাতার দৈনিক কাগজে। পরে অবশ্য খবরটির ভুল সংশোধন করে আর একটি প্রেস বিবৃতি আমাকে দিতে হয়েছিল। সি,পি,এম, এর দৈনিক 'স্বাধীনতায়' তা ছাপা হয়েছিল। ১৯৭১ সালের ১২ কি ১৩ই এপ্রিল। সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা হল যার সুযোগ্য দক্ষতা ও কাজের ফলে রাজশাহী জেলবিদ্রোহ সফল হয়েছিল, সেই দক্ষ সংগঠক কমঃ সাবান মল্লিককে রুশ ভারতের আওয়ামী পাণ্ডারা বন্ধু বেশে ডেকে এনে যুদ্ধের শেষ দিকে হত্যা করেছিল।

যে সাবান মল্লিক জেল থেকে বের হয়ে বাড়ী না গিয়ে সোজা পাবনায় গিয়ে টিপু বিশ্বাসের সাথে মুক্তি যুদ্ধে যোগদান করেছিল, পরে টিপু বিশ্বাসরা যখন পাকিস্তান বিরোধী যুদ্ধ না করার সিদ্ধান্ত নিলেন, তখন সাবান মল্লিক পাঞ্জাবী থেকে কেড়ে নেওয়া একটি চাইনীজ রাইফেল নিয়ে নিজগ্রামে মুক্তি যুদ্ধ সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তার পরও তিনি হত্যা হলেন যেহেতু তিনি দেবেন সিকদারের শিষ্য ও কমিউনিষ্ট এবং এক জন সাচ্চা দেশ প্রেমিক। আজও চাট মোহর থানার সমস্ত জনগন তার জীবন্ত স্বাক্ষী। তার স্ত্রী ও দুই সন্তান অভিশম্পাদ দিচ্ছে—মেকি স্বাধীনতার জিম্মাদারদের। ইহাই ঘটনা, আর প্রতিটি ঘটনাই ইতিহাসের অঙ্গ।

জেল বিদ্রোহ করে বের হয়ে-চাপাই নর্বাবগঞ্জ ও শিবগঞ্জে কমরেড ওসমান গণি ও মীরাতুল ইসলামের বাড়ীতে সাত দিন অপেক্ষা করে কমরেড মতিন আলাউদ্দীন প্রমুখদের সাথে যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হয়ে— ভারতে এসে প্রথমে পূর্ব বাংলার সকল রাজনৈতিক দলের সাথে যোগাযোগ করার প্রচেষ্টা

চালাই। এ বিষয়ে পশ্চিম বাংলার সি পি এম নেতা কমঃ প্রমোদ দাস গুপ্ত ও কমঃ জ্যোতি বসুর আন্তরিক আগ্রহ ও আর্থিক অবদান যথেষ্ট সহায়ক হয়। যেহেতু তখন আমি কপর্দ্দকহীন। মালদহ থেকে কলকাতায় আসার খরচ যোগায় মালদহের সি পি এম এর জেলা সেক্রেটারী কমঃ মানিক ঝা। আবার কলকাতা থেকে বিমানে করে আগরতলায় যাওয়া-আসার খরচ বহন করে বর্তমান ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী কমরেড নৃপেন চক্রবর্ত্তী।

কলকাতায় যাদের সাক্ষাৎ পাই তারা হলেন সর্ব জনাব মশিয়ুর রহমান (যাদু মিঞা); আবু নাসের খান ভাসানী কমঃ অমূল্য লাহেড়ী (পাবনা) এবং জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী (আওয়ামী লীগ)।
এঁদের সাথে পারামর্শ করে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের জন্য একটা ফ্রন্ট করার সিদ্ধান্তে আসি এবং যোগাযোগ করার দায়িত্ব ভাগ করে বের হয়ে পড়ি।

আওয়ামী লীগ নেতাদের সাথে যোগাযোগ করার ভার নিলেন মিজানুর রহমান মিজান। মনিসিংহের দায়িত্ব রইল অমূল্য লাহিড়ীর উপর। ভাসানী ও অন্যান্য ন্যাপ নেতাদের দায়িত্ব যাদু মিঞা ও নাসের ভাসানীর উপর। আর আগরতলায় গিয়ে বাকী বামপন্থী নেতাদের সাথে যোগাযোগের দায়িত্ব রইল আমার উপর। আগর তলায় এসে যাদের নিকট চিঠি পাঠানো হয়, তারা হলেন জনাব আতাউর রহমান খান, কাজী জাফর আহমদ এবং আবুল বাশার।

আর যাদের সাথে দেখা হল তারা হলেন আব্দুল মালেক, ইছাক ভূইয়া, মণ্টু মিত্র, শফীকুর রহমান মজুমদার, হায়তুন নবী, চৌধুরী হারুনর রশিদ, আহমদুর রহমান আজমী, অনঙ্গ সেন প্রমুখ।

পূর্ব সিদ্ধান্ত মোতাবেক-১৮ই এপ্রিল কলকাতায় ফিরে খবর পাওয়া গেল-

(ক) আওয়ামী লীগ নেতারা মনে করে তাদের কিছু করণীয় নেই। যা কিছু করার তা করবে ভারত সরকার ও ইন্দিরা দেবী।

(খ) মনিসিংহ—মোটেই চীনাপন্থীদের সাথে ঐক্য ফ্রন্ট করার পক্ষপাতী নয়।

(গ) ভারত সরকার ইতিমধ্যেই মওলানা ভাসানীকে গেপ্তার করে দিল্লীতে নিয়ে নজরবন্দী করেছে।

(ঘ) যাদু মিঞা ও দেবেন সিকদারকে কলকাতা পুলিশ খোঁজাখুজি করছে। সেই অবস্থায় বাকী যারা আসবে তাদের নিয়ে কলকাতায় বসা বিপদ জনক ভেবে ১৮ই এপ্রিল জলপাইগুড়ি শহরে বসার সিদ্ধান্ত হয়।

১৮ই এপ্রিল বৈঠকে যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় হল কাজী জাফর, মেনন, রনো, আবুল বাশার, আব্দুল মালেক, বরদা চক্রবর্তী ও যাদু মিঞা, নাসের ভাসানী, নাসীম আলী খান প্রমুখ। এখানে বসেই সিদ্ধান্তহল—আওয়ামী লীগ ও মনিসিংহকে বাদ দিয়ে হলেও একটি জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট গঠন করতে হবে। মওলানা ভাসানী হবে সেই ফ্রন্টের সভাপতি। পরবর্তী পুর্ণাঙ্গ বৈঠক হবে কলকাতায়।

এই বৈঠক চলাকালীন সময়ে কমঃ মতিন ও আলাউদ্দীনের যুক্ত স্বাক্ষরিত এক চিঠি আমার হস্তগত হল। কমঃ আবুল বাশার-আব্দুল মালেক ইত্যাদির সাথে আলাপ করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল পাবনায় আমাকে যেতে হবে। যেহেতু তারা লিখেছে তাদের পক্ষে ভারতে আসা সম্ভব নয়, আসলেই রফিক হত্যার বদলা নেবে আওয়ামী লীগ।

পাবনায় যাওয়ার আমার পথ পদর্শক ছিলেন কমঃ মোহম্মদ আলী বিশ্বাস। জলপাইগুড়ি থেকে নদীয়া জেলার পরাগপুর সীমান্ত হয়ে— সাইকেল যোগে কুষ্টিয়ার আল্লার দরগায় এসে। পৌঁছলাম বেলা দুইটায় এসে জামা কাপড় খোলার আগেই ঐ রাস্তা দিয়ে পাক বাহিনী রওনা দিল সীমান্তের দিকে। আর ২/৩ মিনিট দেরী হলে—আজকের এই কাহিনী লিখা সম্ভব হত না।

সন্ধ্যায় গোপনে আল্লার দরগা থেকে পায়ে হেটে ভেড়ামারায় এসে মতিনদের সাথে সাক্ষাৎ হল। সারারাত ধরে তাদের তিন জনের সাথে (মতিন, আলাউদ্দীন ও টিপু বিশ্বাস) আলোচনা হল। প্রাথমিক কুশলাদী বিনিময়ের পর মূল আলোচনায় এলাম।

দুই পক্ষের বক্তব্য দুই বিপরীত মেরুতে। তারা বলছে এই যুদ্ধের বিরোধীতা করতে হবে (যেহেতু ইহা রুশ ভারতের চক্রান্ত)। কমিউনিষ্টদের নেতৃত্বে

কৃষি বিপ্লব করতে হবে। প্রধান দ্বন্দ্ব সামন্তবাদের সাথে কৃষক জনতার। আমার মতে পাকিস্তানী-উপনিবেশিক শাসক গোষ্ঠির সাথে জাতীয় দ্বন্দ্ব-প্রধান। এই জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে হবে কমিউনিষ্টদের। মনিসিংহ, হক-তোয়াহারা যে ভুল করছে, আপনারাও সেই একই ভুল করছেন। চারু মজুমদারের শ্রেণী শত্রু খতম ও সামন্তবাদের সাথে প্রধান দ্বন্দ্ব; এই লাইন ভুল।

রাত ভোর হয়ে গেল কোন মিমাংসায় আসা গেল না। অগত্যা প্রস্তাব দেওয়া হল পার্টি কংগ্রেস আহবানের। যা সাধারণ নিয়ম। তারা বলে “আমরা যা করছি তা কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত। নতুন করে কংগ্রেস ডাকার দরকার নাই। তাছাড়া আমরা ভারতে গিয়ে কংগ্রেস করতে পারব না। এখানে এখন কংগ্রেস করার পরিবেশ নেই।

অবশেষে আপোষে পার্টি বিভক্তি মেনে নিয়ে—পনঃ গোপনে নদীয়া হয়ে কলকাতায় এসে ১৩টি সংগঠনকে নিয়ে “জাতীয় মুক্তি যুদ্ধ সমন্বয় কমিটি” গঠন করার কাজে আত্মনিয়োগ করলাম। তাদের সাথে সেই সাক্ষাৎ এর তারিখটি ছিল ৭ই মে। ১৯৭১ সাল। যেখান থেকে পুর্ব বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টি বিভক্ত হয়ে— বিভিন্ন নাম ধারণ করে অনেক চরাই উত্রাই পার হয়ে বর্তমানের বাংলাদেশের মজদুর পার্টিতে এসে দাঁড়িয়েছে। ইতিহাস কথা বলে,—সেই কথা হল পুর্ব বাংলা ছিল পাকিস্তানের বিশেষ ধরনের উপনিবেশ। পাকিস্তান কৃত্রিম রাষ্ট্র। সংগ্রাম ছিল জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম। নেতৃত্বের দায়িত্ব ছিল কমিউনিষ্টদের।

[পরবর্তী খণ্ডে সমাপ্ত]

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

যে সব বন্ধু, সহকর্মী, স্নেহ ভাজন ও শুভানুধ্যায়ীদের অর্থানুকুল্যে এই পুস্তক ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হল তারা হচ্ছে ঃ—

১। স্নেহভাজন তোতা মিঞা
২। খোন্দকার জাহাঙ্গীর
৩। বন্ধুবর কাজী জাফর আহমেদ
৪। ,, শফিকুর রহমান মজুমদার
৫। ,, অধ্যাপক গোপাল কৃষ্ণ মহুরী
৬। ,, ,, নূরুল ইসলাম হিলালী
৭। ,, অমলেন্দু বিশ্বাস
৮। ,, ফজলুর রহমান (সোনা)
৯। ,, এ্যাডভোকেট ওসমান গণি
১০। ,, রণজিত কুমার বাগচী এ্যাড্‌ভোকেট
১১। ,, এ্যাড্‌ভোকেট নেছার উদ্দীন আহমদ
১২। ,, অধ্যক্ষ মীরাতুল ইসলাম
১৩। ,, শফিকুল ইসলাম ভোতা
১৪। ,, আবু নাসের খান ভাসানী
১৫। ,, ডাক্তার ছৈয়দুর রহমান
১৬। স্নেহ ভাজন মাহবুব আলম
১৭। ,, ,, মিলন কান্তি নাথ
১৮। ,, ,, মোস্তফা আনসারী
১৯। ,, ,, পুলিন বিহারী নাথ
২০। ,, ,, শ্রীমান বসন্ত কুমার শীল
২১। ,, ,, আতোয়ার রহমান ও চিনুরাণী
২২। স্নেহ প্রিয় শ্রীমান মন্টু ও মনজু মিত্র
২৩। ,, ,, শ্রীমান দুলাল ও মীরা রায়
২৪। বন্ধুবর মোঃ রইচ উদ্দীন
২৫। শ্রদ্ধাভাজন জনাব জাফর মোল্লা
২৬। বন্ধুবর মোহম্মদ ইছাক

২৭। ,, জাফর আহমদ চৌধুরী
২৮। স্নেহ প্রিয় আবদুস ছালাম
২৯। ,, ,, ইব্রাহিম খলিল
৩০। ,, ,, মোহাম্মদ এজাবুল
৩১। ,, ,, ” আনোয়ার
৩২। ” ” ” আঃ মজিদ
৩৩। বন্ধুবর জনাব নাঈমুদ্দীন
৩৪। ” জনাব ছিদ্দিক আহমদ
৩৫। ইউ পি চেয়ারম্যান কুমিরা
৩৬। ” চেয়ারম্যান বারব কুণ্ড
৩৭। কল্যানীয় জামাল উদ্দীন ও জোহরা বেগম
৩৮। ” মোঃ রেজাউন
৩৯। বন্ধুবর আবদুর রব সর্দ্দার
৪০। স্নেহ প্রিয় শ্রীমান বীরেন সেন
৪১। ” ” মিষ্টার গুপ্ত
৪২। বন্ধুবর আবদুল মালেক
৪৩। কল্যাণীয় শ্রীমান রতন দত্ত
৪৪। ,, জ্যোতিঃ দত্ত
৪৫। ,’ শ্রী মানিক রমা ও রুবী সরকার
৪৬। বন্ধুবর ডি, পি বড়ুয়া
৪৭। ” কামাল লোহানী
৪৮। ” গিয়াস কামাল
৪৯। ” হাছানুর জামান
৫০। ” নূরুল হক চৌধুরী, মেহেদী
৫১। ” জালাল আহমদ
৫২। ,’ ডাক্তার মফিজ চৌধুরী
৫৩। মিসেস্ তারা বেগম

এদের সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক প্রীতি-শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা।

লেখকের প্রকাশিত অন্যান্য বই

১। হাতীর ধর্মঘট
২। রাজনীতি কি ও কেন?
৩। সমাজতন্ত্র কি ও কেন?
৪। জ্ঞানের উৎস
৫। বাংলার কৃষক আন্দোলন ও মওলানা ভাসানী
৬। হুনানের আলোকে—
৭। উপমহাদেশে কমিউনিষ্ট বিভ্রান্তি
৮। বাংলাদেশে কমিউনিষ্ট বিভ্রান্তি ও কমিউনিষ্ট ঐক্য প্রসঙ্গে
৯। রচনা সংকলন ১ম খণ্ড

যন্ত্রস্থ

১০। কবিতা সংকলন
১১। প্রবন্ধ ”
১২। গল্প ”
১৩। পাক-বাংলাদেশের শ্রমিক আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
১৪। নব আড়ম্বরে বাংলাদেশে দুর্গা উৎসব
১৫। বাংলার আকাশে ক্ষণিকের লাল তারা
১৬। প্রাচ্য দর্শন ও বস্তুবাদ

বিনিময় মূল্য ঃ—নিউজ প্রিন্ট—বিশ টাকা
সাদা প্রিন্ট —ত্রিশ টাকা